আনাফ্রাঙ্ক এর ডায়েরি

প্রকাশকাল ঃ বইমেলা ২০০৮
প্রচ্ছদ ঃ মাহবুব কামরান

মম প্রকাশ, ৩৮/৪ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০ থেকে *এ. জেড. এম. তৌহিদ* কর্তৃক প্রকাশিত এবং *সালমানী মুদ্রণ*, নয়াবাজার, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।
অক্ষর বিন্যাস *জীবন কম্পিউটারস* ৩৮/২খ, বাংলাবাজার, ঢাকা।

মূল্য ১৫০ টাকা

ISBN 984-8414-69-2

যা অমর, যা অক্ষয়

ঠিক তেরো বছর বয়সের এক সদ্য কিশোরী। ডায়েরি লেখার শুরু সেই বয়সেই। দিনে দিনে কেটে গেছে দুই বছর দুই মাস। পনেরো বছর দুই মাস বয়স পর্যন্ত লিখতে পেরেছিল সেই কিশোরী। ডায়েরির পাতায় শেষ আঁচড় টানার ঠিক সাত মাস পরে এই পৃথিবীর জল-মাটি-হাওয়ার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হয়েছিল তার। ফ্যাসিস্ট নাৎসীদের নির্মমতার সাক্ষর হিসেবে এই পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে চলে যেতে হয়েছিল তাকে। চলে গেছে সে কিন্তু রেখে গেছে তার কালজয়ী অমর দিনলিপি। এ হলো সেই কিশোরীর সেই ডায়েরি, দুই বছর দুই মাসের দিনলিপি– আনা ফ্রাঙ্কের ডায়েরি।

তার বাবার নাম ছিল অটো ফ্রাঙ্ক, মায়ের নাম এডিথ। মূলত জার্মানির বাসিন্দা তাঁরা, ধর্মে ইহুদি। অটো-এডিথের প্রথম সন্তান মারগট, জন্ম তার ১৯২৬ সালে। দ্বিতীয় সন্তান আনা– আনা ফ্রাঙ্ক, জন্ম ১৯২৯ সালের ১২ জুন।

এইসময় জার্মানির মাটিতে মাথা তুলে হুংকার ছাড়ছে হিটলার। চারদিকে বিভৎস অত্যাচার আর ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করতে শুরু করেছে তার নাৎসি বাহিনী। এ যেন সরাসরি ইহুদিদের বিরুদ্ধেই যুদ্ধ ঘোষণা করেছে তারা। অনেক ইহুদিই জার্মানির পাট চুকিয়ে চলে যাচ্ছে অন্য কোনও দেশে, নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে। ১৯৩৩ সালে দেশ ছাড়লেন অটো ফ্রাঙ্কও। চলে গেলেন হল্যাণ্ডে। আনা ফ্রাঙ্ক তখন চার বছরের শিশু।

এর ঠিক ছয়বছর পর শুরু হল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। পৃথিবী দখলের দুর্বার স্বপ্ন দেখছে নাৎসী হিটলার। জার্মানি ছেড়ে চলে যেতে হয়েছে বিজ্ঞানী আলবার্ট আইনস্টাইনকে, কারণ তিনি ইহুদি। এদিকে হল্যাণ্ডের আলো-হাওয়ায় বড় হচ্ছে আনা ফ্রাঙ্ক।

কিন্তু ফ্রাঙ্ক পরিবারের হল্যাণ্ডের আশ্রয়ও নিরাপদ রইল না। হিটলারের নাৎসিবাহিনী হল্যাণ্ড দখল করল। শুরু হল ইহুদিদের ওপর অত্যাচার। অসংখ্য ইহুদিকে পাঠানো হল বন্দীশিবিরে। ১৯৪২ সালের জুলাই মাসে সরাসরি শমন এল অটো ফ্রাঙ্কের নামে। আসলে সেই শমন ছিল তার বড় মেয়ে মারগটের নামে। মারগট তখন ষোড়শী– সুন্দরী। নাৎসী বাহিনীর কয়েকজন অফিসারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে তার রূপ-সৌন্দর্য। তাকে হাতছানি দিল বন্দীশিবির। কিন্তু সে-ডাকে সাড়া দিলেন না অটো ফ্রাঙ্ক। সমস্ত পরিবার সহ নিলেন এক চরম ঝুঁকি। নিজেদের ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানের পেছনদিকে এক গোপন আস্তানায় আশ্রয় নিলেন সপরিবারে। সঙ্গে রইল আরও একটি পরিবার। এই সময় সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলেন তাঁর অতি কাছের কয়েকজন ইংরেজ বন্ধু। আনা ফ্রাঙ্কের বয়স তখন সবেমাত্র তেরো বছর এক মাস। এক সদ্য কিশোরী। যে বয়সটা তার থাকার কথা ছিল স্কুলে। পৃথিবীর খোলা আলো-বাতাসে প্রাণের অপরিমিত উচ্ছাসে যার দিন কাটাবার কথা ছিল– সেই কিশোরী আনা ফ্রাঙ্ককে বরণ করে নিতে হলো ঘুপচি ঘরের নিরাপদ আশ্রয়। রাতের বেলা যেখানে বাতি জ্বালানো নিষেধ ছিল। দিনের বেলায় কোন জানালা খোলার উপায় ছিল না। সে এক অপরিসীম সহ্যাতীত সময়।

এইসময় কলম উঠে এলো সদ্য কিশোরী আনা ফ্রাঙ্কের হাতে। নিজের মনের কথা, সেই সময়ের বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ হতে শুরু করলো কাগজের পাতায় পাতায়। অনেক কষ্ট, অনেক ত্যাগ আর সেই সময়ের কষ্টার্জিত জীবন-যাপন প্রণালীর দিনলিপি একের পর এক লিখে চললো কিশোরী আনা ফ্রাঙ্ক।

এরপর পেরিয়ে গেল একে একে পঁচিশটা মাস। চারদিকে চলছে হিটলারের নাৎসীবাহিনীর অত্যাচার। সেই অত্যাচারের খবরে কেঁপে কেঁপে উঠছে গোপন আস্তানায় লুকিয়ে থাকা ফ্রাঙ্ক পরিবার। কখনও ভয়ে আতংকে কাতর হয়ে নিশ্চুপ– আসলে এছাড়া তো তাদের আর করার কিছুই নেই। কারণ বাইরে বের হলেই নাৎসী বাহিনীর হাতে পড়ার সম্ভাবনা। আর তারপর আতংকময় সেই বন্দীশিবির। যেখান থেকে ফিরে আসার কোন সম্ভাবনা নেই। এভাবেই হয়তো পেরিয়ে যেত দিন। আতংক আর বিভীষিকাময় দিন-রাতগুলো হয়তো যুদ্ধ শেষ হওয়া পর্যন্ত পার করতে পারতো ফ্রাঙ্ক পরিবার– সেই ঘুপচি ঘরগুলোর মধ্যে বাস করে। কিন্তু সেটাও হলো না। গোপন আস্তানায় আশ্রয় নেবার পঁচিশ মাস পর, ১৯৪৪ সালের ৪ আগস্ট, সেখানে হানা দিয়েছিল নাৎসিবাহিনী, আটজন 'ইহুদি' মানুষকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল বন্দীশিবিরে। জার্মানির আউশভিৎস্ বন্দীশিবিরে ১৯৪৫ সালের ৬ জানুয়ারি মারা যান আনার মা। মারগট আর আনাকে পাঠানো হয় আরও দূরবর্তী বেরজেন-বেল্‌সেন বন্দীশিবিরে। ১৯৪৫-এর ফেব্রুয়ারির শেষদিকে অথবা মার্চের শুরুতে সেখানেই মারা যায় মারগট। আর মার্চ মাসেই, ওই বন্দীশিবিরেই, শেষবারের মতো চোখ বুজেছিল পনেরো বছর নয় মাসের সেই কিশোরী– আনা ফ্রাঙ্ক।

বন্দীশিবির থেকে ফিরতে পারেননি অন্য পরিবারের তিনজন সদস্য এবং দাঁতের ডাক্তার ডুসেল-ও। মৃত্যুর অন্ধকার থেকে ফিরে এসেছিলেন শুধু একজন। তিনি ছিলেন মারগট আর আনা-র বাবা অটো ফ্রাঙ্ক। আর তখনই তাঁদের দুই শুভার্থী– এলি আর মিপ, তাঁর হাতে তুলে দিয়েছিলেন লাল ডোরাকাটা মলাটের একটা ডায়েরি এবং আরও কিছু কাগজ– এগুলো ছিল আনার লেখা। আনার দিনলিপি। আনার গল্প-উপন্যাস-স্মৃতিকথা।

তারপর প্রকাশিত হয়েছিল সেই দিনলিপি– 'আনা ফ্রাঙ্কের ডায়েরি' নামে। প্রকাশিত হবার পরই শুরু হলো আসল ইতিহাস। সারা পৃথিবী যেন চমকে গেল একজন সদ্য কিশোরীর কলমের আঁচড়ে। পরবর্তীতে এই সদ্যকিশোরীর দিনলিপি অনূদিত হয়েছে পৃথিবীর প্রায় সমস্ত ভাষায়, তৈরি হয়েছে চলচ্চিত্র, মঞ্চস্থ হয়েছে নাটক।

এক আশ্চর্য অনুভূতি তৈরি হয় পাঠকের মধ্যে এই ডায়েরি পড়তে গিয়ে। কখন যেন এতে খুঁজে পাওয়া যায় একজন কিশোরী আনাকে; পরক্ষণেই পাঠককে বিস্মিত করে সামনে এসে দাঁড়াবে আশ্চর্য গভীর আনা ফ্রাঙ্ক। সেই সময়ের বিভীষিকাময় দৈনন্দিন ঘটনার বর্ননার পাশাপাশি তেরো থেকে পনেরোর দিকে হেঁটে-চলা কিশোরী অনায়াসে কথা বলে গেছে দর্শন, ঈশ্বর, মানবচরিত্র এমনকি প্রেম-প্রকৃতি-জীবনবোধ নিয়েও। পাশাপাশি ফুটে উঠেছে সমকালীন ইতিহাস, ইহুদিদের লাঞ্ছনা-যন্ত্রণা-সংগ্রাম এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের একটি খন্ডকালীন ছবি।

সেই শুরু থেকেই লেখিকা হওয়ার স্বপ্ন ছিল আনা ফ্রাঙ্কের। তার স্বপ্ন ছিল এমন কিছু করার– যাতে সে মৃত্যুর পরেও বেঁচে থাকতে পারবে– সাধারণ মানুষের অন্তর জুড়ে। কিন্তু তা হলো না। যে ফুল ফুটলে চারদিক ভরে যেতে পারতো অন্তহীন সুবাসে– সেই ফুলের ফোটা হলো না। ঝরে যেতে হয়েছে তাকে কুঁড়িতেই।

কিন্তু বেঁচে আছে তার সেই অমর দিনলিপি। বাঁচিয়ে রেখেছে তাকে বিশ্বজুড়ে পাঠকের অন্তরে। বেঁচে থাকবে আনা ফ্রাঙ্ক, বেঁচে থাকবে তার ডায়েরি।

– নজরুল ইসলাম চৌধুরী

রবিবার, ১৪ জুন, ১৯৪২

শুক্রবার, ১২ই জুন, ছ-টায় আমার ঘুম ভেঙে গেল এবং এখন আমি জানি কেন– সেদিন ছিল আমার জন্মদিন। তবে অত ভোরে ওঠা অবশ্যই আমার বারণ, সুতরাং ভেতরে ভেতরে ছটফট করলেও পৌনে সাতটা অব্দি নিজেকে সামলে রাখতে হল। ব্যস, তারপর আর নিজেকে ধরে রাখা গেল না। উঠে আমি খাওয়ার ঘরে চলে গেলাম। সেখানে মুরটিয়ে (বেড়াল) আমাকে দেখে সাদর অভ্যর্থনা জানাল।

সাতটা বাজার খানিক পরেই আমি চলে গেলাম মা-বাবার কাছে। তারপর বৈঠকখানায় গিয়ে উপহারের প্যাকেটগুলো খুলতে লাগলাম। প্রথমেই যে স্বাগত জানাল সে হলে তুমি, সম্ভবত সেটাই হয়েছে আমার সবচেয়ে সেরা জিনিস। এছাড়া টেবিলে একগুচ্ছ গোলাপ, একটা চারা গাছ, আর কিছু পেওনিফুল, সারাদিনের মধ্যে আরও কিছু এসে গেল।

মা-বাবার কাছ থেকে পেলাম একরাশ জিনিস, আর নানা বন্ধুতে আমার মাথাটা সম্পূর্ণ খেল। আর যা যা পেলাম, তার মধ্যে ছিল ক্যামেরা অব্স্কুরা, একটি পার্টি গেম্, প্রচুর লজেন্স, চকোলেট, একটি গোলকধাঁধা, একটা ব্রোচ, জোসেফ কোহেনের লেখা 'নেদারল্যাণ্ডস্-এর লোককথা আর পৌরাণিক উপাখ্যান', 'ডেইজি-র ছুটিতে পাহাড়ে' (দারুণ একখানা বই), আর কিছু টাকাকড়ি। এইবার আমি কিন্তু কিনতে পারব 'গ্রীস আর রোমের উপকথা'– তোফা।

তারপর লিস বাড়িতে এল ডাকতে, আমরা ইস্কুলে গেলাম। টিফিনের সময় সবাইকে আমি মিষ্টি বিস্কুট দিলাম, তারপর আবার আমাদের মন দিতে হল ইস্কুলের পড়ায়।

এবার ইতি টানতে হবে। আসি ভাই, আমরা হব হলায়-গলায় বন্ধু!

সোমবার, ১৫ জুন, ১৯৪২

আমার জন্মদিনে পার্টি হল রবিবার বিকেলে। আমরা একটা ফিল্ম দেখালাম– 'বাতিঘর রক্ষক', তাতে রিন-টিন-টিন ছিল। আমার ইস্কুলের বন্ধুরা ছবিটা চুটিয়ে উপভোগ করেছে। আমাদের সময়টা খুব ভালো কেটেছিল। ছেলেমেয়ে ছিল প্রচুর। আমার মা-মণির সবসময় খুব জানার ইচ্ছে কাকে আমি বিয়ে করব। তাঁর কতকটা আন্দাজ, পিটার ভেসেল্ হল সেই ছেলে; একদিন লজ্জায় লাল না হয়ে কিংবা চোখের একটি পাতাও না কাঁপিয়ে মা-মণির মন থেকে সরাসরি ঐ ধারণাটা যো-সো করে ঘোচাতে পেরেছিলাম। বছর কয়েক ধরে, আমার প্রাণের বন্ধু বলতে লিস্ গুসেন্স্ আর সানা হুটমান। এরপর ইহুদীদের মাধ্যমিক ইস্কুলে যোপি দ্য বালের সঙ্গে আমার আলাপ; প্রায়ই আমরা একসঙ্গে কাটাই; আমার মেয়ে বন্ধুদের মধ্যে ওর সঙ্গেই এখন আমার সবচেয়ে বেশি ভাব। অন্য একটি মেয়ের সঙ্গে লিসের বেশি বন্ধুত্ব; আর সানা যায় অন্য একটা ইস্কুলে– সেখানে তার নতুন নতুন বন্ধু হয়েছে।

শনিবার, ২০ জুন, ১৯৪২

দিন কয়েক আমি লিখিনি, তার কারণ আমি সবার আগে চেয়েছিলাম ডায়রিটা নিয়ে ভাবতে। আমার মতো একজনের পক্ষে ডায়রি রাখার চিন্তাটা বেখাপ্পা; আগে কখনও ডায়রি রাখিনি বলে শুধু নয়, আসলে আমার মনে হয়, তেরো বছরের এক স্কুলের মেয়ের মনখোলা কথাবার্তা কোনো আগ্রহ জাগাবে না– না আমার, না সেদিক থেকে আর কারো; তা হোক, কী আসে যায় তাতে? আমি চাই লিখতে কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা হল, আমার বুকের গভীরে যা কিছু চাপা পড়ে রয়েছে আমি চাই সেসব বের করে আনতে।

লোকে কথায় বলে, 'মানুষের চেয়ে কাগজে সয় বেশি'; যে দিনগুলোতে আমার মন একটু ভার হয়ে থাকে, সেই রকম একটা দিনে– গালে হাত দিয়ে আমি বসে আছি। মনটা ভীষণ বেজার, এমন একটা নেতিয়ে-পড়া ভাব যে ঘরে থাকব, না বেরিয়ে পড়ব সেটা পর্যন্ত ঠিক করে উঠতে পারছি না– কথাটা ঠিক তখনই আমার মন এল। হ্যাঁ, এটা ঠিকই, কাগজের আছে সহ্যগুণ এবং এই শক্ত মলাট দেওয়া নোটবই, জাঁক করে যার নাম রাখা হয়েছে 'ডায়রি', সত্যিকার কোনো ছেলে বা মেয়ে বন্ধু না পেলে কাউকেই আমি দেখাতে যাচ্ছি না– কাজেই মনে হয় তাতে কারো কিছু আসে যায় না। এবার আদত ব্যাপারটাতে আসা যাক, কেন আমি ডায়রি শুরু করছি তার কারণটা। এর কারণ হল, আমার তেমন সত্যিকার কোনো বন্ধু নেই।

কথাটা আরেকটু খোলসা করে বলা যাক, কেননা তেরো বছরের একটি মেয়ে দুনিয়ায় নিজেকে একেবারে একা বলে মনে করে, এটা কারো বিশ্বাস হবে না, তাছাড়া তা নয়ও। আমার আছে খুব আদরের মা-বাবা আর ষোল বছরের এক দিদি। আমার চেনা প্রায় তিরিশজন আছে যাদের বন্ধু বলা যেতে পারে– আমার-একগোছা ছেলে-বন্ধু আছে, যারা আমাকে এক ঝলক দেখবে বলে উদ্‌গ্রীব এবং না পারলে, ক্লাসের আয়নাগুলোতে আমাকে লুকিয়ে লুকিয়ে দেখে। আমার আত্মীয়স্বজনেরা আছে, মাসি-পিসি কাকা-মামার দল, তারা আমার ইষ্টিকুটুম; আর রয়েছে একটা সুখের সংসার, না– আমার কোনো অভাব আছে বলে মনে হয় না। তবে আমার সব বন্ধুরই সেই এক ব্যাপার, কেবল হাসি-তামাসা আর ঠাট্টা-ইয়ার্কি, তার বেশি কিছু নয়। মামুলি বিষয়ের বাইরে কোনো কথা বলা যায় না। আমরা কেমন যেন কিছুতেই সেরকম ঘনিষ্ঠ হতে পারি না– আসল মুশকিল সেইখানে। হতে পারে আমার আত্মবিশ্বাসের অভাব, কিন্তু সে যাই হোক, ঘটনাটা অস্বীকার করা যায় না এবং এ নিয়ে আমার কিছু করার আছে বলে মনে হয় না।

সেই কারণেই, এই ডায়রি। যে বন্ধুটির আশায় এতদিন আমি পথ চেয়ে বসেছিলাম তার ছবিটা আমার মানসপটে বড় করে ফোটাতেও চাই; আমি তাই অধিকাংশ লোকের মতন আমার ডায়রিতে একের পর এক নিছক ন্যাড়া ঘটনাগুলোকে সাজিয়ে দিতে চাই না; তার বদলে আমি চাই এই ডায়রিটা হোক আমার বন্ধু, আমার সেই বন্ধুকে আমি কিটি বলে ডাকব। কিটিকে লেখা আমার চিঠিগুলো যদি হঠাৎ দুম্‌ করে শুরু করে দিই তাহলে আমি কী বলছি কেউ বুঝবে না; সেইজন্যে আরম্ভে খানিকটা অনিচ্ছার সঙ্গে মাত্র কয়েকটা আঁচড়ে আমার জীবনের ছবি ফুটিয়ে তুলব।

মাকে যখন বিয়ে করেন তখন আমার বাবার বয়স ছত্রিশ আর মার বয়স পঁচিশ। আমার দিদি মারগট হয় ১৯২৬ সালে ফ্রাঙ্কফোর্ট-অন-মাইন শহরে, তারপর হই আমি– ১৯২৯-এর ১২ই জুন। আমরা ইহুদী বলে ১৯৩৩ সালে আমরা হল্যাণ্ডে চলে যাই, সেখানে আমার বাবা ট্রাভিস্ এন.ভি.-র ম্যানেজিং ডিরেক্টর নিযুক্ত হন। যে কোলেন অ্যাণ্ড কোম্পানীর সঙ্গে এর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, তার অফিস একই বাড়িতে– আমার বাবা তার পার্টনার।

আমাদের পরিবারের বাকি সবাইয়ের ওপর অবশ্য হিটলারের ইহুদী বিরোধী বিধি-বাঁধনের পুরো চোট এসে পড়েছে, কাজেই জীবন ছিল দুর্ভাবনায় ভরা। যে সময়টা ইহুদীদের দ্যাখ্-মার করা হয়, তার ঠিক পরে ১৯৩৮ সালে আমার দুই মামা পালিয়ে আমেরিকায় চলে যান। আমার বুড়ি-দিদিমা আমাদের কাছে চলে আসেন, তাঁর বয়স তখন তিয়াত্তর। ১৯৪০ সালের মে মাসের পর দেখতে দেখতে সুদিন উধাও হতে থাকে। প্রথমে তো যুদ্ধ, তারপর

আত্মসমর্পণ, আর তারপরই জার্মানদের পদার্পণ। ওরা পৌঁছুনোর সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ইহুদীদের লাঞ্ছনা দস্তরমত শুরু হয়ে গেল। দ্রুত পর্যায়ে একের পর এক ইহুদীবিরোধী ফরমান জারি হতে লাগল। ইহুদীদের অবশ্যই হলদে তারা (যাতে আলাদাভাবে তাদের চেনা যায় সেইজন্যে জার্মানরা সমস্ত ইহুদীকে একটি করে ছয় মুখো হলুদ রঙের তারা সকলের চোখে পড়ার মতো করে পরতে বাধ্য করেছিল) পরতে হবে, ইহুদীদের সাইকেলগুলো অবশ্যই জমা দিতে হবে, রেলগাড়িতে ইহুদীদের চড়া নিষিদ্ধ এবং গাড়ি চালানোও তাদের বারণ। কেবল তিনটে থেকে পাঁচটার মধ্যে ইহুদীরা সওদা করতে পারবে এবং তাও একমাত্র 'ইহুদীদের দোকান' বলে প্ল্যাকার্ড-মারা দোকানে। আটটার মধ্যে ফিরে ইহুদীদের ঘরে আটক থাকতে হবে। ঐ সময়ের পর এমন কি নিজের বাড়ির বাগানেও বসা চলবে না। থিয়েটার, সিনেমা এবং অন্যান্য আমোদ-প্রমোদের জায়গায় ইহুদীরা যেতে পারবে না। সাধারণের খেলা-ধুলোয় ইহুদীরা যেন যোগ না দেয়। সাঁতারের জায়গা, টেনিস, কোর্ট, হকির মাঠ এবং খেলাধুলোর অন্যান্য জায়গা– সবই তাদের জন্যে নিষিদ্ধ। ইহুদীরা যেন খৃষ্টানদের বাড়িতে না যায়। ইহুদীরা অবশ্যই যাবে ইহুদী স্কুলে। এই রকমের অনেক বিধিনিষেধ জারি হল।

আমরা এটা করতে পারি না, ওটা করা নিষিদ্ধ– এইরকম অবস্থা। কিন্তু তা সত্ত্বেও দিন কেটে যেতে লাগল। য়োপি আমাকে বলত, 'যা কিছু করতে যাও তাতেই ভয়; বলা যায় না, হয়ত বারণ আছে।' আমাদের স্বাধীনতায় বেজায় ধরকাট। তবু সওয়া যাচ্ছিল।

১৯৪২-এর জানুয়ারিতে দিদু মারা গেলেন; আজও কিভাবে তিনি আমার হৃদয়মন জুড়ে আছেন, আমি তাঁকে কতটা ভালবাসি– সে কথা কেউ কখনও বুঝবে না।

১৯৩৪ সালে মন্টেসরি কিণ্ডারগার্টেনে আমার হাতেখড়ি, তারপর সেখানেই পাড়্ডনো করি। ৬-খ শ্রেণীতে পড়ার সময় ইস্কুলের বৎসরান্তে মিসেস কে.ভে-এর কাছ থেকে আমাকে বিদায় নিতে হল। দুজনেই কেঁদে ফেললাম, মনও খুব খারাপ হয়ে গেল। ১৯৪১ সালে দিদি মারগটের সঙ্গে আমি গেলাম ইহুদী মাধ্যমিক ইস্কুলে– দিদি ভর্তি হল চতুর্থ শ্রেণীতে আর আমি প্রাথমিক শ্রেণীতে।

এ পর্যন্ত আমরা চারজনে নির্ঝঞ্ঝাটে আছি। এরপর আসব আজকের কথায়।

শনিবার, ২০ জুন, ১৯৪২

আদরের কিটি,

বিনা বাক্যব্যয়ে শুরু করে দেব। বাড়িটা এখন নীরব নিস্তব্ধ, মা-মণি আর বাপি বেরিয়েছেন আর মারগট গেছে ওর কিছু বন্ধুর সঙ্গে পিং-পং খেলতে।

ইদানীং আমি নিজেও পিং-পং খেলছি। আমরা যারা পিং-পং খেলি, আইসক্রিমের ওপর আমাদের একটু বেশি টান- বিশেষ করে গরমকালে, খেলতে খেলতে যখন শরীর তেতে যায়। কাজেই সচরাচর খেলার পর আমরা চলে যাই সবচেয়ে কাছাকাছি আইসক্রিমের দোকানে– ডেল্‌ফি কিংবা ওয়াসিসে– যেখানে ইহুদীরা যেতে পারে। বাড়তি হাত-খরচার জন্যে হাত পাতা আমরা এখন ছেড়ে দিয়েছি। ওয়াসিসে আজকাল প্রায়ই লোকজনে ভর্তি থাকে; আমাদের চেনাশহর বেশ বড় হওয়ায়, তার মধ্যে আমরা সব সময়ই কোনো না কোনো মহাশয় লোক বা ছেলেবন্ধু জুটিয়ে ফেলি। তারা আমাদের এত আইসক্রিম দেয় যা পুরো সপ্তাহ গোগ্রাসে গিলেও আমরা শেষ করতে পারি না।

আমাকে এই বয়সে ছেলে-বন্ধুর কথা মুখ ফুটে বলতে দেখে তুমি বোধহয় খানিকটা

অবাক হবে। হায়, আমাদের যা ইস্কুল তাতে এটা কারো পক্ষে এড়ানো সম্ভব বলে মনে হয় না। যেই কোনো ছেলে আমার সঙ্গে সাইকেল চালিয়ে বাড়ি ফিরতে চাইল এবং আমরা কথা কইতে শুরু করে দিলাম– ব্যস, অমনি সে আকণ্ঠ প্রেমে পড়ে যাবে এবং স্রেফ সে আমাকে তার চোখের আড়াল হতে দেবে না; আমি ধরে নিতে পারি দশবারের মধ্যে নয় বারই এরকম ঘটবে। অবশ্য দিনকতক গেলেই সব পানি হয়ে যায়; বিশেষত যখন দেখে যে, অত সব জুল জুল করে তাকানো-টাকানো আদৌ গায়ে না মেখে আমি দিব্যি মনের আনন্দে সাইকেলে প্যাডেল করে চলেছি।

ব্যাপারটা যদি আরেকটু বেশি গড়ায়, বাবার কাছে কথা পাড়ার কথা ওরা বলতে আরম্ভ করে– সঙ্গে সঙ্গে সাইকেলটাকে একটু হেলিয়ে দিই, আমার কাঁধে ঝোলানো ব্যাগটা পড়ে যায়। ছেলেটিকে তখন তার সাইকেল থেকে নামতেই হয়, আমাকে সে ব্যাগটা কুড়িয়ে দেয়। সেই ফাঁকে অন্য দিকে আমি কথার মোড় ঘোরাই।

এরা সব একেবারেই নিরীহ ধরনের ছেলে; কিছু আছে দেখবে যারা চুমো ফুঁকে দেয় কিংবা খপ্ করে হাত ধরার চেষ্টা করে– সেক্ষেত্রে তারা অবশ্যই ভুল দরজায় কড়া নাড়ে! সঙ্গে সঙ্গে সাইকেল থেকে আমি নেমে পড়ে বলি ওদের সঙ্গে আর একপাও যাব না; কিংবা ইজ্জত নষ্ট হওয়ার ভাব দেখিয়ে সাফ সাফ ওদের কেটে পড়তে বলি।

আমাদের বন্ধুত্বের ভিত গড়া হল। আজকের মত এখানেই ইতি।

তোমার আনা

রবিবার, ২১ জুন, ১৯৪২

আদরের কিটি,

আমাদের খ-১ ক্লাসের সকলেরই হাঁটু কাঁপছে, তার কারণ টিচারদের মিটিং আসন্ন। কে কে ওপরের ক্লাসে উঠবে আর কে কে পড়ে থাকবে, এই নিয়ে জোর জল্পনা-কল্পনা চলেছে। আমাদের পেছনে বসে ভিম্ আর য়াক্; ছেলে দুটির ব্যাপার-স্যাপার দেখে মিপ্ দ্য য়োং আর আমি বেজায় মজা পাচ্ছি। যে ভাবে ওরা বাজি ধরে চলেছে তাতে ছুটিতে ওদের হাতে আর একটা পয়সাও থাকবে না। 'তুমি উঠবে', 'উঠব না', 'উঠবে',–উদয়াস্ত এই চলেছে। এমন কি মিপ্ও ওদের চুপ করতে বলে, আমি রেগে গলা বের করি– তাও ওদের থামানো যায় না।

আমার মতে, সিকি ভাগের উচিত যারা যে ক্লাসে আছে সেই ক্লাসেই থেকে যাওয়া। কিছু আছে একেবারেই নিরেট। কিন্তু টিচাররা দুনিয়ার সবচেয়ে আজব চিড়িয়া; কাজেই তাঁরা হয়ত নেহাৎ খেয়ালবশেই জীবনে এই একবার ঠিক কাজ করে বসবেন।

আমার মেয়ে-বন্ধুদের ক্ষেত্রে আর আমার নিজের ব্যাপারে আমি ভয় পাচ্ছি না। আমরা কোনরকমে *ঠেলেঠুলে* বেরিয়ে যাব। অবশ্য আমার অঙ্কের ব্যাপারে আমি খুব নিশ্চিন্ত নই। তবু আমরা আর যা হোক ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে পারি, ইতিমধ্যেই আমরা পরস্পরকে খোশ মেজাজে রাখছি।

আমাদের টিচার মোট নয় জন– সাতজন শিক্ষক আর দুই জন শিক্ষয়িত্রী। ওঁদের সকলের সঙ্গেই আমার বেশ বনিবনা। আমাদের বুড়ো অঙ্কের মাস্টার মিস্টার কেপ্টর অনেকদিন অব্দি আমার ওপর খুব বেজার ছিলেন, কারণ আমি একটু বেশি বকবক করি। ফলে, 'একজন বাচাল'–এই বিষয়ে আমাকে একটা রচনা লিখতে হয়েছিল। একজন বাচাল!

ও বিষয়ে কী-ই বা লেখা যায়? যাই হোক, ও নিয়ে পরে মাথা ঘামানো যাবে– মনে মনে এটা ঠিক করে আমার নোট বইতে টুকে রাখলাম। তারপর চেষ্টা করলাম নির্বিকার থাকতে।

সেদিন সন্ধ্যেবেলায় অন্যান্য বাড়ির কাজ যখন শেষ করে ফেলেছি, হঠাৎ আমার নোটবইতে লেখা শিরোনামাটার দিকে আমার নজর গেল। ফাউন্টেন পেনের শেষ প্রান্তটা দাঁত দিয়ে খুঁটতে খুঁটতে, আমি ভাবতে লাগলাম– গোটা গোটা অক্ষরে বেশ ফাঁক-ফাঁক করে শব্দ সাজিয়ে যে-কেউ কিছুটা আবোল-তাবোল লিখে যেতে পারে; কিন্তু মুশকিল হল বকবক করার আবশ্যকতা নিঃসন্দেহে প্রমাণ করা। ভাবতে-ভাবতে, হঠাৎ মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল– তখনই বসে আমার ভাগের তিনটি পৃষ্ঠা ভরিয়ে ফেললাম। আর লিখে তৃপ্তিও পেলাম ষোল আনা। আমার যুক্তিগুলো ছিল এই– বকবক করাটা হল মেয়েলী স্বভাব; আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করব এই স্বভাবের রাশ টেনে রাখতে, কিন্তু আমার এ রোগ একেবারে সারবে না, কেন না আমার মা আমার মতই বকবক করেন– সম্ভবত তার চেয়েও বেশি। রক্তের সূত্রে পাওয়া গুণগুলো নিয়ে কে-ই বা কী করতে পারে?

আমার যুক্তিগুলো দেখে মিস্টার কেপ্টর না হেসে পারেননি, কিন্তু পরের বারের পড়াতেও সমানে বকর বকর করতে থাকায় আরেকটি রচনার বোঝা ঘাড়ে এসে গেল। এবারের বিষয় হল 'সংশোধনের অযোগ্য বাচাল'; লিখে যথারীতি তাঁর হাতে দেওয়ার পর পুরো দুই বারের পড়ায় তিনি আর কোনো উচ্চবাচ্য করেননি। কিন্তু তৃতীয় বারের পড়ার দিনে তাঁর পক্ষে আর চুপ করে থাকা সম্ভব হয়নি। 'কথা বলা'র শাস্তি হিসেবে আমাকে একটা রচনা লিখতে হবে, তার নাম হল 'বক্‌বক্‌চঞ্চুর গিন্নী বলল, 'প্যাক্-প্যাক্-প্যাক্'। সারা ক্লাস অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল। আমাকেও হাসতে হল বটে, কিন্তু এটা বেশ মালুম হল যে, এ-বিষয়ে নতুন কিছু উদ্ভাবনের শক্তি আমি ফুরিয়ে ফেলেছি। আমাকে তখন এমন জিনিস ভেবে বের করতে হল যা পুরোপুরি মৌলিক। আমার বরাত ভালো ছিল, কেননা আমার বন্ধু সানা ভালো কবিতা লেখে- সানা বলল পুরো রচনাটাই সে পদ্য করে লিখে দেবে। আমি তো আনন্দে লাফিয়ে উঠলাম। কেপ্টর চেয়েছিলেন এই রকম কিম্ভূত বিষয়ের প্যাঁচে ফেলে আমাকে বোকা বানাতে। আমি তার শোধ তুলব; সারা ক্লাসের কাছে তাঁকেই বরং হাস্যাস্পদ করে ছাড়ব। পদ্যটা লেখা হয়ে গেল– হল একেবারে নিখুঁত। এক মা-হাঁস আর এক রাজহংস বাবার তিনটি ছিল ছানাপোনা। তারা বড় বেশি বকবক করত বলে বাপ ওদের কামড় দিয়ে মেরে ফেলে। ভাগ্য ভালো যে, কেপ্টর এর রসটা ধরতে পারেন; ক্লাসে তিনি টীকাটিপ্পনি সমেত জোরে জোরে পদ্যটা যেমন আমাদের ক্লাসে, তেমনি আরও অন্যান্য ক্লাসেও পড়ে শোনান।

তারপর থেকে ক্লাসে আমি অবাধে কথা বলতে পারি, আমার ঘাড়ে বাড়তি কাজ চাপানো হয় না; বস্তুত কেপ্টর সমস্ত সময়ই ব্যাপারটা নিয়ে তামাসা করেন।

তোমার আনা

বুধবার, ২৪ জুন, ১৯৪২

আদরের কিটি,

এখন সব আগুনে সেদ্ধ হচ্ছে, প্রচণ্ড গরমে আমরা সব রীতিমত গলে যাচ্ছি। আর ঠিক সেই সময় আমাকে সর্বত্র ঘুরে বেড়াতে হচ্ছে পায়ে হেঁটে। ট্রাম যে কত ভালো জিনিস এখন আমি তা পুরোপুরি উপলব্ধি করতে পারছি; কিন্তু ট্রামে চড়ার বিলাস ইহুদীদের পক্ষে নিষিদ্ধ– আমাদের পক্ষে পা-গাড়িই প্রশস্ত। কাল দুপুরে টিফিনের সময়টাতে আমাকে যেতে হয়েছিল

য়ান লুইকেন স্ট্রাটে দাঁতের ডাক্তারের কাছে। দুপুরের পর ফিরে ইস্কুলে আরেকটু হলেই আমি ঘুমিয়ে পড়তাম। ভাগ্য ভালো, দাঁতের ডাক্তারের সহকারিণী ছিলেন খুব দয়ালু, তিনি আমাকে খানিকটা পানীয় দিয়েছিলেন– মানুষটি বড় ভালো।

ফেরী নৌকোয় আমরা পার হতে পারি– ব্যস, ঐ পর্যন্ত। য়োসেফ ইস্‌রাইলস্কাডে থেকে একটা ছোট বোট ছাড়ে, সেখানে বোটের লোকটিকে বলতেই সে আমাদের তৎক্ষণাৎ তুলে নিল। আজ আমাদের যে কষ্টের একশেষ তার জন্যে কিন্তু ওলন্দাজরা দায়ী নয়।

ইস্কুলে যেতে না হলে বাঁচতাম– কেননা ঈস্টারের ছুটিতে আমার সাইকেলটা চুরি হয়ে গেছে আর মা-মণিরটা বাপি দিয়েছেন এক খৃস্টান পরিবারকে নিরাপদে রাখার জন্যে। তবু রক্ষে, সামনে ছুটি– আর এক হপ্তা কাটাতে পারলেই আমাদের শান্তি। কাল একটা মজার ব্যাপার হল; সাইকেল রাখার আড়তটা পেরোচ্ছি, এমন সময় একজন আমার নাম ধরে ডাকল। এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখি সেই সুন্দর দেখতে ছেলেটা, পরশু সন্ধ্যেবেলায় আমার মেয়ে-বন্ধু ইভাদের বাড়িতে যার সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। লাজুক-লাজুক ভাব করে এগিয়ে এসে হ্যারি গোল্ডবার্গ বলে সে তার পরিচয় দিল। আমি একটু থতমত খেয়ে ঠিক ধরতে পারছি না ছেলেটা কী চাইছে। কিন্তু আমাকে বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। ইস্কুল অব্দি আমার সঙ্গে সে গেলে আমার আপত্তি হবে কিনা এটা সে জানতে চাইল। আমি বললাম, 'তুমি তো ঐ রাস্তাতেই যাচ্ছ, চলো আমিও যাচ্ছি'– এই বলে দুজনে হাঁটতে লাগলাম। হ্যারির বয়েস ষোল; ওর ঝুলিতে আছে মজাদার সব গল্প। আজ সকালেও রাস্তায় ও আমার জন্যে দাঁড়িয়ে ছিল। আমার মনে হয় এবার থেকে রোজই থাকবে।

তোমার আনা

মঙ্গলবার, ৩০ জুন, ১৯৪২

আদরের কিটি,

এর আগে একদণ্ড সময় পাইনি তোমাকে লেখার। বৃহস্পতি বার সারাটা দিন বন্ধুদের সঙ্গে কেটেছে। শুক্রবার বাড়িতে অতিথিরা এসেছিল, আজ অবধি এইভাবে একটার পর একটা। এই একটা সপ্তাহে হ্যারি আর আমি পরস্পর সম্পর্কে বেশ খানিকটা জেনেছি; হ্যারি ওর জীবনের অনেক বৃত্তান্ত আমাকে বলেছে। হল্যাণ্ডে ও একা এসেছে। ও এখন ওর দাদু-দিদিমার কাছে থাকে। হ্যারির বাবা-মা থাকেন বেলজিয়ামে। ফ্যানি বলে হ্যারির এক মেয়ে-বন্ধু ছিল। ফ্যানিকেও আমি চিনি। খুব নরম প্রকৃতির খাটো ধরনের মেয়ে। আমাকে দেখার পর হ্যারির মনে হচ্ছে সে এতদিন ফ্যানির সান্নিধ্যে দিবাস্বপ্ন দেখত। আমার উপস্থিতিতে এমন কিছু সে পায় যা তাকে জাগিয়ে রাখে। দেখছ তো, আমরা সকলেই কোনো না কোনো কাজে লাগি এবং কখনও কখনও সেসব অদ্ভুত ধরনের কাজ! য়োপি শনিবার রাত্তিরে এখানে ছিল, তবে রবিবার লিস্‌দের ওখানে চলে যায়; সময় যেন কাটতেই চাইছিল না। কথা ছিল হ্যারি সন্ধ্যেবেলায় আসবে। ছ-টা নাগাদ সে ফোন করলে আমি গিয়ে ধরলাম। হ্যারির গলা, 'আমি হ্যারি গোল্ডবার্গ, দয়া করে আনাকে একটু ডেকে দেবেন?'

'হ্যাঁ, হ্যারি, আমি আনা বলছি'

'হ্যালো, আনা, কেমন আছ?'

'খুব ভালো, ধন্যবাদ।'

'আজ সন্ধ্যেবেলা আসতে পারছি না বলে আমার খুব খারাপ লাগছে, কিন্তু তবু শুধু

একটু কথা বলে আসতে চাই। দশ মিনিটের মধ্যে আসছি– অসুবিধে হবে না তো?'

'মোটেই না। এসো কিন্তু।'

'আচ্ছা, ছাড়ছি। এখুনি এসে যাব।'

রিসিভারটা রাখলাম।

চটপট ফ্রক বদলে ফেলে মাথার চুল একটু আঁচড়ে নিলাম। তারপর হ্যারির পথ চেয়ে দুরুদুরু বক্ষে জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। অবশেষে দেখতে পেলাম ও আসছে। দেখামাত্র দৌড়ে নিচে ছুটে গেলাম না যে, সেটাই আশ্চর্য। তার বদলে ও বেল্ না বাজানো পর্যন্ত আমি ঠায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করলাম। তারপর নিচে গেলাম। আমি দরজা খুলবামাত্র হ্যারি ছিট্‌কে ভেতরে এল। 'আনা, আমার দিদিমা মনে করেন তোমার মতো ছোট্ট মেয়ের আমার সঙ্গে প্রতিদিন বাড়ির বাইরে যাওয়া ঠিক নয়, উনি মনে করেন আমার উচিত লোর্স-এ যাওয়া। তবে এটা তুমি আশাকরি জানো যে, আমি আর এখন ফ্যানিকে নিয়ে বেড়াতে বের হই না?'

'জানি না তো; কেন, তোমরা কি আড়ি করেছ?'

'না, না, তা নয়। আমি ফ্যানিকে বলেছি যে, আমাদের দুজনের ঠিক পটে না; সুতরাং দুজনে মিলে বাইরে বের না হওয়াই আমাদের পক্ষে ভালো। অবশ্য আমাদের বাড়িতে সবাই সব সময়ই তাকে স্বাগত জানাবে; তেমনি আশাকরি ওর বাড়িতেও আমার জন্যে দ্বার অবারিত থাকবে। দেখ, আমি ভেবেছিলাম ফ্যানি অন্য একটি ছেলের সঙ্গে বেরোয়; ওর সঙ্গে আমার ব্যবহারটাও হয়েছিল সেইরকম। কিন্তু ব্যাপারটা আদৌ সত্যি ছিল না। এখন আমার মামা বলেন আমার উচিত ফ্যানির কাছে ক্ষমা চাওয়া। আমার বয়ে গেছে। সুতরাং গোটা ব্যাপারটাই আমি কাটাকাটি করে দিয়েছি। ওটা তো ছিল আরও অনেক কারণের মধ্যে মাত্র একটি।

আমার দিদিমার ইচ্ছে, তোমার সঙ্গে না গিয়ে আমি ফ্যানির সঙ্গে যাই; কিন্তু আমি তা করব না। বুড়োমানুষদের মাথায় মাঝে মাঝে এমন বিকট সেকেলে সব ধারণা চেপে বসে! কিন্তু ওদের গোড়ে গোড় দিয়ে চলতে পারব না। দাদু-দিদিমাকে ছাড়া যেমন আমার চলবে না, তেমনি এক হিসেবে আমাকে ছাড়াও ওঁদের চলবে না। এবার থেকে বুধবারের সন্ধ্যেগুলো আমি ফাঁকা পাব।

দাদু-দিদিমার মন রাখার জন্যে আমি নামে কাঠখোদাইয়ের ক্লাস করতে যাই– কিন্তু আদতে যাই জিওনিস্ট-পন্থীদের সভাসমিতিতে। আমার যাওয়ার কথা নয়, কেননা আমার দাদু-দিদিমারা জিওনিস্টদের খুবই বিরুদ্ধে।

আমি আদৌ ধর্মান্ধ নই, কিন্তু ওদিকে আমার একটা ঝোঁক আছে আর মনটাও টানে। কিন্তু ইদানীং এই নিয়ে এমন একটা হ-য-ব-র-ল সৃষ্টি হয়েছে যে আর আমি এর মধ্যে থাকছি না; পরের বুধবারই হবে আমার শেষ যাওয়া। তারপর থেকে বুধবারের সন্ধ্যেগুলো, শনিবারের বিকেল, রবিবারের বিকেল এবং হয়ত আরও কোনো কোনো দিন তোমার সঙ্গে আমার দেখা হবে।'

'কিন্তু তোমার দাদু-দিদিমারা তো এটা চান না; তাঁদের ফাঁকি দিয়ে তুমি এটা করতে পারো না।'

'ভারবাসা ঠিকই তার পথ করে নেয়।'

এরপর আমরা মোড়ের মাথায় বইয়ের দোকানটা পেরোতেই দেখি আরও দুটি ছেলের

সঙ্গে পেটার ভেসেল্‌ দাঁড়িয়ে; পেটার বলল, 'আরে, কী খবর'?– দীর্ঘদিন পর সে আমার সঙ্গে এই প্রথম কথা বলল; আমি সত্যিই খুশী হলাম।

হ্যারি আর আমি হাঁটছি তো হাঁটছিই। শেষকালে ঠিক হল, কাল সন্ধ্যে সাতটার পাঁচ মিনিট আগে হ্যারিদের বাড়ির সামনে আমাদের দেখা হবে।

তোমার আনা

শুক্রবার, ৩ জুলাই, ১৯৪২

আদরের কিটি,

কাল হ্যারি আমাদের বাড়িতে এসেছিল বাবা-মার সঙ্গে আলাপ করতে। আমি কিনে এনেছিলাম ক্রীম কেক, মিষ্টি, চা আর বাছাই করা বিস্কুট, বেশ পছন্দসই সব খাবার। কিন্তু আমি বা হ্যারি, আমরা কেউই চাইনি হাত-পা গুটিয়ে অনির্দিষ্টকাল বাড়ি বসে থাকতে। কাজেই আমরা বেরিয়ে পড়েছিলাম হাঁটতে। ও যখন আমাকে বাড়ি পৌছে দিয়ে গেল তখন দেখি আটটা বেজে দশ। বাবা তো রেগে কাঁই; বললেন, আমি খুব অন্যায় করেছি; কারণ আটটার পর ইহুদীদের বাইরে থাকা খুবই বিপজ্জনক। আমাকে কথা দিতে হল যে, এরপর থেকে আটটা বাজার দশ মিনিট আগেই আমি বাড়ি ফিরব।

কাল হ্যারিদের বাড়িতে আমাকে যেতে বলেছে। আমার মেয়ে-বন্ধু য়োপি সারাক্ষণ হ্যারি হ্যারি করে আমার পেছনে লাগে। না গো, আমি সত্যিই কিন্তু প্রেমে পড়িনি। কিছু ছেলে-বন্ধু তো আমার থাকতেই পারে– কেউ ও নিয়ে মাথা ঘামায় না– তবে একজন ছেলে-বন্ধু অথবা মা যাকে বলেন বল্লভ, অন্যদের চেয়ে সে যেন আলাদা।

একদিন সন্ধ্যেবেলায় হ্যারি গিয়েছিল ইভাদের বাড়িতে। ইভা বলল হ্যারিকে ও জিগ্যেস করেছিল, 'ফ্যানি না আনা–কাকে তোমার সবচেয়ে বেশী ভালো লাগে?' হ্যারি বলেছিল, 'সে তোমার জেনে কাজ নেই।' কিন্তু চলে যাবার আগে (বাকি সন্ধ্যেটা ওরা বাক্যালাপ বন্ধ করে দিয়েছিল), 'শোনো তবে, সেই মেয়ে হল আনা, এখন পর্যন্ত– কিন্তু কাউকে বলবে না।' বলেই হ্যারি সাঁ করে বেরিয়ে গিয়েছিল।

দেখেই বোঝা যায় হ্যারি আমার প্রেমে পড়েছে, এর মধ্যে তবু একটু মজা আছে, মন্দ কি। মারগট বলবে, 'হ্যারি খাসা ছোকরা!' হ্যাঁ, তবে সেটাই সব নয়। মা তো তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ; যেমন দেখতে ভালো, তেমনি সুন্দর আচার-ব্যবহার, চমৎকার ছেলেটি। আমার ভালো লাগে, বাড়ির সবাই ওকে পছন্দ করে। হ্যারিরও সবাইকে পছন্দ। ও অবশ্য মনে করে আমার মেয়ে-বন্ধুরা বড় বেশি খুকি-খুকি . হ্যারি মিথ্যে বলে না।

তোমার আনা

রবিবার, ৫ জুলাই, ১৯৪২

আদরের কিটি,

ইহুদী নাট্যনিকেতনে আমাদের পরীক্ষার ফলাফল ঘোষণা করা হল। আমি এর চেয়ে ভালো আশা করিনি। আমার রিপোর্ট মোটেই খারাপ নয়। একটাতে 'খুব ভালো', বীজগণিতে একটা পাঁচ মার্কা, দুটোতে ছয়, আর বাকিগুলোতে কোনোটাতে সাত, কোনোটাতে আট। বাড়ির লোকেরা খুশী হয়েছে তো বটেই, তবে আমার মা-বাবা নম্বরের ব্যাপারে আদৌ অন্যদের মত নন। রিপোর্টের ভাল-মন্দ নিয়ে ওঁদের কোনো মাথাব্যথা নেই। আমি সুখে-

স্বচ্ছন্দে বহাল তবিয়তে আছি, একেবারে বাঁদর হয়ে যাইনি– এটা দেখলেই ওঁরা খুশী। ওঁরা মনে করেন, বাকিটা আপ্‌সে হয়ে যাবে। আমার ঠিক তার উল্টো। আমি পড়াশুনো খারাপ হতে চাই না। মন্টেসরী ইস্কুলে প্রকৃতপক্ষে সপ্তম শ্রেণীতেই আমার থেকে যাওয়ার কথা, কিন্তু ইহুদী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে আমাকে নিয়ে নেওয়া হল। ইহুদী ইস্কুলে ভর্তি হওয়া যখন সমস্ত ইহুদী ছেলেমেয়েদের পক্ষে বাধ্যতামূলক হল, তখন খানিকটা অনুনয় বিনয় করার ফলে তবে হেডমাস্টার মশাই আমাকে আর লিস্‌কে শর্তাধীনে ইস্কুলে নিয়েছিলেন। তিনি বিশ্বাস করেছিলেন যে, আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করব। আমি তাঁর আশাভঙ্গ করতে চাই না। আমার দিদি মারগটও তার রিপোর্ট পেয়েছে; এবারও সে দারুণ ভালো করেছে। ইস্কুলে 'সপ্রশংস' গোছের কোনো ব্যবস্থা থাকলে সেটা পেয়েই সে ওপরে উঠতে পারত, ও যা মাথাওয়ালা মেয়ে! বাবা ইদানীং খুব বেশি সময় বাড়িতেই থাকেন, কেন না ব্যবসার ক্ষেত্রে বাবার কিছু করার নেই; নিজেকে ফালতু বলে ভাবতে নিশ্চয়ই খুব জঘন্য লাগে। ট্রাভিস নিয়ে নিয়েছেন মিস্টার কুপহুইস; কোলেন অ্যাণ্ড কোম্পানী চলে গিয়েছে মিস্টার ক্রালারের হাতে। কদিন আগে আমাদের ছোট চত্বরটা হেঁটে পার হওয়ার সময় আমাদের গা-ঢাকা দিয়ে থাকার কথাটা বাবা পাড়লেন। আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, কী এমন ঘটল যে হঠাৎ দুম করে এখনই একথা তিনি বলতে শুরু করলেন। বাবা বললেন, 'দেখ্‌ আনা, তুই তো জানিস যে, আজ এক বছরেরও বেশি দিন ধরে অন্য লোকদের সমানে আমরা খাবারদাবার, জামাকাপড়, আসবাবপত্র যুগিয়ে আসছি। আমরা চাই না জার্মানরা আমাদের যথাসর্বস্ব কব্জা করুক, তেমনি আমরা নিশ্চয়ই চাই না নিজেরা স্বয়ং ওদের কবলে গিয়ে পড়তে। কাজেই ওরা কবে আসবে, এসে তুলে নিয়ে যাবে– তার অপেক্ষায় না থেকে আমরা বরং নিজেদের গরজেই গা-ঢাকা দেব।'

বাবা এমন গুরুতরভাবে কথাগুলো বললেন যে, আমার গলাতেও খুব ব্যগ্রতা ফুটে উঠল, 'তাহলে, বাবা, এটা হবে কবে নাগাদ?'

'ও নিয়ে তুই উতলা হোস নে, আমরা সময়মত সব ঠিক করে ফেলব। যতদিন পারিস, কচি বয়েস তোর, গায়ে ফুঁ দিয়ে বেড়া।' ব্যস, কথা শেষ। হায়, এই অলুক্ষণে কথাগুলো ফলতে যেন যুগ যুগ দেরি হয়!

তোমার আনা

বুধবার, ৮ জুলাই, ১৯৪২

আদরের কিটি,

রবিবার থেকে আজ– এই কয়েকটা দিন মনে হল যেন কয়েকটা বছর। কত কিছু যে ঘটে গেছে এর মধ্যে। গোটা পৃথিবীটা যেন মাটিতে উল্টে পড়েছে। কিন্তু এখনও আমি প্রাণে বেঁচে রয়েছি, কিটি– বাবার মতে, সেটাই বড় কথা।

এখনও বেঁচে আছি ঠিকই, তবে জিজ্ঞেস করো না যেন– কোথায় আর কিভাবে। তুমি মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝবে না, যতক্ষণ না রবিবার বিকেলে কী ঘটেছিল তোমাকে বলছি।

বেলা তখন তিনটে (হ্যারি সবে চলে গেছে, যাবার সময় বলেছে পরে আবার আসবে) সামনের দরজায় কে যেন বেল্‌ বাজাল। আমি তখন বারান্দায়, রোদ্দুরে গা এলিয়ে দিয়ে একটা বই পড়ছি; ফলে, আমি শুনতে পাইনি। খানিকক্ষণ পরে মারগটকে দেখলাম, রান্নাঘরের দরজায়; তার চোখমুখ লাল। ফিসফিস করে বলল, 'ঝটিকা-বাহিনী থেকে বাপির

নামে শমন পাঠিয়েছে। মা-মণি সঙ্গে সঙ্গে মিস্টার ফান ডানের সঙ্গে-দেখা করতে চলে গেছেন।' (ফান ডান হলেন ব্যবসাতে বাবার সহকর্মী এক বন্ধু)। শমন এসেছে শুনে তো আমার বুক হিম হয়ে গেল; শমন আসার যে কী মানে তা সকলেই জানে। বন্দীশিবির আর নির্জন কুঠুরির ছবিটা মনের মধ্যে ভেসে উঠল– বাপিকে কি আমরা নিশ্চিত মৃত্যুর হাতে ছেড়ে দেব? দুজনে তখন অপেক্ষা করছি; মারগট স্পষ্ট ভাষায় বলল, 'বাবা অবশ্যই যাবেন না। আমরা কাল আমাদের গোপন ডেরায় চলে যাব কিনা, মা-মণি গেছেন সেই নিয়ে ফান ডানের সঙ্গে আলোচনা করতে। ফান ডান পরিবারও আমাদের সঙ্গে যাবে। সুতরাং সর্বসাকুল্যে আমরা হব সাতজন।' তারপর চুপ। দুজনের কেউই কিছু বলছি না, আমাদের মাথায় তখন বাপির সম্বন্ধে চিন্তা। বাপি গেছেন যূড্‌সে ইন্‌ভালিডেতে কয়েকজন বুড়োবুড়িকে দেখতে, এদিকে কী ঘটছে তার বিন্দুবিসর্গ তিনি জানেন না। একে গরম, তার ওপর কী-হয় কী-হয় ভাব নিয়ে আমরা মা-মণির ফিরে আসার অপেক্ষায়; সব মিলিয়ে আমরা বেজায় সন্ত্রস্ত হয়ে রয়েছি, আমাদের কারো মুখে কোনো কথা নেই।

হঠাৎ দরজায় আবার বেল বাজল। আমি বললাম, 'হ্যারি এসেছে। মারগট আমাকে টেনে ধরল, 'দরজা খুলিস নে।' কিন্তু তার দরকার ছিল না, কেননা ঠিক সেই সময় নিচের তলায় আমরা মা-মণি আর মিস্টার ফান ডানের গলা পেলাম, ওঁরা হ্যারির সঙ্গে কথা বলছিলেন। তারপর ওঁরা ভেতরে এসে বাইরের দরজাটা এঁটে দিলেন। এরপর যখনই বেল বাজার শব্দ হয় আমরা নিঃশব্দে গুঁড়ি মেরে নিচে গিয়ে দেখে আসি বাপি এলেন কিনা, আর কেউ এলে দরজা খুলি না।

মারগটকে আর আমাকে ঘর থেকে বার করে দেওয়া হল। ফান ডান, মা-মণির সঙ্গে একা কথা বলতে চান। আমাদের শোবার ঘরে আমরা যখন একা হলাম, মারগট আমাকে বলল শমনটা বাপির নামে নয়, আসলে তার নামে। শুনে আমি আরও ঘাবড়ে গিয়ে কাঁদতে শুরু করে দিলাম। মারগটের বয়েস ষোল; ওরা কি সত্যি ঐ বয়সের মেয়েদের একা তুলে নিয়ে যাবে? তবু ভালো যে, মারগট কিছুতেই যাবে না, সে কথা মা-মণি নিজেই বলেছেন; বাপি যখন আমাদের লুকিয়ে থাকার ব্যাপারে বলছিলেন, তখন সেটাই ছিল তাঁরও মনোগত অভিপ্রায়।

অজ্ঞাতবাসে যাওয়া– কোথায় যাব আমরা, শহরে না গ্রামে, বড় বাড়িতে না কুঁড়েঘরে, কবে কখন কিভাবে কোথায়...?

এমন সব প্রশ্ন যা মুখ ফুটে কাউকে জিগ্যেস করা যাবে না, আবার মন থেকে যে ঝেড়ে ফেলে দেব তাও সম্ভব নয়। আমি আর মারগট একটা স্কুলব্যাগে আমাদের সবচেয়ে জরুরি জিনিসগুলো পুরে ফেলতে শুরু করে দিলাম। প্রথমেই যেটা পুরে ফেললাম সেটা হল এই ডায়রিটা, তারপর চুল কোঁকড়া করার জিনিসপত্র, রুমাল, ইস্কুলের বই, একটা চিরুনি, পুরনো চিঠিচাপাটি; যাচ্ছি অজ্ঞাতবাসে এই ভেবে আমি ব্যাগে ভরেছি যতসব উদভুট্টে জিনিস। কিন্তু তাতে আমার কোনো খেদ নেই– আমার কাছে পোশাক-আশাকের চেয়েও ঢের বেশি অর্থবহ হল স্মৃতি।

শেষ পর্যন্ত বাপি এসে গেলেন বেলা পাঁচটায়। সন্ধ্যে নাগাদ আসতে পারেন কিনা জানতে চেয়ে মিস্টার কুপহুইসকে আমরা ফোন করলাম। ফান ডান বেরিয়ে গিয়ে মিপ্‌কে ডেকে আনলেন। ১৯৩৩ থেকে বাপির সঙ্গে মিপের ব্যবসার সম্পর্ক এবং সেই থেকে তাঁরা ঘনিষ্ঠ বন্ধু; মিপের সদ্য সদ্য বিয়ে-করা স্বামী হেংকও তাই। মিপ্ এসে তাঁর ব্যাগে কিছু জুতো, কামাকাপড়, কোট, আণ্ডারওয়্যার আর মোজা নিয়ে চলে গেলেন। বলে গেলেন

সন্ধ্যেবেলায় আবার আসবেন। তারপর বাড়ি জুড়ে বিরাজ করতে লাগল নৈঃশব্দ্য; আমাদের কারো খাওয়ার কোনো স্পৃহা নেই; তখনও বেশ গুম্‌সানো গরম ভাব এবং সব কিছুই যেন কেমন-কেমন। আমাদের ওপরের বড় ঘরটা মিস্টার গুডস্মিট বলে একজনকে ভাড়া দেওয়া হয়েছিল। স্ত্রীর সঙ্গে ওঁর ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে, ভদ্রলোকের বয়স ত্রিশের কোঠায়। এদিন সন্ধ্যেবেলায় হবি তো হ, ওঁর আবার করবার কিছু ছিল না; রাত প্রায় দশটা অব্দি উনি নেই-আঁকড়া হয়ে লেগে রইলেন; ওঁকে ভাগাতে গিয়ে একটু অভদ্র হতেই হল। এগারোটায় এলেন মিপ্‌ আর হেংক্‌ ফান সান্‌টেন। জুতো, মোজা, বই, অন্তর্বাস– আরও একবার মিপের ব্যাগ আর হেংকের লম্বা পকেটের মধ্যে গা-ঢাকা দিল এবং সাড়ে এগারোটা নাগাদ তাঁরা নিজেরাও চোখের আড়াল হলেন। ক্লান্তিতে আমার শরীর ভেঙে পড়ছিল; নিজের বিছানায় এই আমার শেষ রাত জেনেও আমি তৎক্ষণাৎ ঘুমিয়ে পড়লাম; পরদিন সকাল সাড়ে পাঁচটায় মা আমাকে ডেকে দেবার আগে পর্যন্ত আমি একেবারে ন্যাতা হয়ে ঘুমিয়েছি।

দিনটা ভাগ্যিস রবিবারের মতো অত গরম ছিল না; সারাদিন সমানে টুপটাপ করে বৃষ্টি পড়ল। আমরা এমনভাবে একগাদা জামাকাপড় গায়ে চড়িয়ে নিলাম যেন কুমেরুতে যাচ্ছি। এর একটাই কারণ ছিল– সঙ্গে যথাসম্ভব জামাকাপড় নেওয়া। সুটকেশ ভর্তি জামাকাপড় নিয়ে বাইরে বেরুনোর কথা আমাদের অবস্থায় কোনো ইহুদী স্বপ্নেও ভাবতে পারে না। আমি পরে নিয়েছি দুটো ভেস্ট, তিনজোড়া প্যান্ট, একটা ড্রেস স্যুট, তার ওপর একটা স্কার্ট, জ্যাকেট, সুতীর কোট, দুই জোড়া মোজা, লেস লাগানো জুতো। পশমের টুপি, স্কার্ফ এবং আরও কিছু কিছু; বাড়ি থেকে বেরোবার আগে আমার প্রায় দম বন্ধ হয়ে আসছিল, কিন্তু তা নিয়ে কেউ কোনো উচ্চবাচ্য করেনি।

মারগট তার ইস্কুলের ব্যাগে পড়ার বই ভর্তি করে তার সাইকেলটা আনিয়ে নিয়ে মিপের পিছু পিছু উধাও হয়ে গেল এমন কোথাও যা আমার কাছে অজানা। তখনও আমি জানতাম না আমাদের আত্মগোপনের আস্তানাটা কোথায়। সাড়ে সাতটার সময় দরজা টেনে দিয়ে আমরা বাইরে এসে দাঁড়ালাম। আমার মিনিবেড়াল মুর্‌টিয়ে ছিল একমাত্র প্রাণী যার কাছ থেকে আমি বিদায় নিলাম। প্রতিবেশীদের কাছে সে ভালোভাবেই থাকবে। এসব কথা মিস্টার গুডস্মিটের নামে একটা চিঠিতে লেখা হল।

বেড়ালের জন্যে রান্নাঘরে থাকল এক পাউণ্ড মাংস, প্রাতরাশের জিনিসপত্র টেবিলের ওপর ছড়ানো, বিছানাগুলো টান দিয়ে তোলা–দেখে মনে হবে আমরা যেন হুটপাট করে চলে গিয়েছি। লোকের কী ধারণা হবে, তা নিয়ে আমাদের মাথাব্যথা ছিল না; আমরা শুধু চেয়েছিলাম সরে পড়তে কোনরকমে পালিয়ে গিয়ে নিরাপদে পৌঁছুতে; ব্যস, শুধু এইটুকু। এর পরের কথা কালকে।

তোমার আনা

বৃহস্পতিবার, ৯ জুলাই, ১৯৪২

আদরের কিটি,

এইভাবে অবিরল বর্ষণের মধ্যে বাবা মা আর আমি হেঁটে চললাম; আমাদের প্রত্যেকের হাতে একটা করে স্কুলব্যাগ আর বাজারের থলি, তার মধ্যে ঠেসে-ঠুসে ভর্তি করা রাজ্যের জিনিস।

যেসব লোক কাজে যাচ্ছিল, তারা সহানুভূতির চেখে আমাদের দিকে তাকাচ্ছিল। তাদের মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছিল যে, তাদের গাড়িতে তারা আমাদের নিয়ে যেতে পারছে না

বলে তারা বেশ দুঃখিত; ক্যাটকেটে হলদে তারাই এর জন্যে দায়ী।

যখন আমরা বড় রাস্তায় এসে পড়লাম, কেবল তখনই মা-মণি আর বাপি একটু একটু করে গোটা ব্যাপারটা আমার কাছে ভাঙলেন। বেশ কয়েক মাস ধরে আমাদের মালপত্র এবং নিত্যব্যবহার্য যাবতীয় জিনিস যথাসম্ভব সরিয়ে ফেলা হয়েছে; অজ্ঞাতবাসের সব ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করে নিজে থেকে আমাদের চলে যাওয়ার কথা ছিল জুলাই ১৬ তারিখে। হঠাৎ শমন আসায় দশদিন আগেই আমাদের চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে; ফলে যেখানে যাচ্ছি সেখানে তেমন পরিপাটি ব্যবস্থা করা যায়নি, কিন্তু তারই মধ্যে যতটা সম্ভব মানিয়ে গুছিয়ে দেওয়া হয়েছে, যে বাড়িতে বাবার অফিস, সেখানেই আমাদের গোপন ডেরা। বাইরের লোকের পক্ষে বোঝা শক্ত হবে; যাই হোক, পরে আমি সেটা বুঝিয়ে বলব। বাপির যে কারবার তাতে কর্মচারী খুব বেশি ছিল না। মিস্টার ক্রালার, কুপহুইস, মিপ্ আর তেইশ বছর বয়সের টাইপিস্ট এলি ফসেন– শুধু এঁরাই আমাদের আসবার কথা জানতেন। এলির বাবা মিস্টার ফসেন আর দুটি ছোকরা কাজ করত মালগুদামে– তাদের সেকথা জানানো হয়নি।

বাড়িটার চেহারা কি রকম বলছি– একতলায় একটা খুব বড় গুদামঘর, সেখানে মালপত্র রাখা হয়। বাড়ির সদরদরজাটা গুদামঘরের দরজার ঠিক পাশেই, এবং সদরদরজার প্রবেশপথে আরও একটি দরজা– সেখান থেকে উঠে গেছে সিঁড়ি (ক)। সিঁড়ির মাথায় ঘষা কাঁচ লাগানো আরেকটি দরজা, তাতে কালো কালিতে আড়াআড়ি ভাবে লেখা 'অফিসঘর'। সেটাই হল সদরদপ্তর, খুব বড়, খুব খোলামেলা এবং খুব গমগমে। এলি, মিপ্ আর মিস্টার কুপহুইস দিনমানে সেখানে কাজ করেন। একটা ছোট এঁদো ঘরে সিন্দুক, গা-আলমারি, একটা বড় কাবার্ড; সেই ঘর পেরিয়ে ছোট অন্ধকারমত আরেকটি অফিসঘর। আগে এখানে বসতেন মিস্টার ক্রালার আর মিস্টার ফান ডান– এখন মিস্টার ক্রালার বসেন একা। দালানটা দিয়ে সোজা মিস্টার ক্রালারের অফিসঘরে যাওয়া যায়; কিন্তু একমাত্র যে কাঁচের দরজাটা দিয়ে যেতে হয়, সেটা বাইরে থেকে সহজে খোলা যায় না– খুলতে হয় ভেতর থেকে।

ক্রালারের অফিস থেকে কয়লাগাদার পাশ দিয়ে একটা লম্বা দালানপথ চলে গেছে; তার শেষে চার ধাপ উঠলে গোটা বাড়ির মধ্যে সবচেয়ে জমকালো ঘর ঃ দপ্তরের খাসকামরা। গাঢ় রঙের ভব্যিযুক্ত আসবাব, লিনোলিয়াম আর কার্পেট বিছানো মেঝে, রেডিও, ঝকঝকে বাতি। সবই প্রথম শ্রেণীর। এর ঠিক গায়েই বেশ বড়সড় একটা রান্নাঘর, তাতে পানির কল আর গ্যাসের চুলা, পাশেই বাথরুম। এই নিয়ে হল দোতলা। নিচেকার দালানপথ থেকে একটা কাঠের সিঁড়ি দিয়ে উঠে গেলে ওপরতলা (খ)। ওপরে উঠে গেলে একটা ছোট যাতায়াতের পথ। তার দুদিকে দুটো দরজা। বাঁদিকের দরজা দিয়ে বাড়ির সামনের অংশে মালগুদামে যাওয়া যায়, অন্যটা দিয়ে যাওয়া যায় চিলেকোঠায়। ওলন্দাজদের সিঁড়িগুলো হয় বেজায় খাড়া– তারই একটা দিয়ে নেমে গিয়ে নিচের দরজা খুললেই রাস্তা (গ)।

ডানহাতি দরজাটা দিয়ে আমাদের 'গুপ্ত মহল'টাতে যেতে হয়। বাইরে থেকে দেখে কেউ ভাবতেই পারবে না যে সাদামাটা ছাই-রঙা দরজাটার ঠিক আড়ালেই এতগুলো ঘর রয়েছে। দরজার সামনে একটা পৈঁঠে, সেটা পেরোলেই অন্দরমহল।

প্রবেশপথের ঠিক সামনা-সামনি একটা খাড়া সিঁড়ি (ঘ)। বাঁদিকের ছোট গলিটা দিয়ে এগোলে একটা ঘর, সেটা হল ফ্রাঙ্ক-পরিবারের শোয়া-বসার ঘর। তার গায়েই তুলনায় একটা ছোট ঘর– সেটা হল পরিবারের দুই তরুণীর পড়ার আর শোয়ার ঘর। ডানদিকের জানলাহীন ছোট ঘরটাতে এক পাশে বেসিন লাগানো পানির কল আর অন্য পাশে পায়খানার

খোপ। অন্য দরজা দিয়ে গেলে মারগট আর আমার ঘর। এর পরের সিঁড়িটা দিয়ে উঠে গিয়ে দরজা খুলে তোমার তাক লেগে যাবে। ক্যানেলের পাশে এরকম একটা সেকেলে বাড়িতে আলোয় ঝলমল কী প্রকাণ্ড ঘর। ঘরটার একপাশে একটা গ্যাসের চুলো আর একটা হাত ধোয়ার জায়গা (আগে এটা ল্যাবোরেটারি হিসেবে ব্যবহার হত কিনা)। এখন এটা ফান ডান দম্পতির রান্নাঘর; তাছাড়া সাধারণভাবে সকলেরই বসার ঘর, খাওয়ার ঘর এবং বাসন মাজার জায়গা। একটা ছোট এইটুকু দালানঘর হবে পিটার ফান ডানের বাসস্থান। আর নিচের তলার ল্যাণ্ডিংটার মতই রয়েছে বিরাট একটা চিলেকোঠা। এখন তাহলে গোটা ব্যাপারটা বুঝলে। আমাদের ভারি সুন্দর গোটা 'গুপ্ত মহল'টার সঙ্গে তোমাকে আমি পরিচয় করিয়ে দিয়েছি।

তোমার আনা

শুক্রবার, ১০ জুলাই, ১৯৪২

আদরের কিটি,
আমাদের বাসস্থানের প্যাঁচানো লম্বা ফিরিস্তি পড়ে তুমি নিশ্চয় ত্যাক্ত-বিরক্ত। কিন্তু তবু আমি মনে করি যে, আমরা কোথায় এসে ঠেকেছি সেটা তোমার জানা উচিত।

হ্যাঁ, যা বলছিলাম– দেখছ তো, এখনও আমার কথা শেষ হয়নি– প্রিন্‌সেনগ্রাখ্‌টে যখন আমরা এসে পৌঁছুলাম, মিপ্ তাড়াতাড়ি আমাদের ওপরতলায় নিয়ে গিয়ে 'গুপ্ত মহলে' তুললেন। মিপ্ দরজা বন্ধ করে দিতেই আমরা একা হয়ে গেলাম।

মারগট সাইকেল চালিয়ে ঢের তাড়াতাড়ি এসে আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছিল। আমাদের বসবার আর অন্যান্য সমস্ত ঘরই ছিল অকথ্য ভাবে রাবিশে ভর্তি। আগের মাসগুলোতে অফিসে যত কার্ডবোর্ডের বাক্স এসেছে, সবই হয় মেঝেতে, নয় বিছানার ওপর স্তূপাকার হয়ে আছে।

ছোট ঘরটার মট্‌কা অব্দি বিছানার চাদরে কাপড় ঠাসা। আমরা দেখলাম, সে রাত্রে ভদ্রগোছের বিছানায় যদি শুতে হয় তাহলে তক্ষুনি সব সাফসুফ করা দরকার। আমরা সে কাজ শুরু করে দিলাম। মা আর মারগটের কিছু করবার অবস্থা ছিল না; ওরা এত ক্লান্ত যে বিছানায় নেতিয়ে পড়েছিল, মন খারাপ হওয়া ছাড়াও আরও অনেক কিছু ছিল। পরিবারের দুই–'ধাঙড়'– আমি আর বাপি– আমরা তৎক্ষণাৎ কাজ শুরু করে দিতে চাইলাম।

দম ফুরিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত সারাদিন ধরে আমরা বাক্স থেকে জিনিস বের করলাম, তাকগুলোতে ভরলাম, হাতুড়ি ঠুকলাম আর গোছগাছ করলাম। তারপর সে রাতে পরিষ্কার বিছানার ওপর লম্বা হলাম।

সারাটা দিন আমরা দাঁতে কুটো কাটিনি, কিন্তু তাতে কিছু আসে যায়নি। মা আর মারগট এমন নেতিয়ে পড়েছিল যে তাদের খাওয়ার মতো মনমেজাজই ছিল না। অন্যদিকে বাবা আর আমি খাওয়ার কোনো ফুরসতই পাইনি।

মঙ্গলবার সকালে আমরা তার আগের দিনের কাজের জের টানতে লাগলাম। এলি আর মিপ্ আমাদের হয়ে রেশন তুলে এনে দিলেন। বাবা মন দিলেন বাইরে আলো না যাওয়ার ব্যবস্থাটাকে আরও পাকাপোক্ত করতে। আমরা রান্নাঘরের মেঝে থেকে ঘষে ঘষে ময়লা তুললাম। সেদিনও সারাদিন ধরে আমাদের এইসব চলল। আমার জীবনে এত বড় একটা ওলট-পালট হয়ে গেল, বুধবারের আগে তা নিয়ে ভাববার কোনো সময়ই পাইনি।

এখানে আসবার পর সেই প্রথম আমি জো পেলাম তোমাকে সব কিছু জানাবার আর সেই সঙ্গে এই বিষয়ে নিজেও ঠিকঠাক বোঝবার যে, আমার জীবনযাত্রায় আদতে কী ঘটে গেছে এবং এরপরেও কী ঘটতে যাচ্ছে।

তোমার আনা

শনিবার, ১১ জুলাই ১৯৪২

আদরের কিটি,

প্রত্যেক পনেরো মিনিট অন্তর সময় জানান দেয় যে ভেস্টারটোরেন ঘড়ি, তার আওয়াজে বাবা, মা আর মারগট– এরা কেউই এখনও ঠিক ধাতস্থ হতে পারেনি আমি পেরেছি। গোড়া থেকেই আওয়াজটা আমার মনে ধরেছে, বিশেষ করে রাতের বেলায় তাকে একজন বিশ্বস্ত বন্ধু বলে মনে হয়। 'অদৃশ্য হয়ে যেতে' কেমন লাগে সেটা জানতে তুমি বোধহয় উৎসুক হবে; দেখ, আমি শুধু এইটুকুই বলতে পারি যে আমি নিজেই এখনও তা জানি না। আমার মনে হয় না, এ বাড়িতে আমি কখনও সত্যিকার স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করব; তার মানে এ নয় যে, এখনে থাকাটা আমি ঘোরতরভাবে অপছন্দ করছি; এটা অনেকটা যেন ছুটির সময় খুব বেখাপ্পা একটা বোর্ডিং হাউসে এসে উঠেছি। একেবারেই পাগলামি, কিন্তু তবু আমার তাই মনে হয়। এই 'গুপ্ত মহল'টা লুকিয়ে থাকার পক্ষে আদর্শ জায়গা। যদিও এটা একটেরে এবং স্যাঁতসেতে, তবু এমন আরামদায়ক লুকোবার জায়গা শুধু আমস্টার্ডামে কেন, গোটা হল্যাণ্ড টুঁড়েও তুমি আর কোথাও খুঁজে পাবে না।

দেয়ালে কিছু না থাকায় আমাদের ছোট ঘরটা গোড়ায় গোড়ায় বেজায় ন্যাড়া লাগত; কিন্তু বাবা যেহেতু আগে থেকে আমার জমানো ফিল্মস্টারদের ছবি আর পিক্‌চার পোস্টকার্ডগুলো এনে রেখেছিলেন, তার ফলে আঠার শিশি আর বুরুশের সাহায্যে দেয়ালগুলোকে আমি দিয়েছি অতিকায় ছবির আকার। তাতে ঘরটার মুখে এখন একটু হাসি ফুটেছে। ফান ডানেরা এসে গেলে চিলেকোঠার ঘর থেকে আমরা কিছু কাঠ পাব, তাই দিয়ে দেয়ালে কয়েকটা ছোট ছোট তাক এবং আরও এটা-ওটা বানিয়ে নেব। তাহলেই ঘরটাতে আরেকটু প্রাণ আসবে।

মারগট আর মা-মণি এখন আগের চেয়ে একটু ভালো। সুস্থ বোধ করে মা-মণি কাল প্রথম চুলোতে কিছুটা সুপ চড়িয়েছিলেন, কিন্তু নিচের তলায় কথা বলতে বলতে সে কথা বেমালুম ভুলে গিয়েছিলেন। ফলে, মটরশুটির দানাগুলো পুড়ে গিয়ে এমনভাবে তলায় ধরে যায় যে, হাজার চেষ্টা করেও প্যান থেকে তা আর ছাড়ানো যায়নি। মিস্টার কুপ্‌হুইস আমার জন্যে একটা বই এনেছিলেন– ছোটদের বার্ষিকী। আমরা চারজন কাল সন্ধ্যেবেলায় অফিসের খাসকামরায় চলে গিয়ে রেডিও খুলেছিলাম। পাছে কারো কানে যায়, এই জন্যে আমি এত প্রচণ্ড ভয় পেয়েছিলাম যে, বাপিকে আমি ধরে টানাটানি করতে লাগলাম আমার সঙ্গে ওপরে যাওয়ার জন্যে; আমার মনের ভাব বুঝতে পেরে মা-মণিও চলে এলেন। পাড়া-পড়শিরা পাছে আমাদের আওয়াজ পায় এবং কিছু একটা চলছে এটা চোখে পড়ে, সেইজন্যে অন্যান্য দিক থেকেও আমরা রীতিমত ঘাবড়ে রয়েছি। এখানে প্রথমদিন পা দিয়েই আমরা পর্দার ব্যবস্থা করেছি। প্রকৃতপক্ষে ওগুলোকে ঠিক পর্দা বলা যায় না– আকারে, প্রকারে আর কারুকার্যে পৃথক শুধু কয়েকটা পাতলা, ঢিলে কাপড়ের ফালি– যা আমি আর বাপি নেহাত আনাড়ি হাতে সেলাই করে জোড়াতালি দিয়েছিলাম। এই বিচিত্র কাপড়গুলো ড্রইংপিন দিয়ে

আমরা গেঁথে দিয়েছিলাম, যাতে আমরা এখান থেকে বেরিয়ে যাওয়া অব্দি টিক থাকে।

আমাদের ডানদিকে বড় বড় সওদাগরী অফিস আর বাঁদিকে আসবাবপত্র তৈরির একটা কারখানা, দিনান্তে কাজের পর কেউ আর সেখানে থাকে না; কিন্তু তাহলেও দেয়াল ফুঁড়ে আওয়াজ যেতে পারে। মারগটের বেজায় ঠাণ্ডা লেগেছে; তাকে বলেছি রাতের বেলায় যেন সে না কাশে। তাকে গুচ্ছের কোডিন গেলানো হয়েছে। আমি মঙ্গলবারের জন্যে অপেক্ষা করে রয়েছি, ঐদিন ফান ডানেরা এসে যাবে; তখন অনেক বেশি মজা হবে, এতটা চুপচাপ ভাব আর থাকবে না। সন্ধ্যেবেলায় আর রাতে আমার যে এত গা ছমছম করে, সেটা এই নিঃশব্দতারই জন্যে। আমি মনপ্রাণে চাই যে, আমাদের ত্রাণকর্তাদের কেউ না কেউ রাত্তিরে এসে এখানে ঘুমাক।

কখনও আর ঘরের বাইরে যেতে পারব না, এটা যে কী পীড়াদায়ক, তা আমি তোমাকে বলে বোঝাতে পারব না– সেইসঙ্গে আমার বড় ভয়, আমরা যখন ধরা পড়ে যাব– তখন আমাদের গুলি করে মারা হবে। দিনের বেলায় আমাদের কথা বলতে হয় ফিস ফিস করে আর পা টিপে টিপে চলতে হয়– না হলে মালগুদামের লোকগুলো টের পেয়ে যাবে।

চলি। কেউ আমাকে ডাকছে।

তোমার আনা

শুক্রবার, ১৪ আগস্ট, ১৯৪২

আদরের কিটি,

পুরো এক মাস আমি তোমাকে ছেড়ে থেকেছি। কিন্তু বিশ্বাস করো, খবর এখানে এত কম যে, প্রত্যেকদিন লেখবার মত মজাদার কিছু আমি খুঁজে পাই না। ফান ডানেরা এসে গেলেন ১৩ই জুলাই। আমরা জানতাম ওঁরা আসছেন চোদ্দ তারিখে। কিন্তু জুলাইয়ের তেরো থেকে ষোল তারিখ পর্যন্ত জার্মানরা একধার থেকে শমন জারি করতে থাকায় লোকে দিন দিন বিচলিত হয়ে উঠতে থাকে। তারা তাই দেখল, যদি বাঁচতে হয় তাহলে একদিন দেরি করে ফাঁদে পড়ার চেয়ে একদিন আগেই ব্যবস্থা করা ভাল। সকাল সাড়ে ন'টায় (যখন আমরা বসে প্রাতরাশ সারছি) পেটার এসে হাজির। পেটার হল ফান ডানদের ছেলে, তার ষোলো এখনও পূর্ণ হয়নি– নরম প্রকৃতির, লাজুক, খাটো ধরনের ছেলে; ওর সান্নিধ্য থেকে খুব বেশি কিছু পাওয়া যাবে না। পেটারের সঙ্গে এল তার বেড়াল (মুশ্চি)। মিস্টার আর মিসেস ফান ডান এলেন তার আধঘণ্টা পরে; মিসেস ফান ডানের টুপির বাক্সে একটা বড় পট দেখে আমাদের খুব মজা লাগল। উনি সবাইকে শুনিয়ে বললেন, 'সঙ্গে আমার পট না থাকলে কোথাও গিয়ে আমি স্বাচ্ছন্দ্য পাই না।' সুতরাং সবার আগে ওটা তিনি স্থায়ীভাবে তাঁর ডিভানের নিচে রাখলেন। মিস্টার ফান ডান অবশ্য তাঁর নিজেরটা সঙ্গে করে আনেননি, তবে বগলদাবা করে এনেছেন একটা ভাঁজ-করা চায়ের টেবিল।

ওঁরা আসার পর থেকে আমরা সবাই একত্রে আরাম করে বসে খাওয়াদাওয়া করছি; তিনদিন কেটে যেতে মনে হল আমরা সবাই যেন একটা বড় পরিবারভুক্ত লোক। বাইরের লোকালয়ে ফান ডানেরা যে অতিরিক্ত সপ্তাহটা কাটিয়ে এসেছেন, সে সম্পর্কে ফান ডানেরা স্বভাবতই বিস্তর বলতে পারেন। অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে আমাদের খুব কৌতূহল হচ্ছিল আমাদের বাড়িটা আর মিস্টার গুডস্মিট সম্পর্কে জানতে।

মিস্টার ফান ডান আমাদের বললেন–

'সোমবার সকাল নয়টার সময় মিস্টার গুডস্মিট ফোন করে জানতে চাইলেন আমি একবার আসতে পারি কিনা। আমি তক্ষুনি চলে গেলাম। গিয়ে দেখি গ– বেজায় বিচলিত। ফ্রাংক্‌রা একটা চিঠি লিখে রেখে গেছেন, উনি আমাকে সেটা পড়তে দিলেন এবং চিঠিতে যা বলা হয়েছে সেইমত বেড়ালটাকে তিনি আশপাশের বাড়িতে নিয়ে যেতে চান বললেন। তাতে আমি খুশীই হলাম। মিস্টার গ– ভয় পাচ্ছিলেন বাড়িতে তল্লাসি হবে। সেইজন্যে আমরা সমস্ত ঘর তন্ন তন্ন করে দেখলাম; খানিকটা গোছগাছ করে প্রাতরাশের জিনিসগুলো সরিয়ে ফেললাম। হঠাৎ আমার চোখে পড়ল মিসেস ফ্রাংকের টেবিলে একটা রাইটিং-প্যাড- তার ওপর মাসট্রিশ্‌টের একটা ঠিকানা লেখা। আমি অবশ্য জানতাম যে, ইচ্ছে করেই এসব করা হয়েছে; তবু আমি খুব অবাক হওয়ার এবং, ইস্‌, একটা কাঁচা কাজ করে ফেলেছে, এই রকমের ভাব দেখিয়ে গ– কে বললাম হতচ্ছাড়া চিরকুটটা অবিলম্বে ছিঁড়ে ফেলতে।

'আমি এতক্ষণ এমন একটা ভাব করছিলাম যেন তোমাদের উধাও হওয়ার ব্যাপারটার বিন্দুবিসর্গ আমি জানি না। কিন্তু চিরকুটটা দেখতে পেয়ে আমার মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল। আমি বললাম, মিস্টার গুডস্মিট, ঠিকানাটার উদ্দিষ্ট পুরুষটি যে কে সেটা এতক্ষণে আমার খেয়াল হচ্ছে। হুঁ এইবার মনে পড়েছে, ইনি একজন উচ্চপদস্থ অফিসার; মাসছয়েক আগে অফিসে এসেছিলেন, দেখে মনে হয়েছিল, মিস্টার ফ্রাংকের সঙ্গে তাঁর বেশ দহরম-মহরম। তেমন দরকার পড়লে মিস্টার ফ্রাংককে উনি সাহায্য করবেন বলেছিলেন। ভদ্রলোকের কর্মস্থল ছিল মাসট্রিশ্‌ট্‌। আমার মনে হয় ভদ্রলোক তাঁর কথা রেখেছেন; তিনি কোনো না কোনো ভাবে ওঁদের গোড়ায় বেলজিয়ামে এবং তারপর সেখান থেকে সুইট্‌জারল্যাণ্ডে যাওয়ার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। বন্ধুরা কেউ খোঁজ করলে এই খবরটা আমি তাদের দেব। অবশ্য কারো কাছে মাস্‌ট্রিশ্‌টের নাম যেন করবেন না।

'কথাগুলো বলে আমি বাড়ি ছেড়ে চলে এলাম। ইতিমধ্যে তোমাদের অধিকাংশ বন্ধুই জেনে গেছে, কেননা আলাদা আলাদাভাবে অনেকেই বেশ কয়েকবার খোদ আমাকেই সে কথা বলেছে।'

গল্পটা শুনে আমরা দারুণ মজা পেয়েছিলাম এবং এরপর মিস্টার ফান ডান যখন আমাদের আরও সবিস্তারে সব বললেন, মানুষ কিভাবে কল্পনার লাগাম ছেড়ে দেয় সেটা দেখে তখন আরও বেশি হেসেছিলাম। একটি পরিবার নাকি দেখেছে খুব ভোরবেলায় আমরা দুটিতে সাইকেল চালিয়ে যাচ্ছি; আবার এক ভদ্রমহিলা নাকি একেবারে নিশ্চিতভাবে জেনেছেন যে, মাঝরাত্তিরে একটা মিলিটারি গাড়ি এসে আমাদের ডেকে নিয়ে গেছে।

তোমার আনা

শুক্রবার, ২১ আগস্ট, ১৯৪২

আদরের কিটি,

আমাদের লুকোবার জায়গায় প্রবেশপথটি এবার যথাযথভাবে ঢেকে দেওয়া হয়েছে। মিস্টার ক্রালার মনে করছিলেন আমাদের দরজার সামনে একটা কাবার্ড রেখে দিলে ভালো হয় (কেননা লুকোনো সাইকেলের খোঁজে বিস্তর বাড়িতে খানাতল্লাসি হচ্ছে), তবে কাবার্ডটা হবে অস্থাবর– যাতে দরজার মতো খোলা যায়।

গোটা জিনিসটা করলেন মিস্টার ফোসেন। আমরা তাঁকে আগেই সব খুলে বলেছি; কিন্তু তিনি কী করবেন, তাঁর হাত-পা বাঁধা। নিচের তলায় যেতে চাইলে প্রথমে আমাদের হাঁটু

মুড়ে নিচু হতে হবে, তারপর ঝাঁপ দিতে হবে, কেননা ধাপগুলো সরিয়ে ফেলা হয়েছে। গোড়ার তিনদিন আমাদের কপালে ঢিবি নিয়ে ঘুরে বেড়াতে হল, কারণ নিচু দরজায় সবাইকেই ঠোক্কর খেতে হয়েছিল। এখন আমরা একটা কাপড়ে, পশম জড়িয়ে ওপরের ঝনকাঠে এঁটে দিয়েছি। দেখা যাক ওতে কোনো উপকার হয় কিনা!

এখন আমি খুব বেশি গা ঘামাচ্ছি না; সেপ্টেম্বর অবধি নিজেকে ছুটি দিয়ে রেখেছি। এরপর বাবা আমাকে পড়ালেখা করাবেন। ইস্, এরই মধ্যে এত কিছু ভুলেছি যে বলার নয়। আমাদের এখানকার জীবন বলতে সেই থোড়বড়িখাড়া আর খাড়াবড়িথোড়। মিস্টার ফান ডান আর আমি যেভাবেই হোক সচরাচর পরস্পরকে নস্যাৎ করি। মারগটের বেলায় তা হয় না, ওকে উনি বিলক্ষণ ভালবাসেন। মা-মণি থেকে থেকে আমার সঙ্গে এমন ব্যবহার করেন যেন আমি কচি খুকী– এটা আমার অসহ্য লাগে। না হলে, অবস্থা আগের চেয়ে ভালো। পেটারকে এখনও আমার আদৌ ভালো লাগে না, ছেলেটা কী যে বিরক্তিকর কী বলব। অর্ধেক সময় বিছানায় পিপুফিশু হয়ে কাটায়, খানিকটা কাঠের কাজ করে, এবং তারপরই ফিরে গিয়ে আরেক দফা ঘোঁত ঘোঁত করে ঘুমোয়। একেবারে গাঁড়োল।

আবহাওয়াটা এখন ভারি সুন্দর। সবকিছু সত্ত্বেও আমরা যতটা পারি উপভোগ করার চেষ্টা করি; চিলেকোঠায় চলে গিয়ে ক্যাম্প-খাটে লম্বা হই– খোলা জানলা দিয়ে ভেতরে এসে ঝলমল করে রোদ্দুর।

তোমার আনা

বুধবার, ২ সেপ্টেম্বর, ১৯৪২

আদরের কিটি,

মিস্টার আর মিসেস ফান ডানের মধ্যে প্রচণ্ড ঝগড়া হয়ে গেল। এই জিনিস বাপের জন্মে আমি কখনও দেখিনি। মা-মণি আর বাপি তো এভাবে চেঁচিয়ে পরস্পরকে মুখনাড়া দেওয়ার কথা কল্পনাই করতে পারবেন না। কারণটা ছিল এত তুচ্ছ যে, মোটা ব্যাপারটাই হয়ে দাঁড়াল শুধু কথার ফুলঝুরি। অবশ্য এও ঠিক, যার যেমন অভিরুচি।

পেটারকে যে ঘুর ঘুর করে বেড়াতে হয়, এটা স্বভাবতই তার ভালো লাগার কথা নয়। ও এমন ভয়ঙ্কর রকমের ছিঁচকাঁদুনে আর আল্সে যে, কেউ তাকে গুরুত্ব দেয় না। কালকেও দেখি ওর জিভ লাল হওয়ার বদলে নীল হয়ে রয়েছে– ভয়ে ওর মুখ শুকিয়ে গিয়েছিল। এই অসাধারণ প্রকৃতিক ঘটনাটি হুট করে দেখা দিয়ে হুট করে উবে গিয়েছিল। আজ ও গলায় স্কার্ফ জড়িয়ে ঘুরছে, ওর ঘাড়ে নাকি ফিক-ব্যথা; এর ওপর 'কর্তাবাবা'রও নাকি কোমরে বাতের ব্যথা। তাছাড়া হৃৎপিণ্ড মূত্রাশয় এবং ফুসফুস– এসবের আশপাশেও ওর যখন-তখন ব্যথা হয়। ও হচ্ছে সত্যিকার রোগাতঙ্ক ব্যাধিগ্রস্ত (এইসব লোকদেরই তো হাইপোকন্ড্রিয়াক বলে, তাই না?)। মার সঙ্গে মিসেস ফান ডানের পুরোটাই যে একটা মধুর সম্পর্ক তা নয়; তিক্ততার কারণ আছে।

একটা ছোট দৃষ্টান্ত দিই, সকলের জন্যে কাপড়ের যে আলমারি– সেখান থেকে মিসেস ফান ডান তিনটি চাদরের সব কয়টিই হস্তগত করেছেন। উনি এটা ধরেই নিয়েছেন যে মা-মণির চাদরে আমাদের সবারই কাজ চলে যাবে। ওঁর পিত্তি জ্বলে যাবে যখন উনি দেখবেন মা-মণি ওঁরই মহৎ দৃষ্টান্ত অনুসরণ করেছেন।

সেই সঙ্গে, ওঁর গা জ্বলে যায় যখন উনি দেখেন, আমাদের থালাবাসনের বদলে ওঁর

জিনিসে খাবার দেওয়া হচ্ছে। উনি সবসময় খুঁজে বের করার চেষ্টা করছেন আমাদের প্লেটগুলো আমরা কোথায় রাখি। ওঁর যা ধারণা তার চেয়ে কাছে, চিলেকোঠার একগাদা হাবিজাবি জিনিসের পেছনে একটা কার্ডবোর্ডের বাক্সে। আমরা যতদিন এখানে আছি, ততদিন আমাদের প্লেটগুলোর নাগাল পাওয়া যাবে না, সেটা একপক্ষে ভালোই। আমি সব সময় অপয়া; মিসেস ফান ডানের একটা সুপ-প্লেট কাল আমার হাত থেকে পড়ে চুরমার হয়ে গেছে। উনি তেলেবেগুনে জ্বলে উঠে বলেছিলেন, 'তোমার কি একটি বারের জন্যেও আক্কেল হল না–ওটা ছিল আমার শেষ সুপ-প্লেট।'

মিস্টার ফান ডান আজকাল গলায় মধু ঢেলে আমার সঙ্গে কথা বলেন। এই ভাব দীর্ঘজীবী হোক। আজ সকালে মা-মণি আমাকে শুনিয়ে ভয়ানকভাবে আরেক প্রস্থ উপদেশ ঝাড়লেন; এসব শুনলে আমার গা জ্বালা করে। আমাদের ধ্যান-ধারণা একেবারেই বিপরীত। বাপি হলেন সোনামণি, যদিও মাঝে মাঝে আমার ওপর রেগে যেতে পারেন– তবে পাঁচ মিনিটেই তাঁর রাগ পড়ে যায়। গত সপ্তাহে আমাদের একঘেয়ে জীবনে একটা সামান্য ছেদ পড়েছিল; এর মূলে মেয়েদের সংক্রান্ত একটি বই এবং পেটার। গোড়ায় বলা দরকার, মিস্টার কুপহুইস্ যেসব বই আমাদের ধার দেন, তার মধ্যে প্রায় সবই মারগট আর পেটার পড়তে পারে। কিন্তু মেয়েদের বিষয়ে লেখা এই বইটা বড়রা আটকে দিয়েছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে পেটারের কৌতূহল চেগে উঠল।

বইতে এমন কী আছে যা ওদের দুজনকে পড়তে দেওয়া গেল না? ওর মা যখন নিচের তলায় কথা বলতে ব্যস্ত, তখন পেটার চুপিচুপি বামাল বগলদাবা করে পালিয়ে চিলেকোঠায় চলে গেল। ক'দিন গেল নির্ঝঞ্ঝাট। পেটারের মা তার কাণ্ডকারখানা জানতেন। কিন্তু সে কথা কাউকে বলেননি।

এমন সময় পেটারের বাবা ব্যাপারটা জানতে পারলেন। তিনি খুব চটে গিয়ে বইটা সরিয়ে ফেললেন। তিনি ভেবেছিলেন এখানেই গোটা ব্যাপারটা চুকেবুকে গেল। কিন্তু বাবার এই মনোভাবে ছেলের ঔৎসুক্য ক্ষয় পাওয়ার বদলে যে আরও বৃদ্ধি পাবে এটা তাঁর হিসেবের মধ্যে ছিল না। পেটার তখন সেই চিত্তাকর্ষক বইটা পড়ে শেষ করবার জন্যে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে সেটা হাতাবার এক উপায় বার করল। ইতিমধ্যে মিসেস ফান ডান এই গোটা ব্যাপারটাতে মার কী মত সেটা জানতে চাইলেন। মা-র ধারণা, এই বিশেষ বইটা মারগটের উপযুক্ত নয়, তবে বেশির ভাগ বই নির্বিঘ্নে মারগটকে পড়তে দেওয়া যায়।

মা-মণি বললেন, 'দেখুন মিসেস ফান ডান– মারগট আর পেটারের মধ্যে বিস্তর ফারাক। প্রথমত, মারগট হল মেয়ে এবং মেয়েরা সব সময়ই ছেলেদের চেয়ে বেশি সাবালক; দ্বিতীয়ত, মারগট যথেষ্ট গুরুগম্ভীর বিষয়ে লেখা বই পড়েছে, কোনো বই ওকে পড়তে না দিলে তার জন্যে ও ছোঁক ছোঁক করে বেড়াবে না এবং তৃতীয়ত, মারগটের বাড়-বৃদ্ধি বেশি, বুদ্ধিও বেশি– ইস্কুলের চতুর্থ শ্রেণীতে তার পড়া থেকেই তা বোঝা যায়।' মিসেস ফান ডান সে বিষয়ে একমত; কিন্তু তবু তিনি মনে করেন, বড়দের জন্যে লেখা বই ছোটদের পড়তে দেওয়াটা নীতিগতভাবে ভুল।

ইতিমধ্যে পেটার দিনের এমন একটা ফাঁক বেছে নিয়েছে যখন পেটার এবং ঐ বইটার কথা কারো আর তেমন মনে নেই; সময়টা হল সন্ধ্যে সাড়ে সাতটা– সবাই তখন অফিসের খাস কামরায় বসে রেডিও শুনছে। পেটার ঠিক সেই সময় তার মহামূল্য বস্তুটি নিয়ে ফের চিলেকোঠায় উঠে গেছে। কিন্তু বইটাতে সে এমনই জমে গিয়েছিল যে সময়ের কথা আর

তার খেয়াল থাকেনি। যখন সে সবে নিচে নেমে আসছে ঠিক তখন ঘরে গিয়ে উপস্থিত হলেন ওর বাবা। তারপর কী হল বুঝতেই পারছ। একটা চড় মেরে টান দিতেই বইটা ধপাস করে পড়ল টেবিলে আর পেটার দৌড় দিয়ে পালাল চিলেকোঠায়। এই অবস্থায় তারপর আমরা খেতে বসে গেলাম। পেটার রইল ওপরতলায়– কেউ তাকে ডাকাডাকি করল না। রাত্রে না খেয়েই তাকে শুয়ে পড়তে হল।

আমরা খেয়ে চলেছি, খোশমেজাজে কথাবার্তা বলছি– এমন সময় হঠাৎ হুইসেলের তীক্ষ্ণ একটা আওয়াজ; খাওয়া থামিয়ে আমরা ভয়ে পাংশুবর্ণ হয়ে পরস্পরের মুখ-চাওয়াচাওয়ি করছি। এমন সময় চিমনির ভেতর দিয়ে পেটারের গলা ভেসে এল। 'আমি কিছুতেই নিচে যাব না, এই বলে দিচ্ছি।' মিস্টার ডান ঝট্ করে উঠে দাঁড়ালেন, মেঝেতে তাঁর ন্যাপকিনটা গড়িয়ে পড়ল। চোখ মুখ লাল করে তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন, 'আর আমি বরদাস্ত করব না।'

বিশ্রী কিছু ঘটার আশঙ্কায় বাপি উঠে গিয়ে তাঁর হাত ধরলেন, তারপর দুজনে গেলেন চিলেকোঠায়। খানিকক্ষণ ঠেলাঠেলি গুঁতোগুঁতির পর টেনেহিঁচড়ে ওকে ঘরে ঢুকিয়ে দরজা বন্ধ করে দেওয়া হল। তারপর আবার আমরা খেতে শুরু করে দিলাম। মিসেস ফান ডান চাইছিলেন তাঁর আদুরে ছেলেটির জন্যে এক টুকরো রুটি রেখে দিতে। কিন্তু ছেলের বাবা খুব কড়া। 'ও যদি এখুনি মাপ না চায়, চিলেকোঠাতেই ওকে রাত কাটাতে হবে।' আমরা বাকি সবাই চেঁচিয়ে এর প্রতিবাদ করলাম; আমাদের মতে রাত্রে খেতে না পাওয়াটাই হবে ওর পক্ষে যথেষ্ট শাস্তি। তাছাড়া পেটারের ঠাণ্ডা লেগে যেতে পারে এবং এ অবস্থায় ডাক্তারবদ্যিও ডাকা যাবে না।

পেটার মাপ চায়নি; অনেক আগেই চিলেকোঠার ঘরে চলে গেছে। মিস্টার ফান ডান আর এ নিয়ে বেশি কিছু করেননি; কিন্তু পরের দিন সকালে আমি লক্ষ্য করলাম পেটারের বিছানায় রাত্রে ঘুমোবার চিহ্ন। সাতটার সময় পেটার চিলেকোঠায় ফিরে গিয়েছিল; কিন্তু আমার বাপি ওকে মিষ্টি কথায় ভুলিয়ে-ভালিয়ে আবার নিচে নামিয়ে এনেছিলেন। তিনদিন ধরে চলল বিরস বদন আর মুখ বুঁজে গোঁয়ার-গোবিন্দপনা– ব্যাস্, তারপর আবার সব যে-কে সেই।

তোমার আনা।

সোমবার, ২১ সেপ্টেম্বর, ১৯৪২

আদরের কিটি,

আজ তোমাকে আমাদের সাধারণ খবরাখবর দেব।

মিসেস ফান ডানকে আর সহ্য করা যাচ্ছে না। আমি সারাক্ষণ বকবক করি বলে উনি কেবল 'ঝাড়' দেন। কোনো না কোনোভাবে সব সময়ই উনি আমাদের জ্বালাতন করেন। একেবারে হালের ব্যাপার হল– হাঁড়ি-পাতিলে যদি একটুও কিছু পড়ে থাকে, তাহলে আর তিনি ধোবেন না; কাঁচের ডিশে তুলে রাখলেই হয়, আমরা যা এতদিন করে এসেছি– তা নয়, প্যানেই সেটা রেখে দিয়ে জিনিসটা উনি নষ্ট হয়ে যেতে দেন।

পরের বারের খাওয়াদাওয়া শেষ হলে মারগটকে কখনও কখনও গোটা সাতেক প্যান মাজতে হয় আর তখন শ্রীমতী বলেন, 'ইস, মারগট, তোর ঘাড়ে বড্ড বেশি খাটুনি পড়ে যাচ্ছে।'

বাবা তাঁর বংশপঞ্জী তৈরি করছেন; আমি বাবার সঙ্গে সেই কাজে ব্যস্ত। যেমন যেমন আমরা এগোচ্ছি বাবা সেই মত প্রত্যেকের সম্বন্ধে কিছুটা কিছুটা বলছেন– কাজটা করতে দারুণ মজা লাগছে। এক সপ্তাহ অন্তর মিস্টার কুপহুইস আমার জন্যে কয়েকটা করে বিশেষ বিশেষ বই আনেন। 'য়ুপ টের হয়েল' সিরিজ দারুণ রোমহর্ষক। সিসি ফান্ মার্ক্সফেল্টের পুরাটাই আমার খুব ভালো লেগেছে। আর 'ঈন্‌ৎ সোমেন্‌সোথেইড' পড়েছি চারবার এবং কোনো কোনো হাস্যকর অবস্থার উদ্রেক হলে সেই নিয়ে এখনও হাসি।

পড়াশুনা আবার শুরু হয়ে গেছে; আমি ফরাসী নিয়ে আদাজল খেয়ে লেগেছি এবং দিনে পাঁচটা করে অনিয়মিত ক্রিয়াপদ কোনো রকমে মগজে ঠাসছি। ইংরেজি সামলাতে পেটারের দম বেরিয়ে যাচ্ছে আর কেবল মাথা চাপড়াচ্ছে। কিছু স্কুলপাঠ্য বই সদ্য এসেছে; লেখার খাতা, পেন্সিল, রবার আর লেবেল যা আছে তাতে অনেকদিন চলে যাবে– এসবই আসার সময় আমি নিয়ে এসেছিলাম। লণ্ডন থেকে ওলন্দাজদের বিষয়ে যে খবর বলে আমি কখনও কখনও শুনি। সম্প্রতি প্রিন্স বের্নহার্ডকে বলতে শুনলাম। উনি বললেন যে, রাজকুমারী উরিয়ানার বাচ্চা হবে জানুয়ারী নাগাদ। এটা একটা চমৎকার খবর; রাজপরিবার সম্পর্কে আমার এই আগ্রহ দেখে অন্যেরা তো অবাক।

আমাকে নিয়ে আলোচনা হচ্ছে এবং এ বিষয়ে এখন সবাই স্থিরনিশ্চিত যে, আমি তাহলে একবারে হাবা নই– এর ফল হল এই যে, পরের দিন আমার ঘাড়ে আরও বেশি বোঝা চাপানো হল। আমার এই চোদ্দ-পনেরো বছর বয়সে আমি এখনও সেই প্রাথমিক শ্রেণীতেই থাকব এটা নিশ্চয়ই আমি চাই না।

সেই সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে আরও একটা ব্যাপার উঠেছিল– আমাকে কোনো সাচ্চা ধরনের বই না পড়তে দেওয়া সম্পর্কে। মা-মণি এখন পড়ছেন 'হীরেন্, ফ্রুডেন্ এন্ ক্রেশ্‌টেন'; ওটা আমার পড়বার অধিকার নেই (মারগটের আছে)। গোড়ায় আমাকে বুদ্ধিতে আরও পাকা হতে হবে, আমার গুণবতী দিদির মত। তারপর দর্শনে আর মনোবিজ্ঞানে আমার অজ্ঞতা সম্বন্ধে আমাদের কথা হয়; ও দুটো বিষয় সম্বন্ধে আমি কিছুই জানি না। হয়ত পরের বছরে আমার বুদ্ধি পাকবে। (এই খটমটে শব্দগুলোর মানে জানার জন্যে তাড়াতাড়ি আমি 'কোয়েনেনে'র পাতা উল্টে নিলাম)।

আমি ঘাবড়ে আছি, কারণ এইমাত্র আমার হুঁশ হল যে শীতের জন্যে আমার থাকার মধ্যে আছে একটা লম্বা-হাতের পোশাক আর তিনটে কার্ডিগান। বাবার কাছ থেকে সাদা ভেড়ার উলের একটা জাম্পার বোনবার অনুমতি পেয়েছি; উলটা খুব সরেস নয়, কিন্তু গরম হওয়া নিয়ে কথা। আমাদের কিছু জামাকাপড় বন্ধুদের বাড়িতে এদিক সেদিকে পড়ে রয়েছে; যুদ্ধ না মিটলে সেসব আর উদ্ধার হবে না, তাও যদি যে যেখানে ছিল সেখানেই তখনও থাকে। মিসেস ফান ডান সম্পর্কে সবে আমি দু-একটা কথা লিখেছি, এমন সময় তাঁর আবির্ভাব। অমনি ফটাস্ করে খাতাটা আমি বন্ধ করে দিলাম। 'আনা রে, একটুখানি আমাকে দেখাবি নে?'

'উঁহু, সম্ভব নয়।'

'তাহলে শুধু শেষের পাতাটা?'

'কিছু মনে করবেন না, দেখাতে পারছি না।'

স্বভাবতই আমি ভয়ানক ভ্যাবাচাকা খেয়ে গিয়েছিলাম; কারণ ঠিক ঐ পৃষ্ঠাতেই ওঁর সম্পর্কে একটা অপ্রশংসাসূচক বর্ণনা ছিল।

তোমার আনা

শুক্রবার, ২৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৪২

আদরের কিটি,

কাল সন্ধ্যেবেলায় আমি ওপরতলায় ফান ডানেদের ঘরে 'বেড়াতে' গিয়েছিলাম। মাঝে মাঝে গল্প করতে আমি এরকম যাই। কখনও কখনও বেশ জমে। খানিকটা পোকা-মারা বিস্কুট (পোকা-মারা ওষুধে ভর্তি কাপড়ের আলমারিতে বিস্কুটের টিনটা রাখা হয়) আর লেমোনেড খাই। পেটারের সম্পর্কে আমাদের কথা হল। আমি ওদের বললাম পেটার কিভাবে আমার গালে টোকা মারে, ওরকম ও না করে এটা আমি চাই, কেননা ছেলেরা আমার গায়ে হাত দিলে আমার বিচ্ছিরি লাগে।

বাপ-মায়েদের একটা বিশেষ ধরন আছে, সেইভাবে ওঁরা জিজ্ঞেস করলেন– পেটারকে আমি ভালো লাগাতে পারি কিনা, কারণ পেটার নিশ্চয় আমাকে খুব পছন্দ করে। আমি মনে মনে ভাবলাম 'মরেছে' এবং মুখে বললাম, 'আজ্ঞে, না।' ভাবো একবার।

আমি জোর দিয়েই বললাম পেটারকে আমার একটু হাতে-পায়ে জড়ানো বলে মনে হয়– হয়ত সেটা ওর লাজুক স্বভাবের জন্যে– মেয়েদের সঙ্গে মেলামেশার অভাবের দরুন অনেক ছেলে যেরকমটা হয়ে থাকে।

স্বীকার করতেই হবে যে, 'গুপ্ত মহলে'র (পুং বিভাগ) শরণঙ্কর সমিতির খুব মাথা আছে। মিস্টার ভ্যান ডীক হলেন ট্রাভিস কোম্পানীর প্রধান প্রতিনিধি; বন্ধুত্ব থাকায় আমাদের কিছু জিনিস উনি আমাদের হয়ে চুপিসাড়ে লুকিয়ে রেখেছেন; মিস্টার ডীক্ যাতে আমাদের খবরটা পেয়ে যান তার জন্যে ওঁরা কী করেছেন বলছি।

আমাদের ফার্মের সঙ্গে কারবার করে দক্ষিণ জীল্যাণ্ডের এমন একজন কেমিস্টকে ওঁরা টাইপ করে এমনভাবে একটা চিঠি দিয়েছেন যা সে ব্যক্তিকে উত্তর পাঠাতে হবে বন্ধ করা একটি ঠিকানাযুক্ত খামে। বাপি খামের ওপর অফিসের ঠিকানা দিয়েছেন। জীল্যাণ্ড থেকে ঐ খাম যখন আসবে, ভেতরের চিঠিটা সরিয়ে ফেলে তার ভেতর বেঁচে থাকার প্রমাণ হিসেবে বাপির স্বহস্তে লেখা একটি চিরকুট ভরে দেওয়া হবে। এভাবে হলে, ড্যান্ ডীক্ চিরকুট পড়ে কোনো কিছু সন্দেহ করবেন না। ওঁরা বিশেষভাবে জীল্যাণ্ড বেছে নিয়েছিলেন এই জন্যেই যে, জায়গাটা বেলজিয়ামের খুব কাছে; সীমান্ত পেরিয়ে সহজেই চিঠিটা গোপনে চালান করা যেতে পারে; তার ওপর, বিশেষ ধরনের পারমিট ছাড়া কাউকেই জীল্যাণ্ডে ঢুকতে দেওয়া হয় না; সুতরাং ওরা যদি ভেবেও নেয় যে, আমরা সেখানে আছি– উনি চেষ্টাচরিত্র করে কখনই সেখানে আমাদের খুঁজতে চলে যাবেন না।

তোমার আনা।

রবিবার, ২৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৪২

আদরের কিটি,

এইমাত্র মা-মণির সঙ্গে বেশ একচোট ফাটাফাটি হয়ে গেল; ইদানীং আমরা কেউই তেমন মানিয়ে চলতে পারছি না। অন্যদিকে মারগটের সঙ্গে আমার সম্পর্কও ঠিক আগের মত নেই। সচরাচর আমাদের পরিবারে এ ধরনের মেজাজ খারাপ করার রেওয়াজ নেই। তাহলেও সব সময় এটা আমার কাছে কোনোমতেই ভাল লাগে না।

মা আর মারগটের ধরন-ধারণ আমার কাছে একেবারেই অদ্ভুত লাগে। আমি আমার

নিজের মার চেয়ে বন্ধুদের বরং বেশি বুঝতে পারি– এটা খুবই খারাপ!

আমরা প্রায়ই যুদ্ধের পরের নানা সমস্যা নিয়ে আলোচনা করি; যেমন বাড়ির চাকরবাকরদের কিভাবে ডাকা উচিত।

মিসেস ফান ডান ফের চটাচটি করেছেন। ওঁর মেজাজের কোনো ঠিক নেই। ওঁর নিজের জিনিসপত্র উনি ক্রমাগত লুকিয়ে রাখেন। মা-মণির উচিত ফান ডানদের 'হাওয়া হওয়া'র উত্তরে আমাদেরও 'হাওয়া করে দেওয়া'। কিছু কিছু লোক আছে যারা নিজেদের ছেলেপুলেদের ওপর আবার পরের ছেলেপুলেদেরও মানুষ করতে ভালবাসে। ফান ডানেরা হলেন সেই গোত্রের। মারগটের বেলায় দরকার হয় না; ও হল যাকে বলে সুবোধ বালিকা, একেবারে নিখুঁত মেয়ে– কিন্তু আমার একার মধ্যে যোগ হয়েছে একসঙ্গে দুজনের দুষ্টুমি। খাওয়ার সময় কি রকম দুই তরফা নিন্দে-মন্দ আর তার চ্যাটাং চ্যাটাং জবাব হয় একবার শুনে দেখো। মা-বাবা সব সময়ই জোরালো ভাবে আমার পক্ষ নেন। ওঁরা না থাকলে আমাকে হাল ছেড়ে দিতে হত। ওঁরা অবশ্য আমাকে বলেন আমি যেন বেশি কথা না বলি, আমার উচিত আরেকটু নম্র হওয়া এবং সব কিছুতে নাক না গলানো। বাবা যদি অমন ফেরেশতার মতো মানুষ না হতেন তাহলে আমাকে নিয়ে আমার মা-বাবার পরিতাপের অন্ত থাকত না; ওঁরা আমার অনেক দোষই ক্ষমার চোখে দেখেন।

আমি যদি আমার অপছন্দসই কোনো তরকারি কম নিয়ে সে জায়গায় একটু বেশি করে আলু নিই, তাহলে ফান ডানেরা, বিশেষ করে সেফরোফ, কিছুতেই এটা বরদাস্ত করতে পারেন না যে, কোনো ছেলেমেয়ের কেন এত আদরে-মাথা খাওয়া হবে।

সঙ্গে সঙ্গে উনি বলে উঠবেন, 'অমন করে না, আনা– আরেকটু বেশি করে সব্জি নাও।'

তার উত্তরে আমি বলি, 'রক্ষে করুন, মিসেস্ ফান ডান– আমি যথেষ্ট আলু নিয়েছি।'

'সব্জিতে তোমার উপকার হবে, তোমার মাও সেকথা বলেন। নাও আরেকটু নাও।' এই বলে যখন উনি চাপাচাপি করতে থাকেন, বাপি এসে আমাকে বাঁচান।

এরপর মিসেস্ ফান ডান আমাদের ওপর এক হাত নেন– 'তোর উচিত ছিল আমাদের বাড়ির মেয়ে হওয়া, তবে ঠিকমত মানুষ হতিস। আনাকে এতটা আদর দিয়ে মাথায় চড়ানোর কোনো মানে হয় না। আনা যদি আমার মেয়ে হত, আমি তো সহ্যই করতাম না।'

'আনা যদি আমার মেয়ে হত,' এটা সব সময়ই ওঁর ধরতাই বুলি। ভাগ্যিস, আমি ওঁর মেয়ে হইনি।

'মানুষ হওয়া'র ব্যাপারটায় আবার ফিরে আসি। কারণ মিসেস ফান ডানের বকুনি শেষ হওয়ার পর খানিকক্ষণ কারো টু শব্দ নেই। তখন বাবা মুখ খুললেন, 'আমি মনে করি, আনা অত্যন্ত ভালোভাবে মানুষ হয়েছে; আর যাই হোক না হোক, একটি জিনিস সে শিখেছে– আপনার সাতকাণ্ড উপদেশ বচনের উত্তরে ও মুখে কুলুপ দিয়ে থেকেছে। আর সব্জির কথা বলছেন, আপনার নিজের থালার দিকে একবার তাকান।' মিসেস ফান ডানের থোঁতা মুখ একেবারে ভোতা। তিনি নিজেই সব্জি নিয়েছেন যৎসামান্য। তাই বলে তিনি তো আদরে মাথা-খাওয়া নন। বারে! সন্ধ্যেবেলায় সব্জি বেশি খেলে ওঁর যে কোষ্ঠকাঠিন্য হয়! বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে এত কিছু থাকতে আমার ব্যাপার নিয়ে উনি তো চুপ থাকলেই পারেন– তাহলে তো আর ওঁকে নিজের কোলে ওভাবে ঝোল টানতে হয় না। মিসেস ফান ডানের লজ্জায় কান লাল হওয়া একটা দেখবার জিনিস। আমার হয় না এবং সেটাই ওঁর দু-চক্ষের বিষ।

তোমার আনা

সোমবার, ২৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৪২

আদরের কিটি,

কাল শেষ করবার অনেক আগেই আমাকে লেখা বন্ধ করতে হয়েছিল। আরও একটা ঝগড়ার বিষয়ে তোমাকে না বললেই নয়, কিন্তু সেটা শুরু করার আগে অন্য একটা কথা বলে নিই।

বুড়োবাড়ির দল এত চট করে, এত বেশি মাত্রায় এবং এত সব তুচ্ছাতিতুচ্ছ কারণে কেন ঝগড়া করে? এতদিন ভাবতাম শুধু ছোট থাকলেই মানুষ খুনসুটি করে আর বড় হলে সেটা চলে যায়। কখনও কখনও ঝগড়ার সত্যিই কারণ ঘটে, কিন্তু এটা হল নেহাত খিটিমিটি। হয়ত এটা আমার গা-সওয়া হয়ে যাওয়া উচিত। কিন্তু তা হতে পারে না বা হবে না, যতদিন প্রায় প্রত্যেকটা আলোচনার (বচসার নাম দিয়েছেন ওঁরা 'আলোচনা') বিষয়বস্তু থাকছি আমি। আমার কিছুই, আবার বলছি, আমার কিছুই নাকি ঠিক নয়; আমার চেহারা, আমার চরিত্র, আমার চলনবলন– আদ্যোপান্ত সবকিছু নিয়েই আলোচনা হচ্ছে। আমাকে (বলা হয়েছে) কড়া কড়া কথা আর চিৎকার চেঁচামেচি একেবারে নীরবে গিলে যেতে হবে; আমি এতে অভ্যস্ত নই।

সত্যি বলতে আমাকে দিয়ে তা হবে না। এইসব অপমান আমি মুখ বুঁজে সহ্য করব না। আমি দেখিয়ে দেব আনা ফ্র্যাঙ্ক মাত্র কাল পেট থেকে পড়েনি। যখন ওঁদের নজরে পড়বে যে আমি ওঁদের শিক্ষা দিতে শুরু করেছি তখন ওঁদের চোখ কপালে উঠবে এবং হয়ত তখন ওঁরা চুপ করে যাবেন। নেব নাকি তেমন ভঙ্গি? স্রেফ বেআদবি! বার বার আমি শুধু অবাক হয়ে যাই ওঁদের জঘন্য আচরণে এবং বিশেষ করে... মিসেস ফান ডানের বোকামিতে, তবে একবার আমার গায়ে একটু সয়ে যাক– সেটা হতে খুব বেশিদিন লাগবে না– তখন ওঁরা কিছু ঢিলের বদলে পাটকেল ফিরে পাবেন, এবং ব্যাপারটা আদৌ আধাখ্যাঁচড়া হবে না। তখন ওদের গলা দিয়ে বেরোবে ভিন্ন সুর।

ওঁরা যে রকম বলেন আমি কি সত্যিই সেইরকম বেয়াদব, অহঙ্কারী, একগুঁয়ে, ওপরপড়া, বোকা, কুঁড়ের বাদ্‌শা ইত্যাদি, ইত্যাদি? না, কখনই তা নয়। আর পাঁচজনের মতই আমারও দোষত্রুটি আছে, আমি তা জানি, কিন্তু ওঁরা প্রত্যেকটা ক্ষেত্রেই তিলকে তাল করে দেখান।

এইসব ঠাট্টাবিদ্রূপের খোঁচায় আমার গা মাঝে মাঝে কি রকম রী রী করে ওঠে তুমি যদি জানতে, কিটি! জানি না আর কতদিন আমি আমার রাগ সম্বরণ করে রাখতে পারব! একদিন না একদিন ঠিক ফেটে পড়ব।

যাক গে, এ নিয়ে আর কচলাব না, এমনিতেই এইসব ঝগড়াঝাঁটির ব্যাপারে ঘ্যান ঘ্যান করে তোমার কানের পোকা বের করে ফেলেছি। তবু টেবিলে যেসব গজালি হয়, তার একটি বেজায় মজাদার, যার সম্পর্কে তোমাকে না বলে পারছি না। কথায় কথায় কিভাবে যেন পিমের (আমার বাপির ডাকনাম পিম্) বিনয়ের পরাকাষ্ঠার প্রসঙ্গটি এসে পড়ে। যে বোকাস্য বোকা তাকেও বাবার এই গুণের কথা স্বীকার করতেই হবে। হঠাৎ মিসেস ফান ডান বললেন, 'আমারও অমনি নিরভিমান স্বভাব, আমার স্বামীর চেয়েও বেশি।'

বটে বটে! এই বাক্যটিই পরিষ্কার দেখিয়ে দিচ্ছে যে, ভদ্রমহিলা যাচ্ছেতাই রকমের বেহায়া এবং ওপরপড়া। মিস্টার ফান ডান মনে করলেন তাঁর নিজের সম্পর্কে যে উক্তি করা হয়েছে সে সম্পর্কে কিছুটা ভেঙে বলা দরকার। 'আমি ওরকম বিনয়ী হওয়াটা পছন্দ করি না– আমার অভিজ্ঞতা, ওতে কোনো ফায়দা হয় না।' তারপর আমার দিকে ফিরে বললেন,

'আমার কথা শোন আনা, খুব বেশি বিনয়ের অবতার হয়ো না। ওতে না-ঘাটকা না-ঘরকা হবে।'

মা-মণিও তাতে সায় দিলেন। তবে মিসেস ফান ডান এ বিষয়ে তাঁর ধারণাটা জুড়ে দিলেন, যা তিনি সব সময়ই করে থাকেন। এরপরই তাঁর মন্তব্যটা হল মা-মণি আর বাপিকে লক্ষ্য করে। 'জীবন সম্পর্কে তোমাদের দেখছি অদ্ভুত দৃষ্টিভঙ্গি। ভাবো একবার, কী জিনিস ঢোকানো হচ্ছে আনার মাথায়; আমি যখন ছোট ছিলাম তখন এমন ছিল না। আমি এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ যে, এখনও তাই; তোমাদের আজকালকার বাড়ি বাদ দিলে।' মা যেভাবে তাঁর মেয়েদের মানুষ করেছেন এটা তার ওপর সরাসরি আঘাত।

ততক্ষণে মিসেস ফান ডানের চোখমুখ রাঙা হয়ে উঠেছে। মা-মণির মুখে শান্ত নির্বিকার ভাব। যারা রেগে লাল হয় তারা এমন তেতে ওঠে যে, এ ধরনের অবস্থায় তারা অসুবিধের পড়ে। মা-মণির তাতেও কোনো ভাবান্তর হল না; কিন্তু যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কথাবার্তায় ছেদ টানার আগ্রহে এক মুহূর্ত একটু ভেবে নিয়ে তারপর বললেন, 'আমিও দেখতে পাই, মিসেস ফান ডান, অতিরিক্ত বিনয়ী না হলে জীবনের সঙ্গে তবু কিছুটা মানিয়ে গুছিয়ে চলা যায়। এখন আমার স্বামী আর মারগট, আর পেটার– এরা হল অসম্ভব ভালোমানুষ; অন্যদিকে তোমার স্বামী, আনা, তুমি আর আমি, আমরা একেবারে উল্টো ধরনের না হলেও, কেউ আমাদের *ঠেলে* এগিয়ে যাবে একটা আমরা কিছুতেই হতে দেব না।'

মিসেস ফান ডান বললেন, 'কিন্তু, মিসেস ফ্রাঙ্ক, এ আপনি কী বলছেন? আমি হলাম অত্যন্ত নম্র, মুখচোরা; আপনি আমাকে কী হিসেবে অন্যরকম বলেন?'

মা-মণি বললেন, 'আমি বলিনি তুমি ঠিক জাঁহাবাজ, তবে কেউ বলবে না যে তুমি লজ্জাবতী লতাটি।'

মিসেস ফান ডান– 'আগে এটার একটা হেস্তনেস্ত হয়ে যাক। বলুন, কী দিক থেকে আমি ওপরপড়া? আমি একটা জিনিস জানি, যদি আমি নিজের আঁচলে গেরো না দিতাম তাহলে আর দেখতে হত না– পেটে কিল মেরে বসে থাকতে হত।'

আত্মরক্ষার এই আগড়ুম বাগড়ুম শুনে মা-মণি তো হেসেই খুন। তাতে মিসেস ফান ডান চটে গিয়ে গুচ্ছের জার্মান-ওলন্দাজ বুলি ঝাড়লেন, তারপর একেবারে চুপ মেরে গেলেন; শেষে চেয়ার থেকে উঠে ঘর ছেড়ে চলে যাওয়ার উপক্রম করলেন।

এমন সময় হঠাৎ আমার দিকে তাঁর চোখ পড়ল। তখন যদি তাঁকে দেখতে। দুর্ভাগ্যবশত যখন তিনি আমার দিকে ফিরেছেন ঠিক সেই মুহূর্তে আমি সখেদে মাথা নাড়ছিলাম– ঠিক ইচ্ছে করে নয়, নিজেরই অজান্তে– কেননা আমি খুব মন দিয়ে ওঁদের বাক্যালাপ শুনছিলাম।

মিসেস ফান ডান আমার দিকে ফিরে জার্মানে গড়গড় করে একগাদা কড়া কড়া কথা শোনালেন; বাজার-চলতি অভদ্র ভাষায়। ঠিক যেন একজন গেঁয়ো লালমুখ মাছওয়ালী– সে এক দেখবার মত দৃশ্য। আমি যদি আঁকতে পারতাম, তাহলে ওঁর চেহারাটা ধরে রেখে দিলে বেশ হত। সে এক গলা-ফাটানো চিৎকার– এমন বোকা, নির্বোধ ছোট মানুষ।

যাই হোক, এ থেকে এখন আমার একটা শিক্ষা হয়েছে। কারো সঙ্গে বেশ ভালোমত বচসা হলে তবেই আসলে লোক চেনা যায়। একমাত্র তখনই তাদের আসল চরিত্র তুমি যাচাই করতে পারো।

তোমার আনা

মঙ্গলবার, ২৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৪২

আদরের কিটি,

অজ্ঞাতবাসে গেলে মানুষের জীবনে অভাবিত সব ঘটনা ঘটে। ভাবো একবার, বাথটাব না থাকায় আমাদের ব্যবহার করতে হচ্ছে হাত ধোয়ার পানির জায়গা। গরম পানি মেলে অফিসঘরে (অফিস বলতে সবসময়ই বুঝবে গোটা নিচের তলা); ফলে, আমরা সাতজন সবাই পালা করে এত বড় বিলাসিতাটা কাজে লাগাই। আমরা একেকজন একেক রকম; কারো কারো শ্লীলতাবোধ অন্যদের চেয়ে একটু বেশি। সেই কারণে সংসারের প্রত্যেকে তার নিত্যকর্মের জন্যে নিজস্ব জায়গা বেছে নিয়েছে। কাঁচের দরজা থাকা সত্ত্বেও পেটার ব্যবহার করে রান্নাঘর। গোসলের ঠিক আগে একে একে আমাদের সকলের কাছে সে যাবে এবং গিয়ে বলবে যে আধঘণ্টা সময় আমরা কেউ যেন রান্নাঘরের পাশ দিয়ে না যাই। ওর ধারণা এটাই যথেষ্ট। মিস্টার ফান ডান সোজা উপরতলায় চলে যান; অতটা পথ গরম পানি টেনে নিয়ে যাওয়ার ঝামেলা কম নয়– কিন্তু ওঁর চাই নিজস্ব ঘরটুকুর আড়াল। মিসেস ফান ডান আজকাল স্রেফ গোসলের পাটই তুলে দিয়েছেন; উনি সেরা জায়গা বের করার অপেক্ষায় আছেন। বাবা গোসল সারেন অফিসের খাসকামরায়; রান্নাঘরে অগ্নিবারক দেয়ালের পেছনের জায়গায় মা-মণি। মারগট আর আমি গা মাজাঘষার জন্যে বেছে নিয়েছি সামনের অফিসঘর। শনিবার বিকেলগুলোতে ঘরের পর্দাগুলো ফেলে দেওয়া হয়, সুতরাং আধো অন্ধকারে আমরা গা ধুই। অবশ্য, এই জায়গাটা আর আমার ভালো লাগছে না; গত সপ্তাহের পর থেকে যেখানে আরেকটু স্বাচ্ছন্দ্য থাকবে এমন একটা জায়গার খোঁজে আছি। পেটার একটা ভালো মতলব দিয়েছে– বড় অফিসঘরের শৌচাগারটা আমার পছন্দ হতে পারে। সেখানে বসা যায়, আলো জ্বালানো যায়, দরজা বন্ধ করা যায়, নিজস্ব গোসলের পানি ঢাললে বাইরে বেরিয়ে যাবে। তাছাড়া চোরাচাহনির হাত থেকে বাঁচব।

রবিবার দিন এই প্রথম আমার মনোরম গোসল-ঘরটা আমি পরখ করে দেখলাম– বাপ্‌রে, কী শব্দ! তবুও আমার মতে এটাই হল সবার সেরা জায়গা। অফিসের শৌচাগার থেকে ড্রেন আর পানির পাইপ সরিয়ে দালানে লাগানোর জন্যে গত সপ্তাহে কলের মিস্ত্রি নিচের তলায় কাজ করেছে। প্রচণ্ড ঠাণ্ডা পড়লে পাইপ যাতে জমে না যায় তারই জন্যে আগে থেকে সারানোর এই ব্যবস্থা। কলের মিস্ত্রির আসাতে সারা দিন আমরা পানি তো নিতে পারিইনি, উপরন্তু শৌচাগারেও যেতে পারিনি। এই মুশকিল আসানের জন্যে আমরা কী করেছিলাম সেটা বললে অবশ্য তোমার কাছে মোটেই প্রীতিকর ঠেকবে না।

এখানে যেদিন আমরা চলে আসি, আমি আর বাবা আমাদের জন্যে যাহোক করে একটা টুক্‌রি বানিয়ে নিয়েছিলাম। আর কিছু না পেয়ে কাজে লাগানোর জন্যে আমরা একটা কাঁচের বয়াম নষ্ট করেছি। যেদিন কলের মিস্ত্রি আসে সেইদিন এইসব পাত্রে দিনের বেলায় বসার ঘরে প্রকৃতিদত্ত জিনিসগুলো জমা করা হয়েছিল। তার চেয়েও খারাপ ছিল মুখে কুলুপ দিয়ে সারাটা দিন বসে থাকা। কুমারী 'প্যাক্-প্যাক্'-এর পক্ষে সেটা যে কী যন্ত্রণাকর ব্যাপার তুমি তা ধারণাই করতে পারবে না। এমনিতেই সাধারণত দিনের বেলায় আমাদের কথা বলতে হয় ফিস্ ফিস্ করে কিন্তু তার চেয়ে দশ গুণ খারাপ মুখ বুঁজে ঠায় বসে থাকা। তিন দিন সমানে বসে থেকে থেকে আমার নিচটা অসাড় হয়ে টনটন করছিল। রাত্তিরে শোয়ার সময় খানিকটা শরীর চালনা করাতে ব্যথা খানিকটা কমল।

তোমার আনা

বৃহস্পতিবার, ১ অক্টোবর, ১৯৪২

আদরের কিটি,

কাল আমার অন্তরাত্মা খাঁচাছাড়া হওয়ার যোগাড় হয়েছিল। আটটার সময় হঠাৎ খুব জোরে বেল বেজে উঠল। আমি ভাবলাম ঐ এল; কার কথা বলছি বুঝতেই পারছ। কিন্তু সবাই যখন বলতে লাগল যে, কোনো চ্যাংড়া ছেলে কিংবা হয়ত ডাক-পিওন, তখন আমি খানিকটা আশ্বস্ত হলাম।

দিনগুলো এখানে ক্রমেই ভারি চুপচাপ হয়ে পড়ছে। মিস্টার ক্রালারের কাছে রসুইখানায় কাজ করেন ছোট্টখাট্টো ইহুদী কম্পাউণ্ডার লিউইন। সারা বাড়িটাই তাঁর নখদর্পণে; তাই আমাদের সর্বদাই ভয় এই বুঝি তিনি খেয়ালবশে পুরনো ল্যাবরেটরিতে একবার উঁকি দিয়ে বসেন। আমরা নেংটি ইঁদুরের মতন ঘাপটি মেরে আছি। তিন মাস আগে ঘুণাক্ষরেও কি কেউ ভাবতে পেরেছিল যে ছটফটে আনাকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা চুপ করে বসে থাকতে হবে– এবং তার চেয়েও বড় কথা, সেটা সে পারবে।

উনত্রিশে ছিল মিসেস ফান ডানের জন্মদিন। অবশ্য দিনটি বড় করে পালন করা যায়নি; তাহলেও তাঁর সম্মানে আমরা একটু প্রীতি সম্মেলনের আয়োজন করেছিলাম, সঙ্গে কিছুটা উন্নতমানের খাবারের ব্যবস্থা হয়েছিল; কিছু ছোটখাটো উপহার আর ফুলও তিনি পেলেন। পতিদেবতার কাছ থেকে পেলেন লাল কারনেশান ফুল, ওটা ওঁদের কুলপ্রথা।

মিসেস ফান ডানের বিষয়ে একটু কচলে নেওয়া যাক; তোমাকে আমার বলা দরকার যে বাপির সঙ্গে উনি প্রায় চেষ্টা করেন ফষ্টিনষ্টি করতে; সেটা হয়ে পড়েছে আমার সারাক্ষণ বিরক্তির কারণ। উনি বাপির মুখে আর চুলে ঠোনা মারেন, স্কার্ট টেনে তোলেন এবং বদ্ রসিকতা করেন– এইভাবে তিনি চান বাপির নজর কাড়তে। বরাত ভালো, বাপি পান না ওঁর ভেতর কোনো আকর্ষণ বা কোনো রসকস– কাজেই বাপির কাছ থেকে কোনো সাড়া মেলে না। মিস্টার ফান ডানের সঙ্গে মা-মণি অমন ব্যবহার করেন না– একথা আমি মিসেস ফান ডানের মুখের ওপর বলেছি।

মাঝে মাঝে পেটার খোলস ভেঙে বেরিয়ে আসে আর তখন ও বেশ মজাদার হয়। আমাদের একটা জিনিসে মিল আছে, তাতে সাধারণত সবাই খুব রঙ্গরস পায়– আমরা দুজনেই সাজতে ভালবাসি। দেখা গেল, মিসেস ফান ডানের বেজায় সিড়িঙ্গে একটা পোশাক পরেছে পেটার আর আমি পরেছি পেটারের প্যান্ট কোট। ওর মাথায় হ্যাট আর আমার মাথায় ক্যাপ।

বড়রা তাই দেখে হেসে কুটোপাটি আর আমরাও তেমনি মজা পাই। মারগটের আর আমার জন্যে বিয়েন কফের দোকান থেকে এলি নতুন স্কার্ট কিনে এনেছেন। কাপড় একেবারেই রদ্দি, ছালার কাপড়ের মতন– দাম নিয়েছে যথাক্রমে ২৪.০০ ফ্লোরিন আর ৭.৫০ ফ্লোরিন। যুদ্ধের আগে কী ছিল, আর এখন কী হয়েছে।

আরেকটা চমৎকার জিনিস আমি ঢাকঢাক গুড়গুড় করে রেখেছি। এলি কোনো এক সেক্রেটারিশিপ পড়ানোর ইস্কুলে না কোথায় যেন লিখে মারগট, পেটার আর আমার জন্যে শর্টহ্যাণ্ডের করেসপণ্ডেন্স কোর্সের অর্ডার দিয়েছেন। রও, আসছে বছরের মধ্যেই দেখবে আমরা সব কিরকম ষোল আনা পোক্ত হয়ে উঠেছি। যাই হোক আর তাই হোক, সাঁটে লিখতে পারাটা অত্যন্ত জরুরি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

তোমার আনা

শনিবার, ৩ অক্টোবর, ১৯৪২

আদরের কিটি,

কাল আবার একচোট খুব হয়ে গেল। মা-মণি ভীষণ চোটপাট করলেন এবং বাপির কাছে আমার ধুড়ধুড়ি নেড়ে দিলেন। তারপর যখন হাউমউ করে কাঁদতে বসলেন তখন আমিও ফেটে পড়লাম। এদিকে আমার যা মাথা ধরেছিল কী বলব। শেষ অবধি বাবাকে আমি বললাম মা-মণির চেয়ে ওঁর ওপর আমার টান বেশি। তার উত্তরে বাপি বললেন, আমি ওটা কাটিয়ে উঠব। আমি তা বিশ্বাস করি না; মা-মণির কাছে যখন থাকি নিজেকে স্রেফ জোর করে আমি শান্ত রাখি। বাপি চান শরীর খারাপ হলে কিংবা মাথা ধরলে মাঝে মাঝে নিজে যেচে আমি যেন মা-মণির সেবা করি। আমি ওর মধ্যে নেই। আমি এখন ফরাসী নিয়ে আদাজল খেয়ে লেগেছি এবং এখন পড়ছি 'লা বেলে নিফেরনাইসে'।

তোমার আনা

শুক্রবার, ৯ অক্টোবর, ১৯৪২

আদরের কিটি

আজ তোমাকে শুধু বিশ্রী মন-খারাপ-করা খবর দেব। আমাদের ইহুদী বন্ধুদের ডজনে ডজনে তুলে নিয়ে যাচ্ছে। এদের সঙ্গে ব্যবহারে গেস্টাপো কোনোরকম ভদ্রতার বালাই রাখছে না, গরু-ভেড়ার ট্রাকে বস্তাবন্দী করে তাদের পাঠিয়ে দিচ্ছে ভেস্টারব্রুকের ডেন্টির বিশাল ইহুদী বন্দীশিবিরে। ভেস্টারব্রুক মনে হচ্ছে সাংঘাতিক জায়গা; একশো লোকের জন্যে একটি করে ছোট্ট কলঘর এবং পায়খানাও প্রয়োজনের তুলনায় খুবই কম। আলাদা আলাদা থাকার ব্যবস্থা নেই। মেয়ে-পুরুষ-বাচ্চা সবাই একসঙ্গে গাদা হয়ে শোয়। এর ফলে সাংঘাতিক নৈতিক অধঃপতন ঘটেছে বলে শোনা যায় এবং কিছুদিন থেকেছে এমন প্রচুর স্ত্রীলোক, এমন কি কমবয়সী মেয়েদেরও পেটে বাচ্চা এসেছে।

পালাবে যে তারও কোনো উপায়ই নেই; শিবিরের বেশির ভাগ লোকেরই মার্কা মারা চেহারা– মাথা কামানো এবং সেই সঙ্গে অনেককেই ইহুদী-ইহুদী দেখতে।

হল্যাণ্ডে থেকেই যখন এই হাল, তখন যে-সব দূর-দূর এবং অজ জায়গায় তাদের পাঠানো হচ্ছে সেখানে কী দশা হবে? আমরা মনে করি, ওদের অধিকাংশকেই খুন করা হচ্ছে। ইংলণ্ডের রেডিও বলছে ওদের নাকি গ্যাস দিয়ে দম বন্ধ করে মারা হচ্ছে।

হয়ত মারবার পক্ষে ওটাই সবচেয়ে সিধে রাস্তা। আমি ভীষণ উতলা হয়ে পড়েছি। মিপ্ যখন এই সব ভীষন ভীষন কাহিনী শোনাচ্ছিলেন, তখন আমি কিছুতেই উঠে যেতে পারছিলাম না। সেদিক থেকে উনি নিজেও খুব টান টান হয়ে ছিলেন। যেমন খুব সম্প্রতিকার একটা ঘটনা– এক অসহায় পঙ্গু ইহুদী বুড়ি মিপের দোরগোড়ায় বসে ছিল; গেস্টাপোর লোক বুড়িতে ঐখানে বসে থাকতে বলে তাকে নিয়ে যাওয়ার জন্যে গাড়ি ডাকতে চলে গিয়েছিল। মাথার ওপর তখন ইংরেজদের প্লেন লক্ষ্য করে গোলা ছোঁড়া হচ্ছে। আর কেবলি এসে এসে পড়ছে সার্চলাইটের ঝাঁঝালো আলো– বুড়ি বেচারা সেই সব দেখে ঠক ঠক করে কাঁপছিল। কিন্তু মিপের সাহস হয়নি বুড়িকে ঘরের ভেতরে ডেকে নেওয়ার; অত বড় ঝুঁকি কেউ নেবে না। জার্মানদের শরীরে দয়ামায়া বলে কিছু নেই– মারতে ওদের কিছুমাত্র তর সয় না। এলিও খুব চুপচাপ হয়ে পড়েছে; ওর ছেলে বন্ধুটিকে জার্মানিতে চলে যেতে হবে। ওর ভয়, যে বৈমানিকেরা আমাদের ঘরবাড়ির ওপর দিয়ে উড়ে যায়, তারা ডীর্কের মাথায় বোমা ফেলবে,

প্রায়ই সে সব বোমা হয় দশ লক্ষ কিলো ওজনের। 'ওর ভাগে দশ লাখ পড়বে বলে মনে হয় না' এবং 'একটি বোমাতেই কাবার'– এসব পরিহাস বরং কুরুচিরই পরিচয় দেয়। অবশ্য ডির্ককে একা যেতে হচ্ছে তা ঠিক নয়; রোজই ট্রেন ভর্তি করে করে ছেলেরা চলে যাচ্ছে। রাস্তায় ছোটখাটো ট্রেন থামলে কখনও কখনও দু-চারজন চোখে ধুলো দিয়ে কেটে পড়ে, বোধ হয় সংখ্যায় তারা খুবই কম। তাই বলে আমার দুঃসংবাদের এখানেই শেষ নয়। তুমি কখনও হোস্টেজের কথা শুনেছ? অন্তর্ঘাতের শাস্তি হিসেবে একেবারে হালে এই জিনিস চালু হয়েছে। এই রকম ভয়াবহ ব্যাপার আর কিছু ভাবতে পারো?

গণ্যমান্য সব নাগরিক– তারা একেবারে নিরপরাধ– তাদের মাথার ওপর খাঁড়া ঝুলিয়ে হাজতে পুরে রাখা হয়েছে। অন্তর্ঘাতকের পাত্তা করতে না পারলে গেস্টাপো সোজা পাঁচজন করে হোস্টেজকে দেয়ালে লট্‌কে দেবে। এইসব নাগরিকদের মৃত্যুর খবর প্রায়ই কাগজে বেরোয়। এই অপকর্মকে 'দুর্ঘটনায় মৃত্যু' বলে বর্ণনা করা হয়। খাসা লোক, এই জার্মানরা! ভাবি, আমিও একদিন ওদেরই একজন ছিলাম। না, হিটলার আমাদের জাতিসত্তা অনেক আগেই কেড়ে নিয়েছে। আদতে জার্মানরা আর ইহুদীরা এখন দুনিয়ার পরস্পরের সবচেয়ে বড় শত্রু।

তোমার আনা

শুক্রবার, ১৬ অক্টোবর, ১৯৪২

আদরের কিটি,

আমি সাংঘাতিক ব্যস্ত। এইমাত্র আমি 'লা বেলে নিফেরনাইসে' থেকে একটি অধ্যায় তর্জমা করেছি এবং নতুন শব্দগুলো খাতায় টুকেছি। এরপর একটা যারপরনেই ভজোঘটে বুদ্ধির অঙ্ক আর তিন পৃষ্ঠা ব্যাকরণ। আমি সোজা বলে দিই রোজ রোজ এই সব বুদ্ধির অঙ্ক আমাকে দিয়ে হবে না। অঙ্কগুলো যে অতি যাচ্ছেতাই, এ বিষয়ে বাপি আমার সঙ্গে একমত। আমি বোধ হয় অঙ্কে বাপির চেয়ে এককাঠি সরেস, যদিও দুজনের কেউই আমরা খুব একটা ভালো নই। প্রায়ই আমাদের মারগটকে ডাকতে হয়। শর্টহ্যাণ্ডে তিনজনের মধ্যে আমিই আছি সব চেয়ে এগিয়ে।

কাল আমি 'দি অ্যাসল্ট' বইটা শেষ করলাম। বইটা বেশ মজার। কিন্তু 'য়ুপ টের হয়েল্'-এর কাছে লাগে না। আদতে আমার মতে সিসি ফান মার্ক্সফেল্ড্‌ট্ হলেন প্রথম শ্রেণীর লেখিকা। আমি আমার ছেলেমেয়েদের অবশ্যই ওঁর বই পড়তে দেব। মা-মণি, মারগট আর আমি– আবার এখন আমাদের খুব আঠা-আঠা ভাব। এটা সত্যিই অনেক ভালো। কাল সন্ধ্যেবেলায় মারগট আর আমি দুজনে এক বিছানায় শুয়েছিলাম। ঠাসাঠাসি করে শুতে হলেও সেটা ভালোই লেগেছে। মারগট জিজ্ঞেস করল আমার ডায়রিটা ও পড়তে পারে কিনা। আমি বললাম, 'হ্যাঁ, পারো– অন্তত খানিকটা খানিকটা।' তারপর আমি জিজ্ঞেস করলাম ওরটা আমি পড়তে পারি কিনা। মারগট বলল, 'হ্যাঁ।' এরপর কথায় কথায় ভবিষ্যতের প্রসঙ্গ উঠল। আমি ওকে জিজ্ঞেস করলাম বড় হয়ে ও কী হতে চায়। কিন্তু ও কিছুতেই ভাঙল না। এবং ব্যাপারটা চেপে গেল। আমি আঁচ করে বুঝলাম ওর ইচ্ছে বোধ হয় মাস্টারি করার। আমার অনুমান সঠিক কিনা জানি না। আমার মনে হয় অবশ্য, আমারই বা জানার জন্যে অত ছোঁকছোঁকানি কেন!

আজ সকালে পেটারকে ভাগিয়ে আমি ওর বিছানা দখল করেছিলাম। ও ভীষণ চটে

গিয়েছিল, আমি কেয়ার করিনি। আমার ওপর অতটা রাগ না করলেই ও পারত, কাল যখন ওকে আমি একটা আপেল দিয়েছি।

আমি দেখতে খুব কুৎসিত কিনা মারগটকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। ও বলেছিল বিলক্ষণ মনে ধরার মতন আমার চেহারা, এবং আমার চোখজোড়া চমৎকার। কথাগুলো, একটু রেখেঢেকে বলা তাই না?

বারান্তরে কথা হবে।

তোমার আনা

মঙ্গলবার, ২০ অক্টোবর, ১৯৪২

আদরের কিটি,

এখনও আমার হাত কাঁপছে, যদিও আমাদের আচম্‌কা ভয় পাওয়ার ব্যাপারটা ঘটেছিল সেই দু ঘণ্টা আগে। খোলাসা করে বলছি। বাড়িটাতে আগুন নেভানোর সরঞ্জাম আছে পাঁচটা। আমরা জানতাম যে ওগুলো ভর্তি করবার জন্যে কেউ একজন আসছে; কিন্তু আসছে যে ছুতোরমিস্ত্রি, বা তাকে তুমি যাই বলো, এটা আগে থেকে আমাদের জানানো হয়নি।

ফলে, আলমারি-ঢাকা দরজার উল্টোদিকের দালানে হাতুড়ি পেটানোর আওয়াজ আমার কানে যাওয়ার আগে পর্যন্ত আমরা মুখে চাবি আঁটার কোনো প্রচেষ্টা করেনি। তক্ষুনি ছুতোরমিস্ত্রির কথা আমার মাথায় আসে; এলি আমাদের সঙ্গে খেতে বসেছিল, ওকে আমি সাবধান করে দিয়ে বলি ও যেন নিচের তলায় না যায়। বাবা আর আমি গিয়ে দরজার পাশে দাঁড়াই যাতে লোকটা চলে গেলে আমরা টের পাই। মিনিট পনেরো ধরে হাতুড়ি পেটানোর পর লোকটা তার হাতুড়ি আর যন্ত্রপাতিগুলো আলমারির মাথায় রেখে দিল (আমরা ধারণা করেছিলাম) এবং তারপর আমাদের দরজায় টোকা দিতে শুরু করল। শুনে আমরা একেবারে ভয়ে সাদা হয়ে গেলাম! ও বোধ হয় কোনোরকম আওয়াজ পেয়ে থাকবে এবং আমাদের গোপন আড্ডার ব্যাপারে খোঁজ খবর করতে চাইছিল। দেখে শুনে সেই রকমই মনে হয়েছিল। দরজা ঠোকা, টানাটানি, ঠেলাঠেলি, খোলাখুলি– এইসব সমানে চলছিল। কোথাকার কে না কে আমাদের এমন সুন্দর আত্মগোপনের জায়গাটা জেনে যাবে, এটা ভেবে আমি প্রায় অজ্ঞান হয়ে পড়ছিলাম। যখন আমি ভাবছি যে মৃত্যু আমার শিয়রে এসে দাঁড়িয়েছে, ঠিক তখনই আমার কানে গেল মিস্টার কুপহুইস বলছেন, 'দরজা খোলো, আমি হে আমি।' সঙ্গে সঙ্গে আমরা দরজা খুলে দিলাম। যে-আংটার সঙ্গে আলমারিটা লাগানো, সেটা খুলতে পারে যারা ভেতরের খবর জানে। কিন্তু আংটাটা সেঁটে গিয়েছিল। তার ফলে ছুতোরমিস্ত্রি আসার ব্যাপারটা আগে থেকে আমাদের কেউ জানিয়ে দিতে পারেনি। ছুতোরমিস্ত্রি নিচে চলে গেছে এবং কুপহুইস চাইছিলেন এলিকে ডেকে নিয়ে যেতে, কিন্তু আলমারিটা আর খোলা যাচ্ছিল না। বাপ রে, আমি হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। যে লোকটা ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করছিল সে আমার কল্পনায় ফেঁপে ফুলে উঠতে উঠতে দানবের আকারে দুনিয়ার সবচেয়ে ডাকসাইটে ফ্যাসিস্ট হয়ে উঠেছিল।

যাক গে, কপাল ভালো, তাই এবারে সব ভালোয় ভালোয় উৎরে গেল। ইতিমধ্যে সোমবারটা তোফা কেটেছে। মিপ্ আর হেংক্ রাত্তিরে থেকে গিয়েছিলেন। ফান সান্টেন্‌দের আমাদের ঘর ছেড়ে দিয়ে মারগট আর আমি সে রাতে মা-বাবার ঘরে শুয়েছিলাম। খাবারটা হয়েছিল গরম উপাদেয়। শুধু একটাই যা বিঘ্ন ঘটেছিল। বাবার বাতিটা গোলমাল করায়

গোটা বাড়ি ফিউজ হয়ে যায়। হঠাৎ দেখি ঘুঁটঘুটে অন্ধকারে আমরা বসে আছি। কী করা যায়? বাড়িতে কিছুটা ফিউজের তার আছে বটে, কিন্তু ফিউজবক্স রয়েছে অন্ধকার গুদাম-ঘরের একদম পেছনদিকে– সন্ধ্যের পর খুব খিট্‌কেল কাজ। তবু পুরুষমানুষেরা পিছু হটল না। দশ মিনিট পর মোমবাতিগুলো আবার ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে দেওয়া গেল।

আমি আজ ভোরে উঠেছি। সাড়ে আটটায় হেংক্‌কে চলে যেতে হল। জমিয়ে বসে সকালের খাওয়া সেরে মিপ্ নিচে চলে গেলেন। বৃষ্টি হচ্ছিল মুষলধারে। তার মধ্যে সাইকেল চালিয়ে যে অফিসে আসতে হয়নি, মিপ্ তাতে খুশি। পরের সপ্তাহে এলি আসছে; এখানে এক রাত কাটাতে।

তোমার আনা

বৃহস্পতিবার, ২৯ অক্টোবর, ১৯৪২

আদরের কিটি,

আমি খুবই চিন্তায় আছি, বাপি অসুস্থ। খুব জ্বর আর গায়ে লাল লাল কি সব বেরিয়েছে, হাম বলে মনে হয়। আমরা ডাক্তারও ডাকতে পারছি না, ভাবো! মা-মণি চেষ্টা করছেন বাপির যাতে ঘাম বের হয়। হয়ত তাতে গায়ের তাপ কমবে।

আজ সকালে মিপ্ আমাদের বললেন যে, ফান ডানদের বাড়ি থেকে সমস্ত আসবাবপত্র নিয়ে গেছে। মিসেস ফান ডানকে আমরা এখনও বলিনি। এমনিতেই উনি যে রকম তেতে পুড়ে রয়েছেন, তাতে বাড়িতে ওঁর ফেলে-আসা মনোরম সব চিনেমাটির বাসন, আর সুন্দর সুন্দর সব চেয়ার নিয়ে আরেকবার উনি ফোঁপাতে শুরু করলে সেটা শুনতে আমাদের ভালো লাগবে না। আমরা বাধ্য হয়ে, আমাদের প্রায় সমস্ত ভালো জিনিস ফেলে রেখে চলে এসেছি; সুতরাং ও নিয়ে এখন গাঁইগুঁই করে লাভ কী?

ইদানীং তুলনায় বড়দের বইপত্র আমি পড়তে পারছি। এখন আমি পড়ছি নিকো ফান জুখটেলেনের 'ইভার যৌবন'। এর সঙ্গে স্কুলের মেয়েদের প্রেমের গল্পের খুব বেশি তফাত দেখতে পাচ্ছি না। এটা ঠিক যে এঁদো গলিতে অচেনা পরপুরুষের কাছে মেয়েরা নিজেদের বিক্রি করছে, এ সব কিছু কিছু জিনিস এতে আছে। এর জন্যে তারা একমুঠো টাকা চাইছে। আমার জীবনে এ রকম ঘটলে আমি মরে যেতাম। এতে আরও বলা আছে যে ইভার মাসিক হয়। ইস, আমার কবে যে হবে; মনে হয় জীবনে এটা একটা দামী জিনিস।

বড় আলমারিটা থেকে বাবা এনেছেন গোটে আর শিলারের নাটক। প্রত্যেক দিন সন্ধ্যেবেলায় বাবা আমাকে পড়ে শোনাবেন। 'ডন্ কার্‌রস্' দিয়ে আমাদের এই পড়ার ব্যাপারটা শুরু হয়ে গেছে।

বাপির দেখাদেখি জোর করে মা-মণি তাঁর প্রার্থনাপুস্তক আমার হাতে ঠেসে দিয়েছেন। মুখরক্ষার জন্যে জার্মান ভাষার কিছু কিছু স্তোত্র আমি পড়েছি; পড়তে বেশ সুন্দর, কিন্তু আমার কাছে খুব একটা অর্থবহ বলে মনে হয় না। আমাকে অমন উনি জোর করে ধার্মিক করতে চান কেন, কেবল ওঁকে খুশি করার জন্যে?

কাল আমরা এই প্রথম ঘরে আগুন জ্বালাব। শেষটায় ধোঁয়ার চোটে আমরা দমবন্ধ হয়ে মারা না যাই। কত যুগ ধরে যে চিমনি সাফ করা হয়নি তার ঠিক নেই। আশা করা যাক, চিমনিটা ধোঁয়া টানবে।

তোমার আনা

শনিবার, ৭ নভেম্বর, ১৯৪২

আদরের কিটি,

মার মেজাজ সাংঘাতিক তিরিক্ষে, এবং মনে হয় আমার জীবনে সেটা সব সময় অশান্তি ডেকে আনে। না বাবা, না মা– ওঁরা কেউই কখনও মারগটকে বকেন না এবং ওঁরা সব সময় সব দোষ আমার ঘাড়ে চাপান– এটা কি নেহাতই একটা আকস্মিক ব্যাপার? কাল সন্ধ্যের কথাই ধরা যাক; মারগট একটা বই পড়ছিল, তাতে সুন্দর সুন্দর সব আঁকা ছবি; বইটা উপুড় করে রেখে ও উঠে ওপরে চলে গেল যাতে ফিরে এসে আবার পড়া শুরু করতে পারে। আমার হাতে কোনো কাজ ছিল না বলে বইটা তুলে নিয়ে ছবিগুলো দেখতে শুরু করে দিলাম। মারগট ফিরে এসে 'ওর' বই আমার হাতে দেখে ভুরু কুঁচকে বইটা ফেরত চাইল। আমি শুধু চেয়েছিলাম আরও কয়েকটা পাতা উল্টে বইটা দেখতে, তার জন্যেই মারগট ক্রমশ রাগে ফুলে উঠতে লাগল। মা-মণি তার সঙ্গে যোগ দিয়ে বললেন, 'মারগটকে বইটা দিয়ে দে; ও পড়ছিল।' বাবা এই সময় ঘরে এলেন। কী ব্যাপার কিছুই না জেনে, শুধু মারগটের মুখে ক্ষুণ্ন হওয়ার ভাব দেখেই উনি আমাকে নিয়ে পড়লেন– 'তোমার কোনো বইতে যদি মারগট হাত দিত, তাহলে তুমি কী বলতে আমি দেখতাম।' আমি কোনো আপত্তি না করে তক্ষুনি বইটা নামিয়ে রেখে ঘর ছেড়ে চলে গেলাম– ওঁরা ভাবলেন, আমি অভিমান করেছি। যেটা হল, সেটা রাগও নয়, অভিমানও নয়– শুধু আমার খুব খারাপ লাগতে লাগল। কী নিয়ে গোলমাল সেটা না জেনে রায় দিয়ে দেওয়া– বাবার এটা উচিত হয়নি। আমি বইটা নিজেই মারগটকে দিয়ে দিতাম, এবং ঢের তাড়াতাড়ি, মা-বাবা যদি এ ব্যাপারে নাক না গলাতেন। ওঁরা এসেই এমনভাবে মারগটের পক্ষ নিলেন যেন তার প্রতি এক মহা অপরাধ করা হয়েছে।

মা-মণি মারগটের পক্ষ নেবেন এটা বোঝাই যায়; উনি আর মারগট, ওঁরা দুজনে সব সময়ই পরস্পরকে সমর্থন করে চলেন। এটা আমার কাছে এমন ডালভাত হয়ে গেছে যে মার বকবকানি আর মারগটের মেজাজ এসব আমি একেবারেই গায়ে মাখি না।

আমি ওদের ভালবাসি, তার একমাত্র কারণ ওরা মা আর মারগট বলে। বাবার ব্যাপারটা একটু আলাদা। বাবা মারগটকে দৃষ্টান্ত হিসেবে দেখালে, ওর কার্যকলাপ মঞ্জুর করলে, বাবা ওকে প্রশংসা আর আদর করলে আমার বুক ফেটে যায়, কেননা বাবাকে আমি মনে মনে পূজো করি। আমার ভরসা আমার বাবা। দুনিয়ায় বাবাকে ছাড়া আর কাউকে আমি ভালবাসি না। এটা বাবার নজরে পড়ে না যে, মারগটের সঙ্গে বাবা যে ব্যবহার করেন আমার সঙ্গে তা করেন না। মারগটের মত সুন্দর, মিষ্টি, রূপসী মেয়ে দুনিয়ায় দুটি নেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি নিশ্চয় এটা দাবি করতে পারি যে, আমার দিকেও তাকানো হোক। বাড়িতে আমি হলাম সব সময়ই উজবুক, হাতে পায়ে জড়ানো; কিছু করলে সব সময়ই আমার হয় দুনো খোয়ার, প্রথমে জোটে গালমন্দ এবং তারপর আবার আমার মনঃক্ষুণ্ণ হওয়ার ধরনের জন্যে। এই স্পষ্ট পক্ষপাত আর আমি বরদাস্ত করতে রাজী নই। আমি বাপির কাছ থেকে এমন কিছু চাই যা উনি আমাকে দিতে পারছেন না।

মারগটকে আমি হিংসে করি না, কখনই করিনি। ওর চোখমুখ ভালো, ও সুন্দর দেখতে– তার জন্যে আমার গা জ্বলে না। আমি শুধু উন্মুখ হয়ে থাকি বাপির সত্যিকার ভালবাসার জন্যে; শুধু তাঁর সন্তান বলে নয়, আমি আনা হিসেবে।

আমি বাপিকে আঁকড়ে ধরি, কারণ শুধু তাঁর ভেতর দিয়েই বাড়ির প্রতি আমার অবশিষ্ট

টানটুকু আমি বাঁচিয়ে রাখতে পারি। বাপি বোঝেন না যে, মাঝে মাঝে মা-মণির ব্যাপারে আমার চাপা অভিমান প্রকাশ করার দরকার হয়। বাপি এ নিয়ে কথা বলতে নারাজ; শেষে মা-মণির ভুলত্রুটি নিয়ে কোনো মন্তব্য হয় এমন যে কোনো জিনিস বাপি স্রেফ এড়িয়ে চলেন। ঠিক তেমনি, আমি আর সব পারি কিন্তু মা-মণি এবং তাঁর ভুলত্রুটিগুলো সহ্য করা আমার পক্ষে শক্ত হয়। এর সবটাই কিভাবে নিজের মনে চেপে রাখতে হয় আমি জানি না। মার জবরজং কাজ, বাঁকা বাঁকা কথা এবং তাঁর মিষ্টত্বের অভাব– সব সময় চোখে আঙুল দিয়ে দেখানো আমার পক্ষে সম্ভব নয়; অন্য দিকে এটাও মানতে পারি না যে আমি যা করি তাতেই দোষ।

সব কিছুতেই আমরা একে অন্যের ঠিক বিপরীত; কাজেই আমরা পরস্পরের বিরুদ্ধে যাব, এটা স্বাভাবিক। মা-মণির স্বভাবের ব্যাপারে আমি কোনো রায় দিচ্ছি না, সে বিচারে যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমি তাঁকে দেখছি শুধু মা হিসেবে এবং আমার কাছে সেদিক থেকে তিনি মোটেই সার্থক নন; আমাকে আমার নিজেরই মা হতে হবে। আমি ওদের সকলের কাছ থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছি; আমি আমার নিজের কর্ণধার এবং পরে দেখা যাবে কোথায় তরী ভেড়াব। এ সব কথা ওঠে বিশেষ করে এই জন্যেই যে, নিখুঁত মা আর সহধর্মিণী কি রকম হওয়া উচিত তার একটা ছবি আমার মানসপটে আঁকা আছে; যাঁকে আমি 'মা' বলতে বাধ্য, তাঁর ভেতর ঘুণাক্ষরেও সে ছবির কোনো আদল দেখতে পাই না।

আমি সবসময় এই বলে মনকে বেঁধে নিই যে, মা-মণির কু-দৃষ্টান্তগুলোর দিকে আমি নজর দেব না। আমি মার শুধু ভালো দিকটাই দেখতে চাই এবং তাঁর ভেতর যেটা না পাব সেটা আমি নিজের ভেতর খুঁজব। কিন্তু তাতে কাজ হয় না এবং এর ভেতর সবচেয়ে খারাপ জিনিস হল– বাপি না, মা-মণি না-ওঁরা কেউই আমার জীবনের এই ফাঁকটা দেখতে পান না এর জন্যে আমি ওঁদেরই দায়ী করি। কেউ কখনও তাদের সন্তানদের একেবারে পুরোপুরিভাবে খুশি করতে পারে বলে মনে হয় না।

মাঝে মাঝে আমি বিশ্বাস করি, ভগবান আমাকে বাজিয়ে দেখতে চান, যেমন এখন তেমনি এর পরেও; আমাকে ভালো হতে হবে নিজের চেষ্টায়, কাউকে দেখে নয়, কারো সদুপদেশ শুনে নয়। তাহলে এরপর আমি আরও বেশি জোর পাব। আমি ছাড়া দ্বিতীয় কে আর এই চিঠি পড়বে? নিজের কাছ থেকে ছাড়া দ্বিতীয় আর কার কাছ থেকেই বা আমার সান্ত্বনা মিলবে? প্রায়ই আমার সান্ত্বনার দরকার হয় বলে, অনেক সময়ই নিজেকে মনে হয় দুর্বল এবং নিজের ওপর অসন্তুষ্ট; আমার দোষত্রুটি বিস্তর। এটা আমি জানি এবং প্রত্যহ আমি আত্মন্নতির চেষ্টা করি, বার বার করি।

আমার রোগ তাড়ানোর প্রথাটা খুবই বিচিত্র। একদিন আনা হয় ভারি বুঝদার মেয়ে এবং তাকে সবজান্তা বলে মেনে নেওয়া হয় এবং পরের দিনই শুনি আনা একটা বোকা পাঁঠা, একেবারে গণ্ডমূর্খ এবং সে মনে করে বই পড়ে পড়ে ভারি দিগ্‌গজ হয়ে উঠেছে। আমি কচি খুকী নই, অথবা এখন আর আদরে-মাথা খাওয়াও নই যে, যাই কিছু করুক সে হবে হাসির পাত্র। কথায় প্রকাশ করে উঠতে না পারলেও আমার নিজস্ব মতামত, ছক এবং ভাবনাচিন্তা আছে। যখন আমি বিছনায় শুই আমার ভেতর কত কিছু যে টগবগ করে ফোটে যাদের সম্পর্কে আমি অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছি, যারা সব সময় আমার মনোগত অভিপ্রায় ধরতে না পেরে তার কদর্থ করে, তাদেরই সঙ্গে আমাকে ওঠাবসা করতে হচ্ছে। সেইজন্যেই আমার শেষ আশ্রয়স্থল হয় আমার ডায়রি। আমার সূচনা আর পরিণতি সেখানেই, কেননা কিটি, সব

সময় সহনশীল। আমি তাকে কথা দেব, আমি সব সত্ত্বেও সমানে লেগে থাকব এবং এই সব কিছুর ভেতর দিয়ে আমার নিজস্ব পথ খুঁজে নেব এবং আমার চোখের পানি নীরবে গিলব। এরই মধ্যে যেন দেখতে পাই তাতে ফল হয়েছে অথবা যে আমাকে ভালোবাসে তেমন কারো কাছ থেকে যেন উৎসাহ পাই, এটাই আমার মনোগত বাসনা।

আমাকে দোষী সাব্যস্ত করো না; বরং মনে রেখো, কখনও কখনও আমিও ফেটে পড়ার পর্যায়ে পৌঁছুতে পারি।

তোমার আনা

সোমবার, ৯ নভেম্বর, ১৯৪২

আদরের কিটি,

কাল ছিল পেটারের জন্মদিন, ওর বয়স হল ষোল বছর। ও বেশ সুন্দর সুন্দর কিছু উপহার পেয়েছে। নানা জিনিসের মধ্যে রয়েছে একটা মনোপলি খেলা, একটা দাড়ি কামানোর ক্ষুর আর একটা লাইটার। ও যে খুব একটা সিগারেট খায় তা নয়; আসলে নিছক দেখানোর জন্যে।

সবচেয়ে তাক লাগানোর ব্যাপার এল মিস্টার ফান ডানের কাছ থেকে। বেলা একটার সময় তিনি ঘোষণা করলেন যে ব্রিটিশরা তুনিস, আলজিয়ার্স, কাসাব্লাঙ্কা আর ওরানে অবতরণ করেছে। প্রত্যেকে বলছিল, 'এইবার শেষের শুরু', কিন্তু ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিল বোধ হয় ইংল্যাণ্ডে একই জিনিস শুনেছিলেন, তিনি বললেন, 'এটা শেষ নয়। এমন কি এটা শেষেরও শুরু নয়। আসলে এটা বোধ হয় আরম্ভে শেষ।' তফাতটা কি ধরতে পারছ? আশাবাদী হওয়ার রীতিমত কারণ আছে। রুশরা তিন মাস ধরে যে স্তালিনগ্রাদ শহরে সমানে প্রতিরোধ চালিয়ে যাচ্ছে, এখনও তা জার্মানদের হাতে চলে যায়নি।

আমাদের গোপন ডেরার প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক। আমাদের খাবার জিনিসের যোগান সম্বন্ধে তোমাকে কিছুটা বলা দরকার। তুমি জানো, আমাদের ওপরতলায় কিছু আছে একেবারে সত্যিকার লুভিস্টি শুয়োর।

আমরা রুটি পাই কুপহুইসের বন্ধু এক চমৎকার রুটিওয়ালার কাছ থেকে। বাড়িতে থাকতে যতটা পেতাম, স্বভাবতই সেই পরিমাণ মেলে না। তবে ওতে আমাদের কুলিয়ে যায়। সেই সঙ্গে বেআইনীভাবে চারটে রেশন কার্ড কেনা হয়েছে। এই সব রেশন কার্ডের দাম দিন দিনই বাড়ছে। সাতাশ ফ্লোরিন থেকে বেড়ে এখন তার দাম হয়েছে তেত্রিশ ফ্লোরিন। তাও কী, না ছাপানো এক টুকরো কাগজের জন্যে।

কিছু খাবার বাড়িতে রেখে দেওয়ার জন্যে, ১৫০ টিন তরিতরকারি ছাড়াও, আমরা ২৭০ পাউন্ড শুকনো কড়াইশুঁটি আর বিন্ কিনেছি। সবটাই আমাদের জন্যে নয়, তার কিছুটা অফিসের লোকদেরও জন্যে। আমাদের যাতায়াতের ছোট রাস্তায় (লুকানো দরজার ভেতরদিকে) বস্তায় করে জিনিসগুলো হুকে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। ভেতরের জিনিস খুব ভারী হওয়ায় তার চাপে বস্তার কিছু কিছু সেলাই ছিঁড়ে গিয়েছে।

কাজেই আমরা ঠিক করেছিলাম যে, শীতের জন্য রাখা মালগুলো চিলেকোঠায় রেখে দিলেই ভালো হয়। পেটারকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল ও যেন মালগুলো টেনে টেনে ওপরে তোলে।

ছটার মধ্যে পাঁচটা বস্তা অক্ষত অবস্থায় সে ওপরে তুলেছিল। ছয় নম্বর বস্তাটা যখন

সে টেনে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছিল, তখন বস্তাটার তলা ফেঁসে যায়। ফলে, বেগুনে বিনৃগুলো ঝুর ঝুর করে– না, একবারে যথার্থ মুষলধারে বেরিয়ে এসে সিঁড়িতে ঝম্ ঝম্ করে পড়তে লাগল। বস্তায় পঞ্চাশ পাউণ্ডের মত জিনিস ছিল এবং তার এত আওয়াজ যে, তাতে মরা মানুষও জেগে ওঠে।

নিচেরতলার লোকেরা ভাবল ঝরঝরে পুরনো বাড়িটা বুঝি তাদের মাথায় ভেঙে পড়ছে। (ভগবানের দয়ায় বাড়িতে তখন কোনো বাইরের লোক ছিল না) পেটার এক মুহূর্তের জন্য ঘাবড়ে গিয়েছিল। কিন্তু পরক্ষণেই হাসতে হাসতে ওর পেট ফাটার যোগাড়, বিশেষ করে ও যখন দেখল সিঁড়ির নিচে আমি দাঁড়িয়ে আছি বিনের সমুদ্দুরের মাঝখানে যেন ছোট্ট একটা দ্বীপ হয়ে। আমার গোড়ালি অব্দি বিনের মধ্যে সম্পূর্ণভাবে ডোবা।

তাড়াতাড়ি আমরা কুড়োতে শুরু করে দিলাম। কিন্তু বিনের দানা এত পিছল আর ছোট যে গড়িয়ে গড়িয়ে যেন সম্ভব অসম্ভব যত আনাচকানাচ আর গর্তে গিয়ে পড়ছিল। এখন হয়েছে কী, যখনই কেউ নিচে যায় একবা দুবার হাঁটু মুড়ে নিচু হয়ে যাতে সে মিসেস ফান ডানকে একমুঠো করে বিন ভেট দিতে পারে।

আরেকটু হলে বলতে ভুলে যেতাম যে বাপি আবার বেশ ভালো হয়েছেন।

তোমার আনা

পুনশ্চ ঃ এইমাত্র রেডিওতে খবর বলল যে, আলজিয়ার্সের পতন হয়েছে। মরোক্কো, কাসাব্লাঙ্কা আর ওরান বেশ কয়েকদিন ধরে ব্রিটিশের কব্জায়। এইবার তুনিসের পালা, আমরা তার অপেক্ষায় আছি।

মঙ্গলবার, ১০ নভেম্বর, ১৯৪২

আদরের কিটি,

দারুণ খবর– আমরা আরেকজনকে আশ্রয় দিতে চলেছি, উনি এলে আমরা হব আটজন। হ্যাঁ, সত্যি। আমরা বরাবর ভেবেছি যে, আরও একজনের থাকার মতন আমাদের যথেষ্ট জায়গা আর খাবারদাবার আছে। আমাদের ভয় ছিল তাতে কুপহুইস আর ক্রালারের আরও কষ্ট বাড়বে। কিন্তু ইহুদীদের মর্মান্তিক দুর্দশার খবর এখন যে হারে বেড়ে চলেছে, তাতে যে দুজনের কথামত কাজ হবে বাপি তাঁদের ধরে বসেন এবং তাঁরাও মনে করেন প্রস্তাবটা খুব ভালো। ওঁরা বলেছেন, 'সাতজনকে নিয়ে যে ভয়, আটজন হলেও সেই এই ভয়', খুব ঠিক কথা। কথা পাকা হওয়ার পর আমরা আমাদের বন্ধুবর্গের মধ্যে বাছাই করে কোন্ একজনকে নিলে আমাদের 'পরিবারে'র সঙ্গে ভালাভাবে খাপ খাবে, এই নিয়ে আমরা ভাবনাচিন্তা করতে লেগে গেলাম। একজনের সম্বন্ধে মনস্থির করতে কোনো মুশকিল ছিল না। ফলে ডান পরিবারের আত্মীয়স্বজনদের বাপি যখন নাকচ করে দিলেন, তখন আমরা অ্যালবার্ট ডুসেল বলে এজন দাঁতের ডাক্তারকে মনোনীত করলাম। যখন যুদ্ধ শুরু হয়, তখন ভাগ্যক্রমে তাঁর স্ত্রী ছিলেন দেশের বাইরে। খুব চুপচাপ ধরনের মানুষ বলে লোকে তাঁকে জানে। আমরা এবং মিস্টার ফান ডান তাঁকে যতটা জানি, তাতে দুই পরিবারেরই ধারণা– ভদ্রলোক নির্ঝঞ্ঝাট মানুষ। মিপ্ ওঁকে চেনেন। কাজেই ওঁকে এখানে আনার ব্যাপারে মিপ্ সব ব্যবস্থা করতে পারবেন। উনি এলে মারগটের জায়গায় আমার ঘরে ওঁকে শুতে হবে, মারগট ঘুমোবে ক্যাম্পখাটে।

তোমার আনা

বৃহস্পতিবার, ১২ নভেম্বর, ১৯৪২

আদরের কিটি,

মিপ্ যখন ডুসেলকে জানান যে তাঁর জন্যে একটা গা ঢাকা দেওয়ার জায়গার ব্যবস্থা হয়েছে, ডুসেল বেজায় খুশি হন। মিপ্ ওঁকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চলে আসার জন্যে তাগাদা দেন। ভাগো হয় শনিবারে এলে। ডুসেল বলেন শনিবারেই চলে আসা বোধহয় সম্ভব হবে না, প্রথমত ওঁর কার্ডের সূচিপত্র হাল অবধি টেনে আনতে হবে, জনা দুয়েক রোগীকে দেখতে হবে এবং দেনাপাওনাগুলো মিটিয়ে ফেলতে হবে। মিপ্ আজ সকালে এসেছিলেন এই খবরটা দিতে। আমরা বলি যে, ওঁর দেরি করা উচিত হবে না। ওঁকে এভাবে গোছগাছ করে আসতে গেলে একগাদা লোকের কাছে জবাবদিহি করতে হবে, তারা জেনে যাক এটা আমরা চাই না। মিপ্ ওঁকে জিজ্ঞেস করবেন শনিবারে কোনোমতে উনি চলে আসতে পারেন কিনা।

ডুসেল না বলেছেন, উনি জানিয়েছেন, সোমবারে আসবেন। এরকম একটা প্রস্তাবে– তা সে যেরকমই হোক– কোথায় তিনি লাফিয়ে চলে আসবেন, তা নয়– আমার কাছে একটা এক রকমের পাগলামি বলে মনে হয়। বাইরে থাকা অবস্থায় ওঁকে যদি তুলে নিয়ে চলে যায়, তখন কি উনি আর ওঁর কার্ড সাজানো, দেনাপাওনা মেটানো, রোগী দেখা– এসব করতে পারবেন? তাহলে আর দেরি করা কেন আমার মনে হয় বাবা তাতে রাজী হয়ে বোকামি করেছেন। আর কোনো খবর নেই।

তোমার আনা

মঙ্গলবার, ১৭ নভেম্বর, ১৯৪২

আদরের কিটি,

ডুসেল এসে পৌঁচেছেন। সব ভালোভাবে চুকেছে। মিপ্ ওঁকে বলেছিলেন ডাকঘরের সামনে একটা বিশেষ জায়গায় ঠিক এগারোটার সময় এসে দাঁড়াতে, সেখানে একটি লোক ওঁর সঙ্গে দেখা করবে। ডুসেল একেবারে কাঁটায় কাঁটায় যথাসময়ে নির্দিষ্ট জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছেন। মিস্টার কুপহুইস– ডুসেল তাঁরও পরিচিত– ওঁর কাছে এগিয়ে গিয়ে বলেন, যে ভদ্রলোকের আসার কথা ছিল তিনি আসতে পারেননি। ডুসেল যেন সটান অফিসে চলে গিয়ে মিপের সঙ্গে দেখা করেন। এরপর কুপহুইস ট্রামে উঠে অফিসে ফিরে আসেন, আর সেই একই দিকে ডুসেল হাঁটতে থাকেন। এগারোটা কুড়িতে অফিসে এসে ডুসেল দরজায় টোকা দিলেন। মিপ্ তাঁকে কোট খুলতে সাহায্য করলেন যাতে হলদে তারার চিহ্নটা না দেখা যায়। তারপর তাঁকে খাসকামরায় নিয়ে যাওয়া হল। সেখানে ঘর পরিষ্কার করার মেয়েলোকটি থাকা অব্দি কুপহুইস এটা সেটা বলে তাঁকে ব্যস্ত রাখলেন। তারপর মিপ্ এসে, একটা কাজের জন্যে ঘরটা ছাড়তে হবে, এই রকমের ভাব দেখিয়ে ডুসেলকে ওপরে নিয়ে গেলেন। ওপরে গিয়ে মিপ্‌কে ঝোলানো আলমারিটা ঠেলে চোখের সামনে ভেতরে ঢুকে পড়তে দেখে ডুসেল একেবারে হতভম্ব।

আমরা সবাই ওপরতলায় টেবিলে গোল হয়ে বসে কফি আর কনিয়াক নিয়ে অপেক্ষা করছি, নবাগতকে অভ্যর্থনা জানাব। মিপ্ ওঁকে প্রথমে আমাদের বৈঠকখানাটা দেখালেন। উনি আমাদের আসবাবপত্র দেখেই চিনতে পারলেন এবং উনি ঘুণাক্ষরেও জানতেন না যে আমরা এখানে রয়েছি, ওঁর ঠিক মাথার ওপর। মিপ্ যখন ওঁকে খবরটা দিলেন তখন উনি

প্রায় মূর্ছা যাওয়ার উপক্রম হলেন। ভাগ্যিস্ মিপ্ ওঁকে বেশি সময় না দিয়ে সটান ওপরতলায় নিয়ে তুললেন।

ডুসেল ধপাস করে একটা চেয়ারে বসে পড়ে নির্বাক হয়ে বেশ খানিকক্ষণ আমাদের দিকে তাকিয়ে রইলেন, যেন গোড়ায় উনি নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছেন না। খানিকক্ষন পরে তোৎলাতে তোৎলাতে বললেন, 'কিন্তু...আবার, সিন্দ...তোমরা তাহলে বেলজিয়ামে নয়? ইশ্‌ট্ ডের মিলিটার নিশ্‌ট্ কাম, ডাস আউটো....তোমরা তাহলে পালাতে গিয়ে পালাতে পারোনি?'

আমরা ওঁকে সব পরিষ্কার করে বললাম সৈন্যদের আর গাড়ির গল্পটা ইচ্ছে করেই রটানো হয়েছিল যাতে লোকে, বিশেষ করে জার্মানরা আমাদের খোঁজে এলে ভুল ধারণা করে।

এতটা বুদ্ধি খাটানো হয়েছে দেখে ডুসেল আবার হাঁ হয়ে গেলেন। এরপর যখন আমাদের দারুণ বাস্তববুদ্ধির পরিচায়ক অতি সুন্দর এই ছোট্ট 'গুপ্ত মহল'টা ঘুরে ঘুরে দেখলেন, তখন অবাক হয়ে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখা ছাড়া তাঁর আর কিছু করার রইল না।

দুপুরের খাওয়া আমরা সবাই একসঙ্গে বসে খেলাম। তারপর উনি খানিকটা ঘুমিয়ে নিয়ে আমাদের সঙ্গে চা খেয়ে নিলেন। তারপর ওঁর জিনিসপত্রগুলো (মিপ্ আগেই এনে রেখেছিলেন) খানিকটা গোছগাছ করলেন। ততক্ষণে উনি এটাকে অনেকটা নিজের বাড়ি বলে মনে করতে আরম্ভ করেছেন। বিশেষ করে নিচের টাইপ করা একখানা 'গুপ্তমহলের নিয়মকানুন' (ফান ডানের করা) উনি হাতে পেলেন।

'গুপ্ত মহলের' ছক ও সহায়িকা

ইহুদী ও ঐ জাতীয় লোকদের সাময়িক বসবাসের জন্যে বিশেষ সংস্থা।

বছরের বারোমাসই খোলা থাকে। সুন্দর, শান্ত, জঙ্গলমুক্ত পরিবেশ, আমস্টার্ডামের একেবারে কেন্দ্রস্থলে। ১৩ আর ১৭ নম্বর ট্রামের রাস্তায়, গাড়িতে অথবা সাইকেলেও আসা যায়। বিশেষ ক্ষেত্রে পায়ে হেঁটেও আসা যায়, যদি জার্মানরা যানবাহনে চড়া নিষিদ্ধ করে।

থাকা খাওয়া ঃ বিনামূল্যে।

বিশেষ রকমের চর্বিমুক্ত খাবার।

সব সময় পানি পাওয়া যাবে বাথরুমে (হায়, গোসলের ব্যবস্থা নেই) এবং বিভিন্ন ভেতর বাইরের দেয়ালের গায়ে।

প্রচুর গুদামঘর আছে সব রকমের মাল রাখার জন্যে।

নিজস্ব বেতার কেন্দ্র, লন্ডন, নিউইয়র্ক, তেল্ আবিব এবং আরও বিস্তর বেতারঘাঁটির সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ। সন্ধ্যে ছ'টার পর কেবল এখানকার বসিন্দারা ব্যবহার করতে পারবেন। কোনো রেডিও স্টেশনই নিষিদ্ধ নয়, এটা ধরে নিয়ে যে কেবল বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রেই জার্মান স্টেশন শোনা যাবে, যেমন চিরায়ত সঙ্গীত ইত্যাদির জন্যে।

বিশ্রামের সময় ঃ রাত ১০টা থেকে সকাল সাড়ে ৭টা পর্যন্ত। রবিবারে সওয়া ১০টা। পরিচালকদের নির্দেশ অনুসারে, অবস্থা অনুকূল হলে, বাসিন্দারা দিনের বেলায় বিশ্রাম নিতে পারবেন। সাধারণের নিরাপত্তার জন্যে বিশ্রামের সময়কাল অক্ষরে অক্ষরে অবশ্যই মেনে চলতে হবে।

ছুটিছাটা (ঘরের বাইরে) ঃ অনির্দিষ্টকালের জন্যে স্থগিত রইল।

বাক্-ব্যবহার ঃ সমস্ত সময় নিচু গলায় কথা বলবেন, এটা আদেশ। সমস্ত সভ্য ভাষা

ব্যবহার করা যাবে, সুতরাং জার্মন ভাষা চলবে না।

অনুশীলন ঃ প্রতি সপ্তাহে একটি করে শর্টহ্যাণ্ড লেখার ক্লাস। অন্য সমস্ত সময়ে ইংরেজি, ফরাসী, গণিত এবং ইতিহাস।

ছোটোখাটো পোষা জীব–বিশেষ বিভাগ (অনুমতিপত্র লাগবে) ঃ ভালো ব্যবহার মিলবে (উকুন মশা মাছি ইত্যাদি বাদে)।

আহারের সময় ঃ রবিবার এবং ব্যাংকের ছুটির দিন বাদে রোজ সকাল ৯টায় প্রাতরাশ। রবিবার এবং ব্যাংকের ছুটির দিনগুলোতে আনুমানিক সাড়ে ১১টায়।

দুপুরের খাওয়া (খুব এলাহি নয়) ঃ সওয়া ১টা থেকে পৌনে দুটোর মধ্যে।

নৈশভোজ ঠাণ্ডা এবং/অথবা গরম ঃ কোনো বাঁধাধরা সময় নেই (বেতারে খবর বলার ওপর নির্ভর করবে)।

কর্তব্য কর্ম ঃ বাসিন্দারা সমস্ত সময় অফিসের কাজে সাহায্য করার জন্যে তৈরি থাকবেন।

গোসল ঃ রবিবার সকাল ৯টা থেকে সমস্ত বাসিন্দা পানির টব পেতে পারবেন। পায়খানা, রান্নাঘর, অফিসের খাসকামরা অথবা সদর দপ্তর, যাঁর যেটা ইচ্ছে, পেতে পারেন।

মদ্য জাতীয় পানীয় ঃ একমাত্র ডাক্তারের পরামর্শে।

সমাপ্ত

তোমার আনা।

বৃহস্পতিবার, ১৯ নভেম্বর, ১৯৪২

আদরের কিটি,

ডুসেল অতি চমৎকার মানুষ, ঠিক যেমনটি আমরা মনে মনে ভেবেছিলাম। আমার ছোট্ট ঘরটাতে ভাগযোগ করে থাকতে ওঁর কোনোই আপত্তি হয়নি।

সত্যিকথা বলতে গেলে, বাইরের একজন লোক আমার জিনিসপত্র ব্যবহার করবেন এ ব্যাপারে আমার খুব একটা আগ্রহ ছিল না। কিন্তু একটা ভালো কাজে কিছুটা আত্মত্যাগ তো করতেই হয়; সুতরাং আমি ভালো মনেই আমার এইটুকু স্বার্থ জলাঞ্জলি দেব। বাপি বলেন, আমরা যদি কাউকে বাঁচাতে পারি, তার কাছে আর সব গৌণ এবং তাঁর একথা যথার্থ।

ডুসেল যেদিন এখানে প্রথম এলেন, এসেই আমাকে, রাজ্যের প্রশ্ন করেছিলেন ঘর পরিষ্কার করার মেয়েলোকটি কখন আসে? বাথরুমটা কখন ব্যবহার করা যায়? পায়খানায় যাওয়া যেতে পারে কোন্ সময়? শুনে তোমার হাসি পাবে, কিন্তু অজ্ঞাতবাসের জায়গায় এই বিষয়গুলো অত সহজ সরল নয়। দিনের বেলায় আমাদের এমন আওয়াজ করা যাবে না যা নিচে থেকে শোনা যেতে পারে। আর যদি বাইরের কোনো লোক থাকে– যেমন ঘর পরিষ্কার করার মেয়েলোকটি– তাহলে আমাদের অতিরিক্ত সাবধান হতে হবে। আমি এ সমস্তই ডুসেলকে ভেঙে খোলসা করে বললাম। কিন্তু একটা জিনিস আমাকে অবাক করল– কথাগুলো ভদ্রলোকের মাথায় ঢুকতে বড্ড সময় লাগে। একই জিনিস তিনি দুবার করে জিজ্ঞেস করেন এবং তাও মনে রাখতে পারেন বলে মনে হয় না। হয়ত সময়ে সব ঠিক হয়ে যাবে এবং এটা হয়েছে শুধু হঠাৎ ঠাঁইবদলের জন্যে উনি সম্পূর্ণ ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেছেন বলে। নইলে আর সবাই ঠিকঠাক চলছে।

বাইরের জগৎকে আমরা হারিয়েছি আজ কম দিন হল না; ডুসেল এসে সেখানকার

সম্বন্ধে অনেক কথা বললেন। তিনি যা বললেন তাতে বোঝা গেল খবর খুবই খারাপ। অসংখ্য বন্ধুবান্ধব এবং চেনা মানুষ নিদারুণ অদৃষ্টের ফেরে পড়েছে। দিনের পর দিন সন্ধ্যে হলেই সবুজ আর পাঁশুটে মিলিটারি লরি পাশ দিয়ে টিকিয়ে টিকিয়ে যায়। প্রত্যেক সদর দরজায় এসে জার্মনরা খোঁজ করে সে-বাড়িতে কোনো ইহুদী বাস করে কিনা। থাকলে তক্ষুনি পরিবারকে পরিবার উঠিয়ে নিয়ে যাবে। কাউকে না পেলে তখন পরের বাড়িতে যাবে। গা-ঢাকা দিতে না পারলে তাদের হাত থেকে কারো পরিত্রাণ নেই। অনেক সময় তারা নামের তালিকা নিয়ে ঘোরে এবং তখনই দরজায় বেল্ টেপে যখন জানে যে বেশ বড় ঝাঁক পাওয়া যাবে। কখনও কখনও তারা নগদ টাকা নিয়ে ছেড়ে দেয়– মাথা পিছু এক কাঁড়ি করে টাকা। আগেকার কালের ক্রীতদাস-খেদায় যাওয়ার মতন। মোটেই হাসির কথা নয়; অত্যন্ত হৃদয়-বিদারক সব ব্যাপার। আমি প্রায়ই দেখতে পাই সার সার হেঁটে চলেছে ভালো, নিরীহ মানুষ; সঙ্গের ছেলেপুলেগুলো কাঁদছে; ভারপ্রাপ্ত জন দুই সেপাই তাদের মুখ-নাড়া দিচ্ছে আর মাথায় মারছে যতক্ষণ না তারা মুখ থুবড়ে পড়ে যাওয়ার মত হয়। বুড়ো, বাচ্চা, পোয়াতী, রুগ্ন, অথর্ব ছাড়াছাড়ি নেই। জনে জনে সবাইকে যেতে হবে মৃত্যুর মিছিলে।

এখানে আমরা কত ভাগ্যবান। কি রকম তোফা আরামে আছি, কোনো ঝামেলা ঝঞ্ঝাট নেই। এই সব দুঃখ কষ্ট নিয়ে আমাদের মাথাব্যথা থাকত না যদি সেইমত প্রিয়জনদের সম্বন্ধে আমরা উতলা বোধ না করতাম যাদের আমরা আজ আর সাহায্য করার অবস্থায় নেই।

যখন কিনা আমার প্রিয়তম বন্ধুদের মেরে মাটিতে ফেলে দেওয়া হচ্ছে অথবা এই শীতের রাত্রে তারা হয়ত কোনো খানাখন্দে পড়ে রয়েছে তখন উষ্ণ বিছানায় শুয়ে আমার নিজেকে অপরাধী বলে মনে হয়। আমার সেই সব ঘনিষ্ঠ বন্ধু, যাদের এখন দুনিয়ার নিষ্ঠুরতম জানোয়ারদের হাতে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে– তাদের কথা মনে হলে আমি বিভীষিকা দেখি। আর এ সবই ঘটছে তারা ইহুদী হওয়ার জন্যে।

তোমার আনা

শুক্রবার, ২০ নভেম্বর, ১৯৪২

আদরের কিটি,

এসব কি ভাবে যে গ্রহন করব সত্যিই আমরা ভেবে পাচ্ছি না। ইহুদীদের সংক্রান্ত খবর প্রকৃতপক্ষে এতদিন আমাদের কানে এসে পৌঁছায়নি, এখন আসছে। আমরা ভেবেছিলাম যত দূর সম্ভব হেসেখেলে কাটানোই ভালো। মিপ্ এসে যখন বলে ফেলেন আমাদের কোন বন্ধুর কী হয়েছে, আমার মা-মণি আর মিসেস ফান ডান থেকে থেকে কান্না জুড়ে দেন। সেই জন্যে মিপ্ আর আমাদের কানে এসব তুলবেন না ঠিক করেছেন। কিন্তু আসা মাত্র চারদিক থেকে প্রশ্নবাণ ডুসেলকে জর্জরিত করা হল। এবং তিনি যে সব কাহিনী বললেন তা এতই নৃশংস আর নিদারুণ যে শোনার পর সারাক্ষণ মনের মধ্যে খচখচ করতে থাকে।

বস্তুত এই বিভীষিকা যখন আমাদের মনের মধ্যে ফিকে হয়ে আসবে, আবার আমরা ঠাট্টামস্করা করব, আবার আমরা এ ওর পেচনে লাগব। এখন আমরা যে রকম মন-খারাপ করে রয়েছি সেইভাবে থাকলে আমাদেরও তাতে ফল ভালো হবে না, বাইরে যারা আছে তাদেরও কোনো উপকারে আমরা আসব না। আমাদের গুপ্ত মহলকে 'হতাশার গুপ্ত মহল' করে তুলে কোন্ উদ্দেশ্য চরিতার্থ হবে? আমি যাই করি না কেন, আমাকে কি অষ্টপ্রহর শুধু

ঐ ওদের কথাই ভেবে যেতে হবে? কোনো ব্যাপারে আমার হাসতে ইচ্ছে করলে কি তাড়াতাড়ি আমাকে হাসি চাপতে হবে এবং উৎফুল্ল হওয়ার জন্যে আমাকে লজ্জা পেতে হবে? তবে কি আমায় দিনভর কেঁদে যেতে হবে? না, আমি তা পারব না। তাছাড়া সময়ে এই বিবাদ ঘুচে যাবে।

এই দুঃখকষ্টের সঙ্গে এসে জুটেছে আরও একটা যা পুরোপুরি আমার ব্যক্তিগত; যে মন-মরা অবস্থার কথা এখুনি তোমাকে বললাম তার পাশে আমার দুঃখটা কিছুই নয়। তবু তোমাকে না বলে পারছি না যে, ইদানীং আমার কেন যেন মনে হচ্ছে সবাই আমাকে ত্যাগ করেছে। আমার চারপাশে যেন এক দুস্তর শূন্যতা। আগে কখনও আমার এরকম অনুভূতি হত না। আমার হাসি-খেলা, আমার মজা আনন্দ আর আমার মেয়ে বন্ধুরা– এই সবই আমার ভাবনা সম্পূর্ণ ভাবে জুড়ে রাখত। এখন আমি হয় দুঃখের জিনিসগুলো নিয়ে কিংবা নিজের কথা ভাবি। বাবা আমার খুব প্রিয় হলেও, শেষ অব্দি এখন আমি আবিষ্কার করেছি যে, আমার বাপি এখনও আমার ফেলে আসা দিনগুলোর যে ছোট্ট জগৎ তার পুরোটা জুড়ে বসতে পারেন না। কিন্তু এইসব আজেবাজে ব্যাপার নিয়ে তোমাকে জ্বালানোর কোনো মানে হয়? কিটি, আমি খুবই অকৃতজ্ঞ; আমি তা জানি। কিন্তু আমার ওপর যদি বেশি লাফাই-ঝাঁপাই হয় তাহলে অনেক সময় আমার মাথার মধ্যে ভোঁ ভোঁ করতে থাকে এবং তার ওপর আবার যদি অতসব দুঃখকষ্টের কথা ভাবতে হয় তাহলেই তো গিয়েছি।

তোমার আনা

শনিবার, ২৮ নভেম্বর, ১৯৪২

আদরের কিটি,

আমরা আমাদের বরাদ্দের চেয়ে অনেক বেশি বিজলি খরচ করে ফেলেছি। ফলত, যতদূর সম্ভব খরচ বাঁচানো এবং ইলেক্‌ট্রিক কেটে দেওয়ার আশঙ্কা। পনেরো দিন বিনা আলোয়; অবস্থাটা ভাবতে পারো? তবে কে জানে, শেষ পর্যন্ত হয়ত সেটা ঘটবে না! আমরা যত রকমের খামখেয়ালি করে সময় কাটাচ্ছি। বাঁধা জিজ্ঞেস করা, অন্ধকারে ব্যায়াম-চর্চা, ইংরেজিতে ফরাসীতে কথা বলা, বইয়ের সমালোচনা করা। কিন্তু শেষমেশ এ সবই কেমন যেন ভোঁতা হয়ে যায়। কাল সন্ধ্যেবেলায় আমি একটা নতুন জিনিস আবিষ্কার করেছি; একজোড়া জোরালো দূরবীনের কাঁচের ভেতর দিয়ে পেছনের বাড়িগুলোর আলো-জ্বালা ঘরগুলোতে উঁকি দিয়ে দেখা! দিনের বেলায় আমাদের পর্দায় একচুল ফাঁক হতে আমরা দিই না, কিন্তু রাতের বেলায় সেটা হলে কোনো ভয় নেই। পাড়াপড়শিরা যে এত মজার মানুষ হয় এর আগে আমি জানতাম না। সে যাই হোক, আমাদের প্রতিবেশীরা তাই। আমি দেখতে পেলাম এক ঘরে স্বামী-স্ত্রী খেতে বসেছে; একটি বাড়ির লোকজনেরা ঘরে সিনেমা দেখার সরঞ্জাম সাজাচ্ছে। উল্টো দিকের বাড়িতে একজন দাঁতের ডাক্তার এক বুড়ি মহিলাকে দেখছেন, তিনি তো ভয়ে কাঠ।

সব সময়ে বলা হত যে, মিস্টার ডুসেল নাকি ছেলেপুলেদের সঙ্গে খুব মিশতে পারেন এবং তাদের সবাইকে তিনি ভালবাসেন। এখন তাঁর আসল রূপ ধরা পড়ে গেছে, উনি এক রসকষহীন, সেকেলে নিয়মনিষ্ঠ লোক এবং আদবকায়দার ব্যাপারে লম্বা-চওড়া বুকনি ঝাড়তে ওস্তাদ।

আমি যেহেতু আমার শোবার ঘর– হায় রে, ছোট্ট একটু– শ্রীমৎ মহাপ্রভুর সঙ্গে

ভাগযোগ করে থাকার অমূল্য সৌভাগ্যের (!) অধিকারী এবং তিনজন কমবয়সীর মধ্যে সবাই যেহেতু আমাকেই সবচেয়ে বে-আদব বলে গণ্য করে, সেইহেতু আমাকে প্রচুর ভুগতে হয় এবং একঘেয়ে বস্তাপচা বাক্যযন্ত্রণা থেকে বাঁচার জন্যে আমাকে কালা সাজতে হয়। এ সবও সয়ে যেত, ভদ্রলোক যদি ভীষণ কুচুটে প্রকৃতির না হতেন এবং অন্য সবাই থাকতে সব সময় মা-মণির কানে গুজুর-গুজুর ফুসুর-ফুসুর না করতেন। একচোট ওঁর কাছ থেকে হুড়ো খাওয়ার পর নতুন পালা শুরু হয় মা-মণির কাছ থেকে, সুতরাং আগুপিছু দুদিক থেকেই আমাকে ঝাড় খেতে হয়। তারপর আমার কপাল যদি ভালো হয়, তাহলে মিসেস ফান ডানের কাছে আমার ডাক পড়ে জবাবদিহি করার জন্যে এবং তখন একেবারে তুফান বয়ে যায়।

সত্যি বলছি, পালিয়ে-থাকা অতিরিক্ত খুঁত-কাড়া একটি পরিবারের 'মানুষ-না-হয়ে ওঠা' চোখের-কাঁটা হওয়াটা ভেবো না সহজ ব্যাপার। রাত্তিরে যখন বিছানায় শুয়ে শুয়ে আমার ওপর আরোপ-করা রাজ্যের অপরাধ আর দোষত্রুটির কথা মনে মনে ভাবি, আমার কেমন যেন সব গোলমাল হয়ে যায়, হয় আমি হাসি নয় কাঁদি; কখন কি রকম মেজাজ তার ওপর সেটা নির্ভর করে।

আমি যেমন তা থেকে অথবা আমি যা হতে চাই তা থেকে ভিন্ন কিছু হওয়ার একটা ভোঁতা চাপা বাসনা নিয়ে তারপর আমি ঘুমিয়ে পড়ি; আমি যেভাবে চলতে চাই কিংবা আমি যে ভাবে আচরণ করি হয়ত তার থেকে ভিন্ন কোনো আচরণ। হা ভগবান, এবার তোমাকেও আমি গুলিয়ে দিচ্ছি। মাপ করো, লিখে ফেলে সেটাকে আমি কাটতে চাই না এবং কাগজের এই অভাবের দিনে আমি কাগজ ফেলে দিতে পারব না। সুতরাং তোমাকে আমি শুধু এই পরামর্শই দিতে পারি যে, শেষের বাক্যটা তুমি যেন ফিরে পড়ো না, এবং কোনোক্রমেই ওর অর্থোদ্ধারের চেষ্টা করো না, কেন না চেষ্টা করেও তুমি তা পারবে না।

তোমার আনা

সোমবার, ৭ ডিসেম্বর, ১৯৪২

আদরের কিটি

চানুকা আর সেণ্ট নিকোলাস এ বছর প্রায় একই সময়ে পড়েছে– মাত্র একদিন আগে পরে। চানুকা নিয়ে আমরা কোনো হৈচৈ করিনি। আমরা শুধু পরস্পরকে দিয়েছি টুকিটাকি উপহার এবং সেই সঙ্গে মোমবাতি জ্বালানো। মোমবাতির অভাবের জন্যে আমরা শুধু দশ মিনিটের জন্যে বাতিগুলো জ্বেলে রেখেছিলাম। গান থাকলে ওতে কিছু যায় আসে না। মিস্টার ফান ডান একটা কাঠের বাতিদান বানিয়েছেন, সুতরাং সবদিক থেকে তাতেও সুব্যবস্থা হয়েছে।

শনিবার, সেণ্ট নিকোলাস দিবসের সন্ধ্যেটা অনেক বেশি মজাদার হয়েছিল। মিপ্ আর এলিকে সব সময়ে বাপির কানে কানে ফিসফিস করে বলতে দেখে আমাদের খুব কৌতূহলের উদ্রেক হয়েছিল, স্বভাবতই আমরা আন্দাজ করেছিলাম কিছু একটা জিনিস আছে।

হ্যাঁ, যা ভেবেছিলাম তাই। রাত আটটার সময় কাঠের সিঁড়ি বেয়ে সার বেঁধে নেমে ঘুটঘুটে অন্ধকারে গলির ভেতর দিয়ে এসে (আমার গা-ছমছম করছিল এবং মনে মনে চাইছিলাম যেন নিরাপদে ওপরতলায় ফিরে যেতে পারি) ছোট্ট ঘুপচি ঘরটাতে জমা হলাম। কোনো জানালা না থাকায় সেখানে আমরা আলো জ্বালাতে পারি। আলো জ্বলে উঠতে বাপি বড় আলমারির ঢাকনাটা খুলে দিলেন। 'ওঃ, কী সুন্দর' বলে সবাই চেঁচিয়ে উঠল। এক

কোণে সেন্ট নিকালাসের কাগজে সাজানো একটা বড় বেতের ঝুড়ি আর তার ওপর ছিল কৃষ্ণ-পেটারের একটা মুখোশ।

তাড়াতাড়ি ঝুড়িটা নিয়ে আমরা ওপরে চলে গেলাম। তাতে ছিল প্রত্যেকের জন্যে একটা করে সুন্দর ছোট্ট উপহার, তাতে গাঁথা একটা করে লাগসই কবিতা। আমি পেলাম একটা ডল পুতুল, তার স্কার্টটা হল টুকরো-টাকরা জিনিস রাখার থলি। বাবা পেলেন বই রাখার ধরুনি এবং ইত্যাকার সব জিনিস। যাই হোক, মাথা থেকে ভালো জিনিস বেরিয়েছিল। যেহেতু আমরা কেউই সেন্ট নিকোলাসের দিন আগে কখনও পালন করিনি, আমাদের হাতেখড়িটা ভালোই হল।

তোমার আনা

বৃহস্পতিবার, ১০ ডিসেম্বর, ১৯৪২

আদরের কিটি,

মিস্টার ফান ডান আগে ছিলেন মাংস, সসেজ আর মশলার কারবারে। এই পেশা ওঁর জানা ছিল বলে ওঁকে বাবার ব্যবসায় নিয়ে নেওয়া হয়। এখন উনি ওঁর সসেজগত দিকের পরিচয় দিচ্ছেন, যেটা আমাদের পক্ষে মোটেই অপ্রীতিকর নয়।

দুর্দিনে পড়তে হতে পারে এই ভেবে আমরা প্রচুর মাংস কিনে রাখার ব্যবস্থা করেছিলাম (অবশ্যই ঘুষ দিয়ে)। দেখতে বেশ মজা লাগে, প্রথমে কিভাবে মাংসের টুকরোগুলো কিমা করার যন্ত্রের ভেতর দিয়ে দুবারে বা তিনবারে যায়, তারপর কিভাবে সঙ্গের মালমশলাগুলো কিমায় মেশানো হয়, এবং তারপর সসেজ তৈরির জন্যে নাড়িভুঁড়ির ভেতর কিভাবে নল দিয়ে তা ভর্তি করা হয়। সসেজের মাংস ভেজে নিয়ে সেদিন রাতে আমরা বাঁধাকপির চাটনির সঙ্গে টাকনা দিয়ে খেলাম, কেননা গোল্ডারল্যাণ্ড সসেজ খেতে হলে আগে খটখটে শুক্‌নো করে নিতে হয়। সেই কারণে মট্‌কার সঙ্গে সুতো দিয়ে লাঠি বেঁধে তাতে সসেজগুলো আমরা টাঙিয়ে দিলাম। ঘরে ঢুকতে গিয়ে এক ঝলক সার-বাঁধা সসেজ ঝুলে থাকতে দেখে প্রত্যেকেই হেসে কুটোপাটি হচ্ছিল। সেগুলো সাংঘাতিক মজাদার দেখাচ্ছিল।

ঘরের মধ্যে সে এক দক্ষযজ্ঞ ব্যাপার। মিস্টার ফান ডান তাঁর বপুতে (তাঁকে দেখাচ্ছিল আরও বেশি মোটা) তাঁর স্ত্রীর একটা অ্যাপ্রন চড়িয়ে মাংস কুটতে ব্যস্ত। রক্তমাখা দুটো হাত, লাল মুখ আর নোংরা আপ্রনে তাঁকে ঠিক কশাইয়ের মত দেখাচ্ছিল। মিসেস ফান ডান একসঙ্গে সব কাজ সারতে চাইছিলেন, একটা বই পড়ে পড়ে ডাচ ভাষা শেখা, সুপের মধ্যে খুন্তি নাড়া, মাংস কিভাবে বানানো হচ্ছে তা দেখা, দীর্ঘশ্বাস ফেলা এবং তাঁর পাঁজরে চোট লাগা নিয়ে নাকে কাঁদা। যেসব বুড়ি ভদ্রমহিলারা (!) চ্যাটালো পাছা কমাবার জন্যে ঐসব বোকামিপূর্ণ শরীরচর্চা করেন তাঁদের ঐ রকমই দশা হয়।

ডুসেলের একটা চোখ ফুলেছে। আগুনের পাশে বসে ক্যামোমিল ফোটানো পানি দিয়ে উনি চোখে সেঁক দিচ্ছেন। জানালা গলে আসা একফালি রোদ্দুরে চেয়ার টেনে নিয়ে বসা পিম্‌কে অনবরত এদিক-ওদিক করতে হচ্ছিল। তাছাড়া আমার ধারণা ওর বাতের ব্যাথাটা চাড়া দিয়ে উঠেছিল। কেননা মুখে একটা কাতর ভাব নিয়ে উনি পুঁটুলি পাকিয়ে বসে মিস্টার ফান ডানের কাজ করা দেখছিলেন। তাঁকে দেখাচ্ছিল ঠিক বৃদ্ধাশ্রমে থাকা একজন কুঁকড়ে-যাওয়া বুড়োর মত। পেটার তার বেড়ালটা নিয়ে ঘরময় খেলার কসরত করে বেড়াচ্ছিল। মা-মণি, মারগট আর আমি আলুর খোসা ছাড়াচ্ছিলাম। মিস্টার ফান ডানের দিকে নজর পড়ে

থাকায় আমরা সকলে অবশ্য অনেক ভুলভাল করে ফেলছিলাম।

ডুসেল তাঁর দাঁতের ডাক্তারি শুরু করেছেন। মজার ব্যাপার বলে আমি তাঁর প্রথম রুগীটির বিষয়ে বলব। মা-মণি ইস্ত্রি করছিলেন এবং মিসেস ফান ডানকেই প্রথম অগ্নিপরীক্ষার মুখে পড়তে হয়। ঘরের মাঝখানে রাখা একটা চেয়ারে গিয়ে উনি তো বসলেন। ডুসেল বেজায় গম্ভীর মুখ করে তাঁর ব্যাগ খুলে জিনিসপত্র বের করতে লাগলেন। বীজাণুনাশক হিসেবে খানিকটা ওডিকোলন আর মোমের বদলে ভেজলিন চেয়ে নিলেন।

মিসেস ফন ডানের মুখের ভেতর তাকিয়ে উনি দুটো দাঁত পেলেন যা ছোঁয়া মাত্র মিসেস ফান ডান এমন কুঁকড়ে-মুকড়ে গেলেন যেন এখুনি অজ্ঞান হয়ে যাবেন আর সেই সঙ্গে ব্যথায় আবোলতাবোল আওয়াজ করতে থাকলেন। লম্বা পরীক্ষার পর (মিসেস ফান ডানের ক্ষেত্রে, বাস্তবে কিন্তু দুই মিনিটের বেশি সময় লাগেনি) ডুসেল একটি গর্ত খুঁড়তে শুরু করে দিলেন। কিন্তু করবে কার বাপের বাধ্যি– রোগিণী এমন ভাবে ডানে-বামে হাত পা ছুঁড়তে শুরু করে দিলেন যে– একটা পর্যায়ে গিয়ে ডুসেলকে তাঁর হাতের কুরুনি ছেড়ে দিতে হল– সেটা বিঁধে রইল মিসেস ফান ডানের দাঁতে।

তারপর আগুনে সত্যিকার ঘৃতাহুতি পড়ল। ভদ্রমহিলা চেঁচাতে লাগলেন (অমন একটা যন্ত্র মুখে নিয়ে যতটা চেঁচানো যায়), হাত দিয়ে যন্ত্রটা মুখ থেকে টেনে বের করতে চেষ্টা করলেন। তাতে হিতে বিপরীত হল। আরও সেটা ঢুকে বসে গেল। মিস্টার ডুসেল তাঁর হাত দুটো দুই পাশে সেঁটে চুপচাপ থেকে প্রহসনটুকু দেখতে লাগলেন। বাকি দর্শকের দল আর থাকতে না পেরে হাসিতে ফেটে পড়ল। কাজটা খারাপ করেছি, কেননা নিজের কথা বলতে পারি, আমার উচিত ছিল আরও জোরসে হেসে ওঠা। অনেকবার এপাশ ওপাশ করে, পা ছুঁড়ে, চেঁচামেচি করে এবং বাঁচাও বাঁচাও বলে শেষ অবধি যন্ত্রটা উনি টেনেটুনে বের করলেন এবং যেন কিছুই হয়নি এমনিভাব করে তাঁর কাজ চালিয়ে গেলেন।

জিনিসটা উনি এমন চটপট করে ফেললেন যে মিসেস ফান ডান কোনো নতুন ফিকির করার আর সুযোগ পেলেন না। তবে ডুসেল তাঁর জীবনে কখনও এতটা পরের সাহায্য পাননি। দুজন সাকরেদ তাঁর খুব কাজে লেগেছিল। ফান ডান আর আমি আমাদের কর্তব্যকর্ম ভালোভাবেই সম্পন্ন করেছিলাম। 'কর্মরত একজন হাতুড়ে'– এই নামের মধ্যযুগের কোনো ছবির মত দৃশ্যটা দেখাচ্ছিল। ইতিমধ্যে অবশ্য রোগিণীটি ধৈর্য হারিয়ে ফেলেছিলেন; 'তাঁর' সুপ আর 'তাঁর' খাবারে তাঁকে নজর রাখতে হবে। একটা বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। ভবিষ্যতে আর কখনও ডাক্তারের হাতে নিজেকে সঁপে দেবার মতন এমন তাড়া তাঁর কদাচ থাকবে না।

তোমার আনা।

রবিবার, ১৩ ডিসেম্বর, ১৯৪২

আদরের কিটি,

সদর দপ্তরে আরামে বসে পর্দার ফাঁকটুকু দিয়ে বাইরেটা দেখছি। পড়ন্ত বেলা, তবু তোমাকে লেখার মত আলো এখনও রয়েছে।

লোকে রাস্তা দিয়ে হেঁটে চলেছে, এ এক ভারি অদ্ভুত দৃশ্য; সবাইকে দেখে মনে হচ্ছে যেন পেছনে ষাঁড়ে তাড়া করেছে এবং এখুনি সবাই হোঁচট খেয়ে পড়বে। সাইকেল চালিয়ে এখন যারা যাচ্ছে, তাদের সঙ্গে তাল রেখে চলা অসম্ভব। আমি এমন কি দেখতেও পাচ্ছি না

সাইকেল চড়ে যে যাচ্ছে সে কে।

এ পাড়ার লোকজনদের দিকে খুব একটা তাকাতে ইচ্ছে করে না। বিশেষ করে বাচ্চার দল এত নোংরা হয়ে থাকে যে তাদের ছুঁতে ঘেন্না হয়। নাক দিয়ে পোঁটা গড়ানো একেবারে বস্তির বাচ্চা। ওদের একটা কথাও আমি শুনলে বুঝব না।

কাল আমি আর মারগট এখানে গোসল করার সময় আমি বলেছিলাম, 'হেঁটে যাচ্ছে যে বাচ্চারা, ধর্, আমরা যদি ওদের এক-একটাকে একটা মাছ ধরার ছিপ দিয়ে টেনে তুলে প্রত্যেককে গোসল করিয়ে দিই, ওদের কাপড়চোপড় কেচে দিই, ফুটোফাটা সেলাই করে দিই, এবং তারপর আবার ওদের ছেড়ে দিই, তাহলে...।' মারগট আমাকে শেষ করতে না দিয়ে বলে উঠল, 'কালই আবার দেখবি ওরা আগের মতই যে-কে সেই নোংরা এবং গায়ে শতছিন্ন কাপড়-জামা।'

আমি কী আজে-বাজে বকছি। এসব বাদেও দেখার অনেক কিছু আছে– মোটরগাড়ি, নৌকো আর বৃষ্টি। আমার বিশেষ করে পছন্দ চলন্ত ট্রামের ক্যাঁচর-ক্যাঁচর আওয়াজ।

আমাদের যেমন কোনো বৈচিত্র্য নেই, আমাদের ভাবনাচিন্তারও সেই একই দশা। ঘুরে ঘুরে ক্রমাগত সেই একই জায়গায় আমরা এসে হাজির হই– সেই ইহুদী থেকে খাবার জিনিসে আর খাবার জিনিস থেকে রাজনীতিতে। হ্যাঁ, ভালো কথা, ইহুদী বলতে মনে পড়ল, কাল আমি পর্দার ফাঁক দিয়ে দুজন ইহুদীকে দেখেছি। দেখে আমার নিজের চোখকে বিশ্বাস হচ্ছিল না; কী বিশ্রী যে লাগছিল, আমি যেন তাদের বিপদে ফেলে পালিয়ে এখন তাদের দুর্দশা দেখছি। ঠিক উল্টোদিকে আছে একটা বজরা; সেখানে সপরিবারে থাকে একজন মাঝি। তার একটা ঘেউ-ঘেউ করা ছোট কুকুর আছে। যখন সে পাটাতনের ওপর ছুটোছুটি করে তখন ছোট কুকুরটাকে আমরা চিনতে পারি শুধু ওর ডাক শুনে আর ল্যাজ দেখে। এহ্, শুরু হল বৃষ্টি, এখন বেশির ভাগ লোক গা-ঢাকা দিয়েছে ছাতার তলায়। চোখে পড়ছে শুধু বর্ষাতি আর মাঝে মাঝে কারো কারো টুপির পেছনটা। সত্যি এখন আর বেশি দেখার আমার দরকার নেই। ক্রমশ এক নজরেই সব মেয়ে আমার জানা হয়ে যাচ্ছে, আলু খেয়ে খেয়ে মোটা ধুম্‌সী, গায়ে লাল কিংবা সবুজ কোট, জুতোর হিল ক্ষয়ে-যাওয়া এবং একটা করে ব্যাগ বগলদাবা করা। তাদের মুখগুলো দেখে হয় করুণ নয় দয়ালু বলে মনে হয়– সেটা নির্ভর করে স্বামীদের ভাবসাবের ওপর।

তোমার আনা।

মঙ্গলবার, ২২ ডিসেম্বর, ১৯৪২

আদরের কিটি,

'গুপ্তমহল' এই আনন্দ-সংবাদ শুনেছে যে, বড়দিন উপলক্ষে প্রত্যেকে বাড়তি সিকি পাউণ্ড করে মাখন পাবে। খবরের কাগজে বলেছে আধ পাউণ্ড, তবে সে তো সেইসব ভাগ্যবান মর্ত্যের জীবদের জন্যে যারা সরকারী রেশন-খাতার অধিকারী। পালিয়ে-থাকা ইহুদীদের জন্যে নয়– আটের বদলে মাত্র চারটি বেআইনী শেনখাতা কেনা তাদের সাধ্যায়ত্ত।

আমরা সবাই আমাদের মাখন দিয়ে কেকবিস্কুট কিছু বানাব। আজ সকালে আমি কয়েকটা বিস্কুট আর দুটো কেক তৈরি করেছিলাম। ওপরতলায় সবাই খুব ব্যস্ত। মা-মণি বলেছেন গেরস্থালির কাজকর্ম শেষ না করে আমি যেন সেখানে কাজ করতে বা পড়াশুনো

করাতে না যাই। মিসেস ফান ডান তাঁর চোট-লাগা পাঁজরের দরুন শয্যাশায়ী, দিনভর তাঁর নাকী কান্না, সারাক্ষণ নতুন ড্রেসিং করাতে দিতে তাঁর আপত্তি নেই, এবং কোনো কিছুতেই তাঁর মন ওঠে না। উনি আবার নিজের পায়ে দাঁড়ালে এবং নিজেরটা নিজে গুছিয়ে নিতে পারলে আমি খুশি হব। কেননা তাঁর পক্ষ নিয়ে এটা আমাকে বলতেই হবে– তিনি অসাধারণ পরিশ্রমী এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, বরাবর দেহে মনে সুস্থ। সেই সঙ্গে সদা প্রফুল্ল।

দিনের বেলায় যেন বেশি আওয়াজ করার জন্যে আমাকে যথেষ্ট 'চুপ চুপ' শুনতে হয় না– আমার শয়নকক্ষের সঙ্গী ভদ্রলোক রাত্তিরেও এখন আমাকে বার বার ডেকে বলেন, 'চুপ চুপ।' তাঁর কথা শুনে চললে, আমার তো পাশ ফেরাও বারণ। আমি ওঁকে আদৌ পাত্তা দিতে রাজী নই। এর পরের বার কিছু বলতে এলে উল্টে আমিই ওঁকে 'চুপ, চুপ' বলব।

ওঁর ওপর আমি তেলেবেগুনে জ্বলে উঠি, বিশেষ করে রবিবারগুলোতে, সাতসকালে উঠে ব্যায়াম করার জন্যে উনি আলো জ্বালিয়ে দেন। মনে হয় স্রেফ ঘণ্টার পর ঘণ্টা উনি চালিয়ে যান, আর ওঁর জ্বালায় আমি বেচারা, আমার শিয়রে জোড়া-দেওয়া চেয়ারগুলো, ঘুম-ঘুম চোখে আমার মনে হয়, যেন অনবরত সামনে আর পেছনে সরতে নড়তে থাকে। পেশীগুলো আলগা করার জন্যে বার দুয়েক প্রচণ্ড জোরে হাত ঘুরিয়ে ব্যায়ামের পর্ব শেষ করে শ্রীমৎ মহাপ্রভু শুরু করেন ওঁর প্রাতঃকৃত্য। তাঁর প্যান্টগুলো ঝোলানো থাকে, সুতরাং সেগুলো যোগাড় করে আনতে ওঁকে এখান থেকে সেখানে যেতে আসতে হয়। কিন্তু টেবিলে পড়ে থাকা টাইয়ের কথা ওঁর মনে থাকে না। সুতরাং ফের সেটা আনতে চেয়ারগুলোতে তিনি ধাক্কা মারেন এবং হোঁচট খান।

থাক, আমি আর বুড়ো লোকদের বিষয়ে এর বেশি বলে তোমার ধৈর্যচ্যুতি ঘটাব না। এতে অবস্থার কোনো উন্নতি হবে না এবং আমার শোধ তোলবার সমস্ত মতলব (যেমন ল্যাম্প ডিস্‌কানেক্ট করা, দরজায় খিল দেওয়া, ভদ্রলোকের জামা-কাপড় গায়েব করা) ত্যাগ করতে হবে শান্তি বজায় রাখার জন্যে। ইস্‌, আমি কিরকম বিচক্ষণ হয়ে উঠছি! এখানে সর্ব বিষয়ে একজনকে তার বিচারশক্তি প্রয়োগ করতে হবে, মান্য করতে শিখতে হবে, মুখ বুঁজে থাকতে হবে, ভালো হতে হবে গোঁয়ার্তুমি ছাড়তে হবে এবং আমার জানা নেই আরও কত কী। আমার ভয় হচ্ছে, খুব কম সময়ের মধ্যে আমাকে আমার পুরো বুদ্ধি খরচ করে ফেলতে হবে এবং আমার বুদ্ধির পরিমাণ খুব বেশি নয়। যুদ্ধ যখন শেষ হবে, তখন আর ঘটে কিছু থাকবে না।

তোমার আনা

বুধবার, ১৩ জানুয়ারী, ১৯৪৩

আদরের কিটি,

আজ সকালে আবার সবকিছু আমাকে এলোমেলো করে দিয়েছে। ফলে, একটা জিনিসও আমি ঠিকমত করে উঠতে পারিনি।

বাইরেটা সাংঘাতিক। দিনরাত ওরা আরও বেশি করে ঐ সব অসহায় দুঃখী মানুষগুলোকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাচ্ছে। পিঠে একটা বোঁচকা আর পকেটে সামান্য টাকা ছাড়া ওদের নিজের বলতে আর কিছু থাকছে না। পথে সেটুকুও ছিনিয়ে নেওয়া হচ্ছে। সংসারগুলো ছিটিয়ে গিয়ে স্ত্রী-পুরুষ ছেলেমেয়েরা সব পরস্পরের কাছ থেকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। ইস্কুল থেকে ছেলেমেয়েরা বাড়ি ফিরে দেখছে মা-বাবা নিখোঁজ। মেয়েরা বাজার

করে বাড়ি ফিরে দেখছে দরজায় তালা ঝোলানো, পরিবারের লোকজনেরা হাওয়া হয়ে গেছে। যারা জাতে ওলন্দাজ, তারাও খুব চিন্তাগ্রস্ত। তাদের ছেলেদের ধরে ধরে জার্মানিতে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে। সকলেরই মনে ভয়।

প্রত্যেকদিন রাত্রে শ'য়ে শ'য়ে প্লেন। হল্যাণ্ডের ওপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে জার্মান শহরগুলোতে। সেখানে বোমায় বোমায় মাটি চষে ফেলা হচ্ছে। রুশদেশে আর আফ্রিকায় প্রতি ঘন্টায় শ'য়ে শ'য়ে হাজারের হাজারে মানুষ খুন হচ্ছে। কেউই এর বাইরে থাকতে পারছে না, লড়াই সারা বিশ্ব জুড়ে। যদিও তুলনায় মিত্রপক্ষ এখন ভালো অবস্থায়, তাহলেও কবে যুদ্ধ শেষ হবে বলা যাচ্ছে না।

আমাদের কথা ধরলে, আমরা ভাগ্যবান। নিশ্চয় লক্ষ লক্ষ লোকের চেয়ে আমাদের ভাগ্য ভালো। এখানে নির্ঝঞ্ঝাটে, নিরাপদে আছি। বলতে গেলে, আমরা রাজধানীতে বাস করছি। এমন কি আমরা এতটা স্বার্থপর যে কথায় কথায় বলি, 'যুদ্ধের পর', নতুন জামা নতুন কাপড়ের কথা ভেবে আমরা উৎফুল্ল হই– অথচ আমাদের সত্যিকার প্রত্যেকটা পাইপয়সা বাঁচানো উচিত, অন্য মানুষজনদের সাহায্য করা উচিত এবং যুদ্ধের পর ধ্বংস হয়েও যেটুকু অবশিষ্ট থাকবে সেটুকু রক্ষা করা উচিত।

বাচ্চারা এখানে ছুটোছুটি করে, গায়ে শুধুমাত্র এটা পাতলা পিরান আর শিক্‌লি পরে; না আছে কোট, না আছে টুপি, না আছে মোজা। কেউ তাদের দিকে সাহায্যের হাত বাড়ায় না। সব সময় তাদের পেটগুলো পড়ে থাকে, কবেকার শুক্‌নো একটা গাজর দাঁতে কাটতে কাটতে তারা ক্ষিধের ভোঁচকানি ঠেকিয়ে রাখে। কনকনে ঠাণ্ডা ঘরগুলো থেকে বেরিয়ে তারা যায় কনকনে ঠাণ্ডা রাস্তায়; যখন ইস্কুলে ইস্কুলঘর তার চেয়েও ঠাণ্ডা। দেখ, হল্যাণ্ডের হাল এখন এত খারাপ যে, অসংখ্য ছেলেপুলে রাস্তার লোকদের ধরে এক টুকরো রুটির জন্যে হাত পাতে। যুদ্ধের দরুন মানুষের যাবতীয় দুঃখযন্ত্রণার ওপর আমি ঘণ্টার পর ঘণ্টা বলে যেতে পারি। কিন্তু তাতে নিজেকে আমি আরও ম্রিয়মাণ করে তুলব। যতদিন দুঃখের শেষ না হয়, ততদিন যথাসম্ভব শান্তচিত্তে অপেক্ষা করা ছাড়া আমাদের আর কিছু করার নেই। ইহুদীরা আর খ্রিষ্টানরা অপেক্ষা করছে, অপেক্ষা করছে সারা জগৎ; সেইসঙ্গে বেশ কিছু লোক মৃত্যুর জন্যে দিন গুনছে।

তোমার আনা

শনিবার, ৩০ জানুয়ারি, ১৯৪৩

আদরের কিটি,

রাগে টগবগ করে ফুটছি, কিন্তু বাইরে প্রকাশ করব না। ইচ্ছে হচ্ছে পা দাবিয়ে চিৎকার করি, মা-মণিকে আচ্ছা করে ঝাঁকিয়ে দিই, কান্নায় ফেটে পড়ি, এবং আর কী করব জানি না– কারণ, প্রতিদিন আমার দিকে ছুঁড়ে দেওয়া হয় যত সব অকথা-কুকথা, বাঁকা বাঁকা চোখের দৃষ্টি এবং যত রাজ্যের নালিশ, এবং টান করে বাঁধা জ্যা-মুক্ত শরের মত সেগুলো যথাস্থানে লাগে এবং শরীরে বেঁধার মতই সেগুলো তুলে ফেলা আমার পক্ষে কঠিন হয়।

আমি মারগটকে, ফান ডানকে, ডুসেলকে এবং বাবাকেও চিৎকার করে বলতে চাই– 'আমাকে তোমরা ছেড়ে দাও, আমি যাতে চোখের পানিতে আমার বালিশ না ভিজিয়ে, চোখের জ্বলুনি ছাড়া, মাথা দবদবানি বাদ দিয়ে অন্তত একটি রাত ঘুমোতে পারি। আমাকে নিষ্কৃতি দাও এই সব-কিছু থেকে, এই পৃথিবী থেকে হলে সেও বরং ভালো।' কিন্তু আমার

তা করা চলবে না; ওরা যেন জানতে না পারে যে, আমি হাল ছেড়ে দিয়েছি; ওদের তৈরি ক্ষতগুলো ওরা যেন দেখতে না পায়, ওদের সমবেদনা আর দয়ালু চিত্তের পরিহাসগুলো আমার সহ্য হবে না, বরং তাতে আমার আরও ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে করবে। আমি কথা বললে সবাই মনে করে আমি চালিয়াতি করছি; চুপ করে থাকলে ওরা মনে করে আমি উদ্ভট। জবাব করলে বলে অভদ্র, ভালো কিছু মাথায় এলে বলে ধূর্ত, ক্লান্ত হয়ে পড়লে বলে আলসে, একগ্রাস বেশি খেলে বলে স্বার্থপর; বলে বোকা, ভীতু, সেয়ানা ইত্যাদি, ইত্যাদি। দিনভর কেবল আমাকে শুনতে হয় আমি নাকি অসহ্য খুকী; অবশ্য আমি এসব নিয়ে হাসি এবং এমন ভাব দেখাই যেন ওসব বললে আমার কিছু হয় না, কিন্তু আলবৎ হয়। সৃষ্টিকর্তার কাছে আমার চেয়ে নিতে ইচ্ছে করে, আলাদা ধরনের প্রকৃতি, যাতে লোকে আমার প্রতি বিমুখ না হয়। কিন্তু তা সম্ভব নয়। আমার যে স্বভাব সেটা আমাকে দেওয়া হয়েছে, নিশ্চয়ই তা খারাপ হতে পারে না। আমি প্রাণপণে সকলের মন রেখে চলতে চেষ্টা করি, সেটা যে কত বেশি ওরা তা ধারণাও করতে পারবে না। আমি এসব হেসে উড়িয়ে দিতে চেষ্টা করি, কেননা আমি দুঃখ পাচ্ছি এটা ওদের দেখাতে চাই না। একাধিকবার হয়েছে, অন্যায় ভাবে একগাদা বকুনি খাওয়ার পর আমি চটে গিয়ে মা-মণিকে বলেছি, 'তুমি কি বলো না বলো আমি থোড়াই কেয়ার করি। আমাকে ছাড়ান দাও; যে যাই করো, আমার কিছু হওয়ার নয়।' স্বভবতই তখন আমাকে বলা হল আমি অসভ্য এবং কার্যত দুদিন ধরে আমাকে দেখেও হল না; এবং তারপর হঠাৎ এক সময়ে বিলকুল ভুলে গিয়ে আমার সঙ্গে অন্য পাঁচজনের মতই ব্যবহার করা হতে লাগল। আজ মুখ মিষ্টি করে, ঠিক পরের দিনই আবার দাঁতের বিষ ঝেড়ে দেওয়া– এ জিনিস আমার পক্ষে অসম্ভব। আমি বরং বেছে নেব হিরণ্ময় মধ্যপন্থা (অবশ্য সেটা খুব হিরণ্ময় নয়), চুপচাপ নিজের মনে থাকব, এবং ওরা আমার প্রতি যা করে, সেই রকম ওদের দেখাদেখি জীবনে অন্তত একবার আমিও ওদের প্রতি নাক সিটকে থাকব। ইস্, যদি তা পারতাম!

তোমার আনা।

শুক্রবার, ৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৩

আদরের কিটি,
যদিও আমাদের চিৎকার-চেঁচামেচির ব্যাপারে অনেকদিন কিছু লিখিনি, তাহলেও অবস্থা এখনও যে-কে সেই। অনেক আগেই এই মন-কষাকষি, আমরা মেনে নিয়েছি, কিন্তু মিস্টার ডুসেলের কাছে প্রথম প্রথম এটা একটা সর্বনেশে কাণ্ড বলে মনে হয়েছিল। তবে এখন সেটা তাঁর গা-সহ্য হয়ে আসছে এবং উনি চেষ্টা করেন ও নিয়ে মাথা না ঘামাতে। মারগট আর পেটার, দুজনের কেউই, যাকে তোমরা 'ছেলেমানুষ' বলবে, তা নয়। দুজনেই বড় গোমড়ামুখো আর আমি প্রচণ্ড ভাবে ওদের নিন্দেমন্দ করি এবং আমাকে সব সময় শোনানো হয়, 'মারগট আর পেটারকে দেখবে কখনো অমন করে না– ওদের দেখে কেন শেখো না?' শুনলেই গা জ্বালা করে। তোমাকে বলতে দোষ নেই, মারগটের মতন হওয়ার আমার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে নেই। ওরকম কাদার তাল আর ঘাত-কাত মেয়ে আমার পছন্দ নয়; যে যাই বলুক ও শুনবে আর সব কিছুই ঘাড় পেতে মেনে নেবে। আমি শক্ত চরিত্রের মেয়ে হতে চাই। কিন্তু এ সব ধারণার কথা কাউকে বলি না; আমার মনোভাবের ব্যাখ্যা হিসেবে এই প্রসঙ্গ যদি তুলি ওরা আমাকে শুধু উপহাস করবে। খাবার টেবিলে সবাই সাধারণত গুম হয়ে

থাকে, যদিও ভাগ্যক্রমে 'সুপখোর'রা রাশ টেনে রাখে বলে কোনো অনাসৃষ্টি ঘটতে পারে না। 'সুপখোর' বলতে অফিসের যে লোকগুলো বাড়িতে এলে এক কাপ করে সুপ খেতে পায়। আজ বিকেলে মিস্টার ফান ডান ইদানীং মারগটের কম খাওয়া নিয়ে আবার বলছিলেন। সেই সঙ্গে ওকে খেপাবার জন্যে বললেন, 'তুমি বুঝি তন্বী হতে চাইছ।' মারগটের পক্ষ নেবার ব্যাপারে মা-মণি সব সময়ে এক পায়ে খাড়া। উনি ফোঁস করে উঠলে, 'আপনার বোকা-বোকা কথা আমার আর সহ্য হয় না।' মিস্টার ফান ডানের কান লাল হয়ে উঠল, সোজা সামনের দিকে তাকিয়ে থাকলেন, তাঁর বাক্‌রোধ হয়ে গেল। আমরা অনেক সময় এটা-সেটা নিয়ে হাসাহাসি করি; এই কয়দিন আগেই মিসেস ফান ডান এমন কথা বললেন যার একেবারেই মানে হয় না। তিনি অতীতের কথা বলছিলেন, ওঁর বাবার সঙ্গে ওঁর কত সুন্দর বনিবনা ছিল এবং উনি কি রকম বখা মেয়ে ছিলেন। উনি বলে গেলেন, 'আর বুঝলে, আমার বাবা আমাকে শেখাতেন, যদি দেখ কোনো পুরুষ মানুষ একটু বেশি রকম গায়ে পড়তে চাইছে, তুমি তাকে অবশ্যই বলবে, 'দেখুন, মিস্টার অমুক, মনে রাখবেন আমি এজন ভদ্রমহিলা'। তাহলেই লোকটি বুঝবে তুমি তাকে কী বলতে চাইছ।' আমরা মনে করলাম চমৎকার একটা হাসির কথা আর হো-হো করা হাসিতে ফেটে পড়লাম। পেটার সচরাচর চুপচাপ থাকলেও মাঝে মাঝে বেশ হাসির খোরাক যোগায়। বিদেশী শব্দ ব্যবহারের দিকে ওর এমনিতেই খুব ঝোঁক। কোন শব্দের কী অর্থ অনেক সময়েই ও অবশ্য তা জানে না। একদিন বিকেলে অফিস ঘরে বাইরের লোক থাকায় আমরা পায়খানামুখো হতে পারিনি। এদিকে পেটারের এমন অবস্থা যে আর তর সয় না, সুতরাং ও আর হুড়কো দেওয়ার মধ্যে গেল না। আমাদের জানান দেওয়ার জন্যে ও করল কী– পায়খানার দরজায় একটা নোটিশ লিখে লটকে দিল– 'এস.ভি.পি. গ্যাস।' ও লিখেছিল এই মনে করে– 'সাবধান, গ্যাস'। ও ভেবেছিল এটা লিখলে আরও সভ্য দেখাবে। বেচারার ধারণাই ছিল না এস.ভি.পি-র মানে হল– 'গ্রহণ করে কৃতার্থ করুন।'

তোমার আনা

শনিবার ২৭ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৩

আদরের কিটি,

পিম আশা করেছেন যে কোনদিন আক্রমণাভিযান শুরু হবে। চার্চিলের নিউমোনিয়া হয়েছে, আস্তে আস্তে সেরে উঠছেন। ভারতবর্ষের স্বাধীনতাপ্রেমিক গান্ধী এইবার নিয়ে কতবার যে অনশন করলেন। মিসেস ফান ডান দাবি করেন তিনি অদৃষ্টে বিশ্বাসী। কামান থেকে যখন গোলা ছোঁড়া হয়, তখন কে সবচেয়ে বেশি ভয়ে কেঁচো হয়ে যায়? পেট্রোনেলা।

গির্জায়-যাওয়া লোকদের কাছে লেখা বিশপের চিঠির একটা কপি হেংক্ এনেছিলেন আমাদের পড়াবার জন্যে। চিঠিটা বড় সুন্দর এবং পড়ে প্রেরণা জাগে। 'নেদারল্যাণ্ডসের মানুষ, গা এলিয়ে বসে থেকো না। প্রত্যেকে তার দেশ, দেশের মানুষ আর তাদের ধর্মের স্বাধীনতার জন্যে নিজস্ব অস্ত্রে লড়ছে।' গীর্জার বেদী থেকে তারা সোজাসুজি বলছে, 'সাহায্য দাও, দরাজ হও এবং আশা হারিও না।' কিন্তু ওতে কি ফল হবে? আমাদের ধর্মের লোকদের বেলায় ওতে কাজ হবে না।

আমাদের এখন কী দশা হয়েছে তুমি ধারণায় আনতে পারবে না। এ বাড়ির মালিক ক্রালার আর কুপহুইসকে না জানিয়ে বাড়িটা বেচে দিয়ে বসে আছে। নতুন মালিক একদিন

সকালে সঙ্গে একজন স্থপতিকে নিয়ে বাড়িটা দেখাবার জন্যে দুম করে এসে হাজির। ভাগ্যিস, মিস্টার কুপহুইস তখন উপস্থিত ছিলেন এবং 'গুপ্তমহল'টা বাদ দিয় বাকি সবটাই তিনি ভদ্রলোককে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখিয়েছেন। কুপহুইস এমন ভাব দেখান যেন ওপাশে যাওয়ার যে দরজা তার চাবিটা আনতে তিনি ভুলে গেছেন। নতুন মালিক ও নিয়ে আর তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করেননি। ভদ্রলোক যতদিন না আবার ফিরে এসে 'গুপ্তমহল'টা দেখতে চাইছেন ততদিন সব ঠিক আছে– কেননা দেখতে চাইলেই তো চিত্তির।

বাপি আমার আর মারগটের জন্যে একটা কার্ড-ইন্‌ডেক্স বক্স খালি করে তাতে কার্ড ভরে দিয়েছেন। এটা হবে বই বিষয়ক কার্ড প্রণালী; এরপর আমরা দুজনেই লিখে রাখব কোন কোন বই পড়লাম বইগুলো কার কার লেখা ইত্যাদি। বিদেশী ভাষার শব্দ টুকে রাখার জন্যে আমি আরেকটা খাতা যোগাড় করেছি।

ইদানীং মা-মণি আর আমি আগের চেয়ে বনিয়ে চলতে পারছি, কিন্তু এখনও আমরা পরস্পরের কাছে মনের কথা বলি না। মারগট এখন আগের চেয়েও বেশি হিংসুটে এবং বাপি কিছু একটা চেপে যাচ্ছেন, তবে বাপি আগের মতই মিষ্টি মানুষ।

খাবার টেবিলে মাখন আর মারগারিনের নতুন বরাদ্দ হয়েছে। প্রত্যেকের পাতে ছোট্ট এক টুকরো চর্বি রাখা থাকে। আমার মতে, ফান ডানেরা মোটেই ঠিক ন্যায্যভাবে ভাগগুলো করেন না। আমার মা-বাবা এ নিয়ে কিছু বলতে ভয় পান, কেননা বললেই একটা কুরুক্ষেত্র বেধে যাবে। খুব দুঃখের কথা। আমি মনে করি ওসব লোকদের বেলায় যেমন কর্ম তেমনি ফল হওয়াই উচিত।

তোমার আনা।

বুধবার, ১০ মার্চ, ১৯৪৩

আদরের কিটি,

কাল সন্ধ্যেবেলায় ইলেকট্রিকের তার জ্বলে গিয়েছিল। তার ওপর সারাক্ষণ দমাদ্দম কামান ফাটার আওয়াজ। গোলাগুলি আর প্লেন-ওড়া সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যাপারে আমার ভয় এখনও আমি কাটিয়ে উঠিতে পারিনি; ফলে প্রায় রোজ রাতেই আমি ভরসার জন্যে বাপির বিছানায় গুঁড়ি মেরে ঢুকে পড়ি। এটা যে ছেলেমানুষি আমি তা জানি, কিন্তু সে যে কী জিনিস তুমি জানো না। বিমানে গোলা-ছোঁড়া কামানের প্রচণ্ড গর্জনে নিজের কথাই নিজে শোনা যায় না। মিসেস ফান ডান এদিকে অদৃষ্টবাদী, কিন্তু তিনি প্রায় কেঁদে ফেলেন আর কি। বেজায় কাঁপা-কাঁচা ক্ষীণ গলায় বললে, 'ওঃ, এত বিতকিচ্ছিরি! আঃ, এত দমাদ্দমভাবে গোলাগুলি ছুঁড়ছে', এই বলে আসলে উনি বোঝাতে চান 'আমার কী যে ভয় করছে, কী বলব।'

মোমবাতির আলোয় যত না, অন্ধকারে তার চেয়ে ঢের বেশি খারাপ লাগে। আমি থর থর করে কাঁপছিলাম, ঠিক যেন আমার জ্বর হয়েছে। করুণ গলায় বাপিকে বললাম মোমবাতিটা আবার জ্বেলে দিতে। বাবাকে নড়ানো গেল না; আলো নেভানোই রইল। হঠাৎ একদফা মেশিনগান কড় কড় করে উঠল, তার আওয়াজ গোলাগুলির চেয়েও দশগুণ বেশি কান-ফাটানো। সেই শুনে মা-মণি বিছানা থেকে লাফ দিয়ে নেমে পড়ে মোমবাতি জ্বেলে দিলেন। বাপি খুব বিরক্ত হলেন। তার আপত্তি উত্তরে মা-মণি বললেন, 'যত যাই হোক, আনা তো আর ঠিক পাকাপোক্ত সৈনিক নয়।' ব্যস্, ঐ পর্যন্ত।

মিসেস ফান ডানের অন্য ভয়গুলোর কথা তোমাকে আমি বলেছি কি? বলিনি বোধ হয়।

'গুপ্তমহলে'র সব ঘটনা সম্পর্কে তোমাকে যদি আমার ওয়াকিবহাল রাখতে হয়, তাহলে এ ব্যাপারটাও তোমার জেনে রাখা দরকার। এক রাতে মিসেস ফান ডানের মনে হল তিনি চিলেকোঠায় সিঁদেল-চোরের আওয়াজ পেয়েছেন; তাদের পায়ের ধুপধাপ আওয়াজ শুনে ভয় পেয়ে ধড়মড়িয়ে উঠে উনি ওঁর স্বামীকে জাগিয়ে দিলেন। ঠিক তক্ষুনি সিঁদেল-চোরেরা হাওয়া এবং মিস্টার ফান ডান সেই ভয়তরাসে অদৃষ্টবাদী মহিলার বুক ধড়ফড় করার আওয়াজ ছাড়া আর কিছুই শুনতে পেলেন না। 'ও পুট্টি (মিস্টার ফান ডানের ডাক নাম), ওরা নিশ্চয় আমাদের সসেজ আর সমস্ত কড়াইশুঁটি আর বিন নিয়ে চলে গেল। আর পেটার নিরাপদে বিছানায় শুয়ে আছে কিনা তাই বা কে জানে?' 'পেটারকে ওরা নিশ্চয় ঝোলার মধ্যে পুরে নিয়ে যাবে না। বলছি, কথা শোনো– ওসব নিয়ে ভেবো না। আমাকে বুঝতে দাও।' কিন্তু তাতে কোনো ফল হল না। ভয়েময়ে মিসেস ফান ডান সে রাত্তিরে আর দুই চোখের পাতা এক করতে পারলেন না। তার কয় রাত পরে ভূতুড়ে শব্দ শুনে ফান ডানদের পরিবারের সকলেরই ঘুম ভেঙে যায়। হাতে টর্চ নিয়ে পেটার চিলেকোঠায় যেতেই– খুসুরমুসুর আর খসুরমুসুর! ছুটে ছুটে কী পালাচ্ছিল বলো তো? ইয়া ইয়া একপাল ধেড়ে ইঁদুর। যখন আমরা জেনে ফেললাম চোরের দল কারা, তখন মুশ্চিকে আমরা চিকেকোঠায় শুতে দিলাম ব্যস্, তারপর আর অনাহূত অতিথিরা ফিরে ওমুখো হয়নি। অন্তত রাতের বেলা।

দিন দুই আগে সন্ধ্যেবেলায় পেটার সিঁড়ির ঘরে উঠেছিল কিছু পুরনো কাগজ আনতে। কলআঁটা দরজাটা শক্ত করে ধরে ধাপে ধাপে ওর নামবার কথা। না তাকিয়ে যেই ও হাত দিয়ে চেপেছে হঠাৎ আচমকা ব্যথা পেয়ে সিঁড়ি থেকে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে। নিজের অজান্তে একটা বড় ধেড়ে ইঁদুরের গায়ে হাত পড়ে যাওয়ায় ইঁদুরটা মোক্ষমভাবে তাকে কামড়ে দেয়। ও যখন আমাদের কাছে এসে পৌঁছল, তখন ও কাগজের মত সাদা, হাঁটু দুটো ঠকঠক করে কাঁপছে, ওর পাজামা রক্তে ভিজে গেছে। আসলে তা হওয়ারই কথা; বড় ধেড়ে-ইঁদুরের গায়ে থাবা দেওয়া, কাজটা খুব মনোরম নয়; আর তার দরুন কামড় খাওয়া সত্যিই ভয়ঙ্কর ব্যাপার।

তোমার আনা।

শুক্রবার, ১২ মার্চ, ১৯৪৩

আদরের কিটি,

তোমার সঙ্গে একজনের আলাপ করিয়ে দিই; ইনি হলেন মা-ঠাকুরন ফ্রাঙ্ক, তারুণ্যের রক্ষাকর্তা। তরুণদের জন্যে বাড়তি মাখন; আধুনিক তরুণ-তরুণীদের সমস্যা; সব কিছুতেই মা-মণি তরুণ-তরুণীদের হয়ে লড়েন এবং খানিকটা টানা-হেঁচড়া করে শেষপর্যন্ত সব সময়ই নিজের গোঁ বজায় রাখেন। একটা বোতলে শোলমাছ রাখা ছিল, সেটা নষ্ট হয়ে গেছে; মুশ্চি আর বোখার তাতে ভালো ভোজ হবে। বোখাকে এখনও তুমি দেখনি অবশ্য আমরা অজ্ঞাতবাসে আসার আগে থেকেই ও এখানে ছিল। ও হল গুদামের আর অফিসের বেড়াল; গুদামঘরগুলোতে ইঁদুরদের ও টিট রাখে। ওর বেয়াড়া ধরনের রাজনৈতিক নামের একটা ব্যাখ্যা দরকার। কিছুকাল কোম্পানির ছিল দুটো বেড়াল; গুদামের জন্যে একটা আর চিলেকোঠার জন্যে একটা। মাঝে মাঝে হত কী, দুই বেড়ালের দেখা হত; আর তার ফলে দুজনের হত ভয়াবহ লড়াই। গুদামের বেড়ালটাই সবসময় আগে ঝাঁপিয়ে পড়ত; এ সত্ত্বেও চিলেকোঠার বেড়ালটাই কী করে যেন জিতে যেত– দেশজাতের লড়াইতে ঠিক যেমন হয়।

কাজেই গুদামের বেড়ালটার নাম দেওয়া হয়েছিল জার্মান বা 'বোখা'; আর চিলেকোঠার বেড়ালের নাম দেওয়া হয়েছিল ইংরেজ বা 'টমি'। পরে 'টমি'কে ভাগিয়ে দেওয়া হয়েছিল; আমরা নিচের তলায় গেলে বোখা আমাদের আপ্যায়ন করে।

কিড্‌নি বিন আর হ্যারিকিট বিন খেয়ে খেয়ে আমাদের এমন অরুচি ধরে গেছে যে এখন ওসব আমার দুই চক্ষের বিষ। এমনকি মনে হলেও আমার গায়ের মধ্যে পাক দেয়। সন্ধ্যেবেলায় এখন আর পাঁউরুটি দেওয়া হয় না। বাবা এইমাত্র বললেন ওঁর মেজাজ ভালো নেই। ওঁর চোখ দুটো আবার এত বিষণ্ন দেখাচ্ছে– বেচারা!

একটা বই পড়ছি। 'দরজায় কে কড়া নাড়ে'। লেখক ইনা বোডিয়া বাকার। বইটা একদণ্ড ছাড়তে পারছি না। পরিবারের কাহিনীটা অসাপ্রারণভাবে লেখা হয়েছে। তাছাড়া এতে আছে যুদ্ধ, লেখকদের জীবন, স্ত্রী স্বাধীনতা; এবং সত্যি বলতে, ওসবে আমার অতটা আগ্রহ নেই।

জার্মানির ওপর হয়েছে ভয়াবহ বিমান হামলা। মিস্টার ফান ডানের মেজাজ বিগড়ে আছে; কারণ-সিগারেটের অভাব। টিনের সব্জি আমরা ব্যবহার করব কি করব না, এ নিয়ে আলোচনায় রায় হল আমাদের পক্ষে।

মাত্র একজোড়া জুতোয় আর আমার চলছে না। স্কি-বুট আছে বটে, কিন্তু বাড়ির মধ্যে ওতে তেমন কাজ হয় না। ৬.৫০ ফ্লোরিনে কেনা একজোড়া আটপৌরে চটি আমার পায়ে মাত্র এক হপ্তার বেশি গেল না, এখন ওটা পরার বাইরে। মিপ হয়ত চোরাপথে কিছু একটা জুটিয়ে আনবেন। আমাকে বাপির চুল ছাঁটতে হবে। পিম্ এখনও বলে যাচ্ছেন যে, আমি নাকি চুল ছাঁটার কাজে এতই পোক্ত যে, যুদ্ধের পর উনি কখনই আর দোস্‌রা কোনো নাপিতের কাছে যাবেন না। তাও যদি প্রায়ই ওঁর কানে খোঁচা লাগিয়ে না দিতাম।

তোমার আনা।

বৃহস্পতিবার, ১৮ মার্চ, ১৯৪৩

আদরের কিটি,

তুরস্ক লড়াইতে যোগ দিয়েছে। দারুণ উত্তেজনা। খবরটার জন্যে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি।

তোমার আনা।

শুক্রবার, ১৯ মার্চ, ১৯৪৩

আদরের কিটি,

এক ঘন্টা পরে হরিষে বিষাদ ঘটল। তুরস্ক এখনও যুদ্ধে যোগ দেয়নি। শুধু ওদের মন্ত্রিসভার একজন সদস্য কথাপ্রসঙ্গে বলেছে যে তাদের শীগগিরই নিরপক্ষেতা বিসর্জন দিতে হবে। ড্যামে (রাজপ্রাসাদের সামনের একটি চক) একটি কাগজ নিয়ে হকার চেঁচাচ্ছিল, 'ইংলণ্ডের পক্ষে তুরস্ক'। লোকটার হাত থেকে কাগজগুলো লোকে ছিনিয়ে নেয়। সুসংবাদটা এমনি ভাবে আমাদের কানেও পৌছে যায়; ৫০০ আর ১০০০ গিল্ডারের নোট বাতিল বলে ঘোষণা করা হয়েছে। কালোবাজারী এবং ঐ ধরনের লোক, তবে তার চেয়েও বেশি যাদের হাতে অন্য রকমের 'কালো' টাকা আছে, আর সেই সঙ্গে যারা আত্মগোপন করে আছে– তাদের কাছে এটা একটা ধরা পড়ার ফাঁদ। তুমি যদি একটা ১০০০ গিল্ডারের নোট নিয়ে যাও,

তোমাকে কবুল করতে এবং প্রমাণ করতে সক্ষম হতে হবে যে, ঠিক কিভাবে তুমি নোটটা পেয়েছ। ঐ নোটে এখনও ট্যাক্স জমা দেওয়া যাবে, তবে মাত্র পরের সপ্তাহ অব্দি। ডুসেল একটা সেকেলে পায়ে চালানো ডেন্টিস্টের ঘুরণ-কল পেয়েছেন, আশা করছি উনি শীগগিরই একবার আমাকে আদ্যোপান্ত পরীক্ষা করে দেখবেন। 'সর্বজার্মানের নেতা', ফ্যুয়ার আলার গের্মানেন, আহতদের সঙ্গে কথা বলছিলেন। কান পেতে তা শোনা কষ্টকর। সওয়াল-জবাব হচ্ছিল এইভাবে–

'আমার নাম হাইনরিশ্ শেপেল।'

'জখম হয়েছ কোথায়?'

'স্তালিনগ্রাদের কাছে।'

'আঘাত কী ধরনের?'

'দুটো পা ঠাণ্ডায় জমে খসে গেছে এবং বাম বাহুর সন্ধির হাড় ভেঙে গেছে।'

রেডিওতে ভয়াবহ পুতুল নাচের চিত্রটা ছিল হুবহু এই রকম। মনে হচ্ছিল আহত লোকগুলো তাদের জখমের জন্যে গর্বিত– আঘাত যত বেশি হয় তত ভালো। ওদের একজন ফ্যুলারের সঙ্গে করমর্দন করতে পেরে (অবশ্য করমর্দন করার হাত তখনও যদি তার থেকে থাকে।) ভাবাবেগে এতই গদগদ যে, মুখ দিয়ে তার শব্দ যেন বেরোচ্ছিল না।

তোমার আনা।

বৃহস্পতিবার, ২৫ মার্চ, ১৯৪৩

আদরের কিটি,

কাল মা-মণি, বাপি, মারগট আর আমি একসঙ্গে হয়ে খোশমেজাজে বসে আছি, পেটার হঠাৎ এসে বাপির কানে ফিস্‌ফিস করে কী যে বলল। আমি এই রকমের কিছু শুনলাম 'একটা পিপে আড়তে গড়িয়ে পড়েছে' এবং কেউ একজন কাছে এসে হাতড়াচ্ছে। মারগটের কানেও সেটা গেছে। বাপি আর পেটার তৎক্ষনাৎ চলে গেল; তখন মারগট এসে আমাকে খানিকটা শান্ত করার চেষ্টা করল, কেননা স্বভাবতই আমার মুখ কাগজের মতন সাদা হয়ে গিয়েছিল আর আমি একটুতেই ভয়ে চম্‌কে চম্‌কে উঠছিলাম।

আমরা তিন মায়ে ঝিয়ে টান-টান হয়ে অপেক্ষা করছি। দু-এক মিনিট পরে মিসেস ফান ডান ওপরে এলেন; অফিসের খাসকামরায় বসে তিনি রেডিও শুনছিলেন। উনি বললেন পিম্ এসে তাঁকে বলেছেন রেডিও বন্ধ করে দিয়ে চুপিসাড়ে ওপরে চলে যেতে। কিন্তু এসব ক্ষেত্রে কি রকম হয় তোমরা জানো। যত তুমি আস্তে চলতে চাও, প্রত্যেক ধাপে পুরনো ঝরঝরে সিঁড়িতে ক্যাঁচ কোঁচ করে শব্দ হয় যেন দ্বিগুণ। পাঁচ মিনিট পরে বাপি আর পেটারের আবার দেখা মিলল। ওদের চুলের গোড়া পর্যন্ত ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। ওরা ওদের অভিজ্ঞতার কথা বলল।

সিঁড়ির নিচে লুকিয়ে থেকে ওরা কান খাড়া করে ছিল। প্রথমে কোনো ফল পাওয়া যায়নি। কিন্তু হঠাৎ, হ্যাঁ, তোমাকে বলা দরকার, ওরা দুটো ধুমধাড়াক্কা আওয়াজ পায়, ঠিক যেন এ বাড়ির দুটো দরজায় কে বা কারা ধাক্কা দিচ্ছে। পিম্ এক লাফে ওপরে চলে আসেন, পেটার গিয়ে প্রথমে ডুসেলকে সাবধান করে দেয়, ডুসেল একগাদা ধুপধাপ আওয়াজ করে কোনো রকমে তো শেষটায় ওপরতলায় এসে হাজির হলেন। এরপর আমরা সকলে মিলে মোজা-পরা অবস্থায় এর পরের তলায় ফান ডানদের ডেরায় এসে জমা হলাম। মিস্টার ফান

ডানের বেজায় ঠাণ্ডা লেগে যাওয়ায় আগেই উনি বিছানায় শুয়ে পড়েছিলেন। সুতরাং আমরা সবাই ওঁর বিছানা ঘিরে ঘেঁষাঘেঁষি হয়ে বসে ওঁকে আমাদের সন্দেহের কথা বললাম।

মিস্টার ফান ডান যতবারই জোরে কেশে ওঠেন, ততবারই মিসেস ফান ডান ভয় পেয়ে অজ্ঞান হওয়ার যোগাড় হন। এই রকম চলতে থাকার পর একজনের মাথায় বুদ্ধি খেলে গেল যে, ওঁকে খানিকটা কোডিন খাওয়ানো যাক। ব্যাস্, তাতেই সঙ্গে সঙ্গে কাশির উপশম হল। তারপর আবার ঠায় চলল আমাদের অপেক্ষা করে থাকার পালা। কিন্তু আর কোনো আওয়াজ না পেয়ে শেষ পর্যন্ত আমরা সবাই এই সিদ্ধান্তে এলাম যে, এমনিতে নিশ্চুপ বাড়িটাতে পায়ের শব্দ কানে যেতেই চোরের দল পিঠটান দিয়েছে।

কিন্তু এটা হওয়া উচিত হয়নি যে, নিচের তলার রেডিওতে তখনও ছিল ইংলণ্ডের স্টেশন ধরা এবং রেডিওর চার পাশে সুন্দর ভাবে চেয়ারগুলো সাজানো। দরজা ভেঙে ঢুকে এ-আর-পির লোকদের যদি সেটা নজরে পড়ত এবং পুলিসকে তারা যদি খবর দিত, তাহলে তার ফল হত খুবই খারাপ। সুতরাং মিস্টার ফান ডান উঠে পড়ে কোট আর টুপি চাপিয়ে বাপির পিছু পিছু পা টিপে টিপে নিচে চললেন, পেছনে রইল পেটার– বলা যায় না, হঠাৎ যদি দরকার হয়, সেই জন্যে তার হাতে বড় গোছের একটা হাতুড়ি। ওপর তলার মহিলারা (মারগট আর আমি সমেত) দম বন্ধ করে অপেক্ষা করতে লাগলেন। যাক, মিনিট পাঁচেক পরে ভদ্রলোকের দল ফিরে এসে খবর দিলেন বড়িতে এখন আর কোনো ঝামেলা নেই।

আমরা ঠিক করেছিলাম যে, পায়খানায় আমরা পানি দেব না এবং হুড়কো লাগাব না। কিন্তু উত্তেজনার দরুন আমাদের বেশির ভাগেরই পেটে চাপ পড়ায় আমরা একে একে যখন সেখানে হাজিরা দিয়ে এলাম, তুমি কল্পনা করতে পারো তার ফলে আবহাওয়ার অবস্থাটা কী হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

যখন ঐ ধরনের কিছু ঘটে, তখন আরও গুচ্ছের জিনিস যেন সব একসঙ্গে এসে হাজির হয়, যেমন এখন হচ্ছে। এক নম্বর হল, ভেস্টার-টোরেনের যে ঘড়ির ঢং ঢং শুনলে সব সময় আমার ধড়ে প্রাণ আসে, সেটা বাজেনি। দু নম্বর হল, মিস্টার ফোসেন আগের দিন সন্ধ্যেবেলায় অন্যান্য দিনের চেয়ে আগেভাগে চলে যাওয়ায় আমরা এটা জানি না যে এলি ঠিক চাবিটা নিতে পেরেছিল কিনা এবং হয়ত বা দরজা বন্ধ করতে ভুলে গিয়েছিল। রাত্তির বলতে তখনও সন্ধ্যে এবং আমরা তখনও সন্দেহের দোলায় দুলছি; অবশ্য এটা ঠিক যে, তখন সিঁদেল-চোরের ভয়ে বাড়িটা তটস্থ হয়ে ছিল, তখন সেই আটটার কাছাকাছি সময় থেকে সাড়ে দশটা পর্যন্ত আর কোনো আওয়াজ না পেয়ে মনে মনে আমরা একটু আশ্বস্ত হয়েছিলাম। আরও একটু ভেবে দেখার পর আমরা সাব্যস্ত করলাম– রাস্তায় তখনও যেহেতু লোক চলাচল করছে, সেইহেতু সন্ধ্যের অত গোড়ায় গোড়ায় চোর এসে দরজা ভেঙে ঢুকবে এটা স্বাভাবিক নয়। তাছাড়া আমাদের মধ্যে একজনের মাথায় এল, আচ্ছা, এমনও তো হতে পারে যে, পাশের বাড়ির গুদামের তত্ত্বাবধায়ক তখনও কাজ করছিল, কেননা উত্তেজনার মাথায় এবং দেয়ালগুলো পাতলা হওয়ায় খুব সহজেই কেউ ভুল করে বসতে পারে এবং তার চেয়েও বড় কথা, এই ধরনের সঙ্কটজনক সময়ে অনেক কিছুই নিছক কল্পনায় ঘটে যেতে পারে।

সুতরাং আমরা সবাই শুতে চলে গেলাম; কিন্তু কারো চোখেই ঘুম এল না। বাপির সঙ্গে মা-মণি আর মিস্টার ডুসেল জেগে রইলেন এবং একটুও বাড়িয়ে বলছি না, আমিও এক ফোঁটা ঘুমোইনি বললেই হয়। আজ সকালে বাড়ির পুরুষ মানুষেরা নিচের তলায় গিয়ে দেখে

এলেন সদর দরজা তখনও বন্ধ কিনা। দেখা গেল, সব কিছু নিরাপদ। আমরা সেই হাত-পা হিম করে দেওয়া ঘটনার কথা জনে জনে বিস্তারিতভাবে বললাম। ওরা তাই নিয়ে মজা করল, অবশ্য পরে ওসব জিনিস নিয়ে হাসাহাসি করা সহজ। একমাত্র এলি আমাদের কথা গুরুত্ব দিয়ে শুনলেন।

তোমার আনা।

শনিবার, ২৭ মার্চ, ১৯৪৩

আদরের কিটি,

আমাদের শর্টহ্যাণ্ডের পাঠক্রম শেষ হয়েছে; এবার আমরা লিখে স্পীড তোলার চেষ্টা করছি। আমরা বেশ চালাক চতুর হয়ে উঠছি না কি? তোমাকে আরেকটু বলব আমার কালক্ষয়ী বিষয়গুলো সম্বন্ধে (নামটা আমার দেওয়া, কেননা দিনগুলো যথাসম্ভব দ্রুত পার করে দেওয়া ছাড়া আমাদের আর কিছু করার নেই– যাতে এখানকার মেয়াদ তাড়াতাড়ি শেষ হয়); পুরাণ বলতে আমি পাগল, বিশেষ করে গ্রীস আর রোমের দেবদেবী। এখানে ওঁরা মনে করেন দুদিনের শখ; নইলে আমার বয়সী কোনো নাবালক পুরাণে আসক্ত, এ জিনিস বাপের জন্মে ওঁরা শোনেননি। বহুৎ আচ্ছা, আমি না হয় প্রথমই হলাম।

মিস্টার ফান ডানের সর্দি, বরঞ্চ বলা ভালো গলায় ওঁর ছোট বীজ কুঁড়ি হয়েছে। তাই নিয়ে উনি চক্কর বাধিয়ে দিয়েছেন। ক্যামোমিল পানিতে ফুটিয়ে তাই দিয়ে গার্গ্লিং, টিংচার অব মির দিয়ে গলায় পেন্ট করা, বুকে নাকে, দাঁতে আর জিভে ইউক্যালিপ্টাস মালিশ করা; এবং এত কিছু করার পরও সেই প্যাঁচার মত মুখ করে থাকা।

এক জার্মান চাঁই রাইটার এক বক্তৃতা দিয়েছে। '১লা জুলাইয়ের আগে সমস্ত ইহুদীদের মার্জান-অধিকৃত দেশগুলো থেকে হটাবাহার হতে হবে। '১লা এপ্রিল থেকে ১লা মে-র মধ্যে উট্রেখ্‌ট্ প্রদেশ পরিষ্কার করে ফেলতে হবে (যেন ইহুদীরা হল আরশোলা)। ১লা মে থেকে ১লা জুনের মধ্যে উত্তর আর দক্ষিণ হল্যাণ্ড।' এই হতভাগা মানুষগুলোকে একপাল রুগ্ন অবজ্ঞাত গরুছাগলের মতন নিঘিন্যে কশাইখানায় পাঠানো হচ্ছে।

একটা ছোট্ট ভালো খবর হল, অন্তর্ঘাতকেরা শ্রমিক বিনিময়ের জার্মান বিভাগে আগুন লাগিয়েছে। তার দিনকয়েক পর রেজিস্ট্রারের দপ্তরেরও একই হাল হয়। জার্মান পুলিসের উর্দি পরে তারা কোনোরকমে পাহারাদারদের বেঁধে ফেলে গুরুত্বপূর্ণ দলিল দস্তাবেজ নষ্ট করে দেয়।

তোমার আনা।

বৃহস্পতিবার, ১ এপ্রিল, ১৯৪৩

আদরের কিটি,

আমি কিন্তু সত্যিই এপ্রিল-ফুল করছি না (তারিখটা দেখ), বরং তার উল্টো; আমি আজ স্বাচ্ছন্দে বলতে পারি সেই প্রবাদ– 'বিপদ কখনও একা আসে না।' প্রথমে ধর, মিস্টার কুপহুইস, যিনি সব সময় আমাদের উৎফুল্ল রাখেন, তাঁর পেট থেকে রক্ত পড়েছে; কম করে তিন সপ্তাহ তাকে বিছানায় শুয়ে থাকতে হবে। দ্বিতীয়ত, এলির হয়েছে ইনফ্লুয়েঞ্জা। তৃতীয়ত, আসছে সপ্তাহে মিস্টার ফোসেন যাচ্ছেন হাসপাতালে। ওঁর বোধ হয় তলপেটে আল্‌সার হয়েছে। এবং চতুর্থত, কিছু জরুরী ব্যবসায়িক কথা হবে, যার প্রধান প্রধান বিষয়

মিস্টার কুপহুইসের সঙ্গে বাপি আগেই বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করে রেখেছিলেন, কিন্তু এখন আর মিস্টার ক্রালারের সঙ্গে সে সব কথা আদ্যোপান্ত খোলসা করে বলার সময় নেই।

যে ভদ্রলোকদের আসার কথা ছিল তাঁরা যথাসময়ে এসে গেছেন। ওঁরা আসার আগে থেকেই কথাবার্তা কেমন হয় এই নিয়ে বাবা দুশ্চিন্তায় ছটফট করছিলেন। উনি চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলছিলেন, 'ইস্, আমি যদি ওখানে থাকতে পারতাম আমি নিজে যদি একতলায় থাকতে পারতাম।' 'যাও না, মেঝেতে এক কান চেপে শুয়ে পড়, তাহলেই সব শুনতে পাবে।' বাপির মুখের ওপর থেকে মেঘ কেটে গেল। কাল সাড়ে দশটায় মারগট আর বাপি (একটা কানের চেয়ে দুটো কান প্রশস্ত) মেঝের ওপর যে যার জায়গা বেছে সটান লম্বা হলেন। সকালের কথাবার্তা শেষ হল না, কিন্তু বিকেলে বাপির শরীরের অবস্থা কাহিল হয়ে পড়ায় কান-পাতার অভিযানে তাঁকে ইস্তফা দিতে হল। এ রকম অস্বাভাবিক আর অস্বস্তিকর ভঙ্গিতে পড়ে থাকার ফলে বাপির অঙ্গপ্রত্যঙ্গ প্রায় অসাড় হয়ে গেল। যাতায়াতের রাস্তাটাতে গলার আওয়াজ পাওয়া মাত্র আড়াইটের সময় আমি বাপির জায়গা নিলাম। মারগট আমার সঙ্গে রইল। মাঝে মাঝে কথাবার্তাগুলো এতই তানানানা তানানানা করে চলছিল এবং এতই ক্লান্তিকর হচ্ছিল যে, ঠাণ্ডা শক্ত লিনোলিয়ামের মেঝেতে হঠাৎ আমি একদম ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। মারগটের সাহস হয়নি আমার গায়ে হাত দিয়ে ডাকার, পাছে ওরা টের পেয়ে যায়– কথা বলার তো প্রশ্নই ওঠে না। বেশ আধঘণ্টা ঘুমোবার পর জেগে উঠে আমার মুখ শুকিয়ে গেছে– হায় রে, অমন জরুরী আলোচনার এক বর্ণও যে আমার মনে নেই। বরাত ভালো, মারগট ঢের বেশি মন দিয়ে সব শুনেছিল।

তোমার আনা।

শুক্রবার ২ এপ্রিল, ১৯৪৩

আদরের কিটি,

মরেছি! আমার নামের পাশে আরেকটা কালো ঢেঁড়া পড়েছে। কাল সন্ধ্যেবেলায় আমি বিছানায় শুয়ে অপেক্ষা করছি বাপি এসে স্তোত্র পড়িয়ে আমাকে শুভরাত্রি বললেন। এমন সময় মা-মণি আমার ঘরে ঢুকে বিছানায় বসে খুব সস্নেহে বললেন, 'আনা, বাপি এক্ষুনি আসতে পারছেন না, আজ রাত্তিরে তুমি কি আমার সঙ্গে স্তোত্র বলবে?' আমি উত্তর দিলাম, 'না, মা-মণি।'

মা-মণি উঠে পড়ে এক মুহূর্ত আমার বিছানার পাশে এসে থেমে আস্তে আস্তে দরজার দিকে হেঁটে চললেন। তারপর হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে মুখটাকে প্যাঁচার মত করে বললেন, 'আমি রাগ করিনি। ভালবাসা জোর করে হয় না।' বলে ঘর ছেড়ে বেরোবার সময় দেখলাম ওঁর চোখে টস্‌টস্ করছে পানি।

আমি স্থির হয়ে বিছানায় শুয়ে রইলাম, তক্ষুনি এটা অনুভব করতে পারলাম যে মা-মণিকে আমার অমন রূঢ়ভাবে দূরে ঠেলে দেওয়াটা জঘন্য কাজ হয়েছে। কিন্তু আমি এও জানতাম, ও ছাড়া আর কোনো উত্তর আমি দিতে পারতাম না। দিয়ে কোনো ফল হত না। মা-মণির কথা ভেবে আমার খুব কষ্ট হল। কত যে কষ্ট হল বলার নয়। কেননা জীবনে এই প্রথম দেখলাম আমাকে মুখ ফেরাতে দেখে উনি সেটা গায়ে মাখছেন। যখন উনি ভালবাসা জোর করে না হওয়ার কথা বলছিলেন তখন আমি ওঁর মুখে দেখেছিলাম দুঃখের ছাপ।

সত্যি কথা বললে কড়া শোনায়, তবু সেটাই তো সত্যি। উনি নিজেই আমাকে দূরে

ঠেলেছেন; ওঁর অবিবেচক সব মন্তব্য, যাতে আমার আদৌ হাসি পায় না এমন সব বদরসিকতা– এ সবের ফলে আমার মনের মধ্যে ঘাঁটা পড়ে গেছে; এখন আর ওঁর দিকের কোনো ভালোবাসা আমার মনে সাড়া দেয় না।

ওঁর কড়া কড়া কথায় আমি যেন সিঁটিয়ে যাই, ওঁরও মনের মধ্যেটা সেই রকম করে উঠেছিল যখন উনি জানলেন যে আমাদের মধ্যে ভালবাসা নেই। অর্ধেক রাত অবধি উনি কান্নাকাটি করেছেন এবং সারা রাত ঘুমোননি বললেই হয়। বাপি আমার দিকে তাকান না, আর যদিও বা একদণ্ড তাকান, আমি দেখতে পাই, ওঁর চোখে লেখা আছে– 'তুমি কী করে এত নিষ্ঠুর হতে পারো, কী করে তুমি প্রাণে ধরে তোমার মায়ের মনে এতটা দুঃখ দিতে পারো?'

ওঁরা আশা করছেন আমি ক্ষমা চেয়ে নেব; কিন্তু এটা এমন যে, এর জন্যে আমি ক্ষমা চাইতে পারি না– কেননা আমি সত্যি কথা বলেছি এবং আজ হোক কাল হোক, যে-কোন প্রকারে মা-মণিকে সেটা জানতেই হবে। মনে করা হচ্ছে মা-মণির চোখের পানি আর বাপির চাহনি আমি দেখেও দেখছি না– কথাটা ঠিক; তার কারণ, আমি যা বরাবর অনুভব করে এসেছি, সে সম্বন্ধে ওঁদের এই প্রথম হুঁশ হয়েছে। মা-মণির জন্যে এই ভেবে আমার দুঃখ না হয়ে পারে না যে, এতদিন বাদে এখন ওঁর এটা চোখে পড়ছে, অবিকল ওঁর ভাবটাই আমি গ্রহণ করেছি। আমার দিক থেকে আমি মুখ বুঁজে এবং এড়ো-এড়ো ভাবে আছি। আর আমি সত্যকে দূরে সরিয়ে রাখব না, কেন না যত বেশি দেরি করা হবে ওঁদের পক্ষে তখন শুনে তা সহ্য করা তত কঠিন হয়ে পড়বে।

তোমার আনা।

মঙ্গলবার, ২৭ এপ্রিল, ১৯৪৩

আদরের কিটি,

গোটা বাড়ি গাঁক গাঁক করে চেঁচাচ্ছে এমন ঝগড়া। মা-মণি, ফান ডানরা আর বাপি। মা-মণি, মিসেস ফান ডান– সবাই সবার ওপর খাপ্পা। সুন্দর পরিবেশ, তাই না? আনার চিরাচরিত ক্রটির ফর্দটি আবার ঝুলি থেকে বের করে আদ্যোপান্ত রটিয়ে দেওয়া হয়েছে।

মিস্টার ফোসেন ইতিমধ্যে বিনেনগাস্টহুইস হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। মিস্টার কুপহুইস আবার ঠেলে উঠেছেন, সাধারণত যা সময় লাগে তার আগেই তাঁর রক্ত পড়া বন্ধ হয়েছে। উনি আমাদের জানিয়েছেন যে, দমকল বাহিনী শুধু আগুন না নিভিয়ে গোটা জায়গা পানিতে ভিজিয়ে দেওয়ায় রেজিস্ট্রারের অফিস অতিরিক্ত ক্ষতিপূরণ পেয়েছে। আমি তাতে খুশি।

কার্লটন হোটেল ভেঙে গুঁড়ো হয়ে গেছে। আগুনে বোমায় টাসা দুটো ব্রিটিশ বিমান 'ওফিৎসিয়েৎসহাইমে'র একেবারে ওপরে এসে পড়েছিল। পুরো ফিৎসেলট্রাটসিঙ্গেলের শেষ মুড়োটা পুড়ে ছাই হয়েছে। জার্মান শহরগুলোর ওপর বিমান আক্রমণ দিন দিন জোরদার হচ্ছে। একটি রাতও আমাদের শান্তিতে কাটেনি।

না ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে আমার চোখের কোলে কালি পড়েছে। আমাদের খাওয়াদাওয়ার যা হাল হয়েছে তা কহতব্য নয়। প্রাতঃরাশের জায়গায় শুকনো রুটি আর কফি। রাতের খাওয়া– পনেরো দিন এক নাগাড়ে পালং শাক অথবা লেটুস। আলু বিশ সেন্টিমিটার লম্বা, মিষ্টি আর পচা-পচা খেতে। যারাই খাওয়া কমিয়ে রোগা হতে চায়, তাদের উচিত

'গুপ্তমহলে' এসে থাকা। ওপর তলার লোকেরা মুখ তেতো করে নালিশ জানাচ্ছে, কিন্তু এটাকে ততটা শোকাবহ ব্যাপার বলে আমরা মনে করি না। ১৯৪০ সালে যে লোকগুলো লড়েছে অথবা যাদের পল্টনে তলব করা হয়েছিল তাদের 'ডের ফুরারে'র জন্যে যুদ্ধবন্দী হিসেবে কাজ করার ডাক পড়েছে। স্থলাভিযান ঠেকানোর জন্যে ওরা এটা করতে পারে।

তোমার আনা।

শনিবার, ১ মে, ১৯৪৩

আদরের কিটি,

এখানে আমরা কিভাবে আছি এটা ভাবলেই সাধারণত আমার মনে না হয়ে পারে না যে, যেসব ইহুদী আত্মগোপন করে নেই তারা যেভাবে দিন কাটাচ্ছে সে তুলনায় আমরা তো স্বর্গে আছি। এ সত্ত্বেও পরে আবার যখন সব স্বাভাবিক হয়ে আসবে, তখন ভেবে অবাক লাগবে যে, নিজের বাড়িতে যে-আমরা এত ঝকঝকে তকতকে হয়ে বাস করতাম, সেই আমরা কতটা নিচু স্তরে নেমে গিয়েছিলাম।

এটা বলতে আমি বোঝাচ্ছি যে, আমাদের আচার-ব্যবহারের অধঃপতন ঘটেছে। যেমন ধরো, আমরা যবে থেকে এখানে এসেছি, আমাদের টেবিলে অয়েল ক্লথ বলতে একটাই; বহুব্যবহৃত হওয়ার ফলে এখন আর সেটাকে আদৌ পরিষ্কার বলা যায় না। অবশ্য এটা বলতে হবে যে, আমি প্রায়ই একটা নোংরা ন্যাকড়া দিয়ে সেটা সাফ করার চেষ্টা করি, কিন্তু ছিঁড়েখুঁড়ে ন্যাকড়াটার আর কিছু পদার্থ নেই।

হাজার ঘষামাজা সত্ত্বেও টেবিলটার যা হাল হয়েছে, তাতে কেউ আমাদের সুখ্যাতি করবে না। ফান ডানেরা সারা শীতকাল একই ফ্ল্যানেলের চাদরে শুয়েছেন; চাদরটা এখানে কাচা সম্ভব হয় না, তার কারণ রেশনে আমরা যে সাবানের গুঁড়োটুকু পাই তাতে কুলোয় না। এবং জিনিসটাও তত ভালো নয়। বাপির ট্রাউজার জ্যালজ্যাল করছে আর তাঁর টাইও ঝরঝরে হয়ে এসেছে। মার করসেট আজ ফেঁসে গেছে, ওগুলো এখন রিপু করারও বাইরে আর মারগটকে এখন দুই সাইজ ছোট ব্রেসিয়ার পরে চলতে হচ্ছে।

মা-মণি আর মারগট গোটা শীতকাল তিনটে গেঞ্জি ভাগ করে পরে চালিয়েছে, আমারগুলো এত খাটো যে, তাতে পেট পর্যন্ত ঢাকে না।

নিশ্চয় এ জিনিসগুলো এমন যা জয় করা যায়। তবু মাঝে মাঝে আমি হঠাৎ ভাবিত হয়ে পড়ি– 'আমার প্যাণ্ট থেকে বাপির দাড়ি কামানোর বুরুশ পর্যন্ত যতসব জীর্ণ ক্ষয়ে-যাওয়া জিনিস নিয়ে আজ আমরা এই যে চালাচ্ছি– কীকরে আবার আমরা যুদ্ধের আগেকার পর্যায়ে ফিরে যেতে পারব?'

কাল রাত্তিরে এত অসহ্য রকমের গোলাগুলি ফেটেছে যে চারবার উঠে আমি আমার নিজের বলতে যা কিছু সব এক জায়গায় করেছি। পালাবার পক্ষে অত্যাবশ্যক জিনিসগুলো আমি সুটকেসে ভরেছি।

কিন্তু মা-মণি খুব নায্যতই বলেছেন– 'পালিয়ে কোথায় যাবি তুই?' দেশের নানা অংশে ধর্মঘট চলতে থাকায় সারা হল্যাণ্ডকে নাড়া দেওয়া হচ্ছে। সুতরাং আক্রান্ত অবস্থা জারি করা হয়েছে এবং প্রত্যেককে একটি করে মাখনের কুপন কম পেতে হবে।

ছোট বাচ্চারা ভারি দুষ্টু।

তোমার আনা।

মঙ্গলবার, ১৮ মে, ১৯৪৩

আদরের কিটি,

জার্মান আর বৃটিশ বিমানের এক প্রচণ্ড হাওয়াই যুদ্ধ আমি চাক্ষুষ করলাম। দুর্ভাগ্যক্রমে ৪ জন দুই মিত্রপক্ষের সৈন্যকে জ্বলন্ত বিমান থেকে লাফিয়ে পড়তে হয়েছিল। হাল্‌ফ্‌ভেগে থাকেন আমাদের দুধওয়ালা; তাদের মধ্যে একজন ডাচ ভাষা গড়গড় করে বলে। সিগারেট ধরাবার জন্যে লোকটা আগুন চেয়েছিল এবং বলেছিল যে তাদের দলে ছিল ছ'জন লোক। পাইলট যে, সে আগুনে পুড়ে মারা যায় এবং পঞ্চম লোকটি কোথাও লুকিয়ে পড়েছে। জার্মান পুলিস এসে সুস্থ নিটোল চারটি লোককে ধরে নিয়ে যায়। আমি এই ভেবে অবাক হই যে, পারাসুট নিয়ে ঐ রকম ভয়াবহ ঝাঁপ দেওয়ার পরেও কী করে ওরা মাথা ঠাণ্ডা রাখতে পেরেছিল।

এখন বেশ গরম পড়ে গেছে; এ সত্ত্বেও তরিতরকারির খোসা আর আবর্জনা পোড়ানোর জন্যে একদিন অন্তর আমাদের আগুন জ্বালাতে হচ্ছে। জঞ্জালের ঝুড়িতে আমরা কিছু ফেলতে পারি না, কারণ আড়তের ঝাড়ুদারকে আমাদের সম্‌ঝে চলতে হয়। একটু অসাবধান হলে খুব সহজেই ধরা পড়ে যাওয়ার ভয় থাকে।

যেসব ছাত্ররা এ বছর ডিগ্রি পেতে চায় কিংবা পড়াশুনো চালিয়ে যেতে চায়, তাদের সবাইকেই এই মর্মে সই করতে হবে যে, তারা জার্মানদের পক্ষাবলম্বী এবং নব-বিধানের সমর্থক। শতকরা আশীজন তাদের বিবেকবিরুদ্ধ কাজ করতে অস্বীকার করেছে। এর জন্যে স্বভাবতই তাদের ফল ভোগ করতে হয়েছে। সই-না-করা সমস্ত ছাত্রকে জার্মানিতে মেহনতী শিবিরে যেতে হবে। জার্মানে গিয়ে সবাইকে যদি হাড়ভাঙা মেহনত করতে হয়, তাহলে এদেশে নওজোয়ান বলতে কী আর অবশিষ্ট থাকবে? গোলাগুলির আওয়াজের দরুন মা-মণি কাল জানলা এঁটে দিয়েছিলেন; আমি ছিলাম পিমের বিছানায়।

আমাদের ওপরতলার মিসেস ফান ডান বিছানা ছেড়ে তড়াক করে লাফ দেন; যেন মুশ্চি ওঁকে কামড়ে দিয়েছে। আর তার ঠিক পরক্ষণেই এক প্রচণ্ড কান-ফাটানো আওয়াজ। শুনে মনে হল, আমার বিছানার ঠিক পাশেই যেন একটা আগুনে বোমা এসে ফেটেছে। আমি তারস্বরে চেঁচালাম, 'আলো জ্বালো, আলো জ্বালো।' পিম বাতিটা জ্বেলে দিল। আমি ভেবেছিলাম মিনিট কয়েকের মধ্যে অন্তত দেখব ঘরটা দাউ দাউ করে জ্বলে উঠেছে। তেমন কিছুই ঘটল না। আমরা তাড়াতাড়ি ছুটলাম ওপরতলায় কী ব্যাপার দেখতে। খোলা জানালা দিয়ে ফান ডান দম্পতি একটা লাল ঝল্‌কানি দেখতে পান। মিস্টার ফান ডান ভাবলেন পাড়ায় আগুন লেগেছে এবং তাঁর স্ত্রীর ধারণা হল আমাদের বাড়িটাতেই আগুন ধরে গেছে। বোমা ফাটার আওয়াজের আগেই হাঁটু কাঁপতে কাঁপতে ভদ্রমহিলা উঠে পড়েছেন। কিন্তু ঘটনার ওখানেই ছেদ পড়ায় আমরা গুটিসুটি মেরে যে যার বিছানায় ফিরে এলাম।

মিনিট পনেরো যেতে না যেতেই আবার গোলাগুলি শুরু হয়ে গেল। মিসেস ফান ডান সঙ্গে সঙ্গে সটান লাফিয়ে উঠলেন এবং স্বামীর সাহচর্যে শান্তি না পেয়ে তিনি হাড় জুড়োবার জন্যে নিচের তলায় মিস্টার ডুসেলের ঘরে চলে এলেন। ডুসেল তাঁকে 'এসো বাছা, আমার কাছে শোও' বলে আপ্যায়ন করায় আমরা আর হাসি চেপে রাখতে পারলাম না। কামানের গর্জন আর আমাদের বিচলিত করল না, আমাদের ভয় তখন চলে গেছে।

তোমার আনা।

রবিবার, ১৩ জুন, ১৯৪৩

আদরের কিটি,

আমার জন্মদিন উপলক্ষে বাপির লেখা কবিতাটি এত সুন্দর যে তোমাকে না শুনিয়ে পারছি না। পিম সাধারণত পদ্য লেখেন জার্মান ভাষায়, মারগট নিজে যেচে তার অনুবাদ করেছে। মারগটের অনুবাদ খোলতাই হয়েছে কিনা তুমি নিয়ে বুঝে দেখ। বছরের ঘটনাবলীর একটা সংক্ষিপ্তসার দেওয়ার পর, কবিতায় বলা হচ্ছে–

এখানে কনিষ্ঠ বটে, ছোট নও এখনও তা বল
জীবন অতিষ্ঠ তবু, যে কারণে সমান সকলে
গুরু বনে গিয়ে কানে মন্ত্র দিতে চায় এই মতো–
আমরা ঝানু, জেনে নাও কত ধানে চাল হয় কত।
এসব করেছি আগে, সুতরাং আমরা সব জানি।
বড়দা সদাই ভালো, জেনো এই মহাজনবাণী।
জীবনের শুরু থেকে এই হল নিয়ম, অন্তত–
চোখেই পড়ে না দোষ নিজেদের, এত ছোট ছোট।
ফলে, খুব স্বচ্ছন্দেই দেওয়া যায় অন্যদের গাল,
অন্যদের ত্রুটিগুলো হয়ে ওঠে তিল থেকে তাল।
আমরা হই মাতাপিতা, আমাদের ওপর চ'টো না।
তোমাকে দরদ দিয়ে ন্যায্য ভাবে করি বিবেচনা।
সংশোধন মেনে নিও মাঝে মাঝে, হোক অনিচ্ছায়
যদ্যপি তোমার মনে হবে তেতো বড়ি গেলো প্রায়।
এটাই প্রশস্ত বলে জেনো যদি শান্তি রাখতে হয়।
যদ্দিন ভোগান্তি আছে করে যেতে হবে কালক্ষয়।
বই মুখে করে বসে পড়ো তুমি সারাদিন প্রায়
এভাবে বেঁচেছে এই পৃথিবীতে কে কবে কোথায়?
কিছুতে বিরক্তি নেই, স্নিগ্ধ হাওয়া আনো তুমি নিজে
তোমার একমাত্র খেদ, 'গায়ে দিই কী যে!
আমার নিকার নেই, পরিধেয় সমস্তই টেঁটি
গেঞ্জিতে বাঁচে না লজ্জা, হায় হায়, কী করে যে বেটি!
জুতো পায়ে দিতে গেলে কাটতে হয় পায়ের আঙুল,
ভেবে ভেবে সোনামণি পাই না যে কূল।'

এই সঙ্গে খাবারের বিষয়ে কিছুটা ছিল। মারগট তা ছন্দে তর্জমা করতে পারেনি বলে এখানে আমি আর সেটা তুলে দিলাম না। তোমার কি মনে হয় না যে, আমার জন্মদিনের কবিতাটা খাসা হয়েছে? আরও নানাভাবে একদম আমার মাথা খাওয়া হয়েছে এবং অনেক সুন্দর সুন্দর জিনিস পেয়েছি। অন্যান্য জিনিসের মধ্যে পেয়েছি আমার প্রিয় বিষয়– গ্রীস আর রোমের পুরাণ সংক্রান্ত একটা মোটা বই। মিঠাই যে কম পেয়েছি তা বলার উপায় নেই– প্রত্যেকেই তাদের বাঁচানো শেষ ভাগটুকু আমাকে উজাড় করে দিয়েছে। অজ্ঞাতবাসে থাকা পরিবারের বেঞ্জামিন হিসেবে আমি সত্যিই আমার পাওনার বেশি খাতির পেয়েছি।

তোমার আনা।

মঙ্গলবার, ১৫ জুন, ১৯৪৩

আদরের কিটি,

অনেক কিছু ঘটে গেছে। কিন্তু অনেক সময়ই আমি ভাবি যে, আমার একঘেয়ে বকবকানি তোমার বিরক্তিকর ঠেকে এবং খুব বেশি চিঠি না পেলেই তুমি খুশি হও। আমি তোমাকে সংক্ষিপ্ত খবরাখবর দেব।

ডুওডেনাল আলসারের দরুন ফোসেনের যে অস্ত্রোপচার হওয়ার কথা ছিল তা হয়নি। যখন তাঁকে অস্ত্রোপ্রচারের টেবিলে শোয়ানো হয় তখন তাঁর পেট খুলে কানসার ধর পড়ে। ক্যানসার তখন এতই এগিয়েছে যে তখন আর অস্ত্রোপচারে কিছু হওয়ার নয়। সুতরাং পেট সেলাই করে ভাল পথ্য দিয়ে তিন সপ্তাহ শুইয়ে রাখার পর শেষ পর্যন্ত তাঁকে বাড়িতে ফেরত পাঠানো হয়। ওঁর জন্যে আমার খুব কষ্ট হয় এবং আমরা বাইরে যেতে পারি না বলে খুব বিচ্ছিরি লাগে, কেননা সেক্ষেত্রে প্রায়ই ওঁর সঙ্গে দেখা করে নিশ্চয়ই ওঁর মনটা প্রফুল্ল রাখার চেষ্টা করতাম।

আমাদের এটা দারুণ দুর্ভাগ্য যে, কোথায় কী ঘটছে এবং আড়ত ঘরে ওর কী কী জিনিস আছে তা কানে আসছে এ সম্বন্ধে আমাদের বহু দিনের চেনা মানুষ ফোসেন আর আমাদের অবহিত করতে পারবেন না। উনি আমাদের সবচেয়ে বড় সহায়ক এবং নিরাপত্তা সংক্রান্ত পরামর্শদাতা ছিলেন। আমরা ওর প্রচণ্ড অভাব অনুভব করছি।

পরের মাসে আমাদের রেডিওটা হাত বদল করার কথা। কৃপহুইসের বাড়িতে একটা এইটুকু রেডিও-সেট আছে; আমাদের ঢাউস ফিলিপ্সের বদলে সেইটা উনি আমাদের দেবেন। আমাদের চমৎকার সেটটা দিয়ে দিতে হবে ভেবে বিশ্রী লাগছে; কিন্তু যে বাড়িতে লোকে গা ঢাকা দিয়ে আছে, সেখানে কোনো অবস্থাতেই এমন বেয়াড়া ঝুঁকি নেওয়া যায় না যাতে কর্তাব্যক্তিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে। ছোট্ট রেডিওটা আমরা ওপরে নিয়ে গিয়ে রাখব। লুকোনো ইহুদী, লুকোনো টাকা আর লুকিয়ে কেনাকাটার ওপর যোগ হবে একটা লুকোনো রেডিও। 'বল-ভরসার উৎসটা' না দিয়ে প্রত্যেক চেষ্টা করছে একটা পুরানো সেট যোগাড় করে সেটা হস্তান্তর করতে। এটা ঠিক যে বহির্জগতের খবর দিন দিন যে রকম খারাপ হচ্ছে, তাতে এই রেডিও সাহায্য করছে তার আশ্চর্য কণ্ঠস্বর দিয়ে আমাদের মনোবল বাঁচিয়ে রাখতে এবং একথা ফিরে ফিরে বলতে– 'ঘাড় উঁচু করে রাখো, দাঁতে দাঁত দিয়ে থেকে চালিয়ে যাও, সুদিন আসবেই আসবে।'

তোমার আনা।

রবিরার, ১১ জুলাই, ১৯৪৩

আদরের কিটি,

এই নিয়ে যে কতবার 'মানুষ করা'র প্রসঙ্গে আসব তার লেখাজোখা নেই। কিন্তু তার আগে তোমাকে বলা দরকার যে, আমি এখন সত্যিই চেষ্টা করছি ভালো মেয়ে এবং বন্ধুভাবাপন্ন হয়ে সবাইকে সব কাজে সাহায্য করতে এবং আমার সাধ্যমত সব কিছু করতে যাতে দাঁত ঝাড়া দেওয়ার তুমুল বর্ষণের ধার কমে সেটা ইল্‌সেগুঁড়িতে এসে ঠেকে। যে লোকগুলো তোমার অসহ্য, তাদের সঙ্গে অমন আদর্শ ব্যবহার করে চলা খুবই কঠিন কাজ, বিশেষভাবে যখন তোমতর মনে এক আর মুখে আর এক। কিন্তু প্রকৃতই আমি দেখছি যে, একটু

ছলাকলার আশ্রয় নিতে পারলে মিলেমিশে থাকা সহজ হয়। আগে আমার স্বভাব ছিল উল্টো– সবাইকে আমি চ্যাটাং চ্যাটাং করে যা মনে হত বলতাম (যদিও কেউই কোনোদিন আমার মত জিজ্ঞেস করত না এবং আমার বক্তব্যের তারা কোন দামই দিত না)।

অনেক সময় আমার জ্ঞান থাকে না; কোনো একটা অবিচার দেখে হয়ত ফেটে পড়ি। ব্যস্‌ তারপর টানা চারটি সপ্তাহ ধরে সারাক্ষণ কানের কাছে ঘ্যানর ঘ্যানর শুনতে হয় যে, আমার মত ধিঙ্গি বেহায়া মেয়ে দুনিয়ায় দুটো নেই। তোমার কি মনে হয় না যে, মাঝে মাঝে আমার ক্ষাপার ন্যায্য কারণ থাকে? এটা ভালো যে, আমি সব সয় গজগজ করি না– কেননা তাতে মেজাজটা খিঁচিয়ে থাকে এবং একটুতেই রাগ হয়।

আমি ঠিক করেছি শর্টহ্যাণ্ড এখন কিছুদিন থাক; তাতে প্রথমত আমার অন্যান্য বিষয়গুলোতে আমি আরও বেশি সময় দিতে পারব এবং দ্বিতীয়ত আমার চোখের জন্যও বটে। খুব ক্ষীণদৃষ্টি হয়ে পড়ায় আমার অবস্থা খুবই কাহিল আর শোচনীয় হয়ে পড়েছে; অনেক আগেই আমার চশমা নেওয়া উচিত ছিল (উঃ, কী প্যাঁচার মতন আমাকে দেখাবে), কিন্তু তুমি তো জানো, অজ্ঞাতবাসে থেকে সেটা সম্ভব নয়। মা-মণি আমাকে মিসেস কুপহুইসের সঙ্গে চোখের ডাক্তারের কাছে পাঠানোর প্রস্তাব করায় কাল প্রত্যেকেই শুধু আমার চোখ নিয়ে কথা বলেছে। খবরটা শুনে আমি কিছুটা ডরিয়ে উঠেছিলাম, কেন না জিনিসটা ছেলেখেলা নয়। কল্পনা করো, বাড়ির বাইরে যাব, প্রকাশ্য রাস্তায়– ভাবা যায় না! গোড়ায় আমি থ' হয়ে গিয়েছিলাম, পরে আনন্দ হল। কিন্তু বললেই তো আর হয় না, এ ধরনের ব্যবস্থা করতে গেলে যাঁদের সম্মতি নিতে হয় তাঁরা চট করে একমত হতে পারলেন না। কী কী অসুবিধে এবং বিপদের ঝুঁকি আছে, আগে তা ভালো করে খতিয়ে দেখতে হবে; মিপ অবশ্য আমাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে এক পায়ে রাজি।

ইতিমধ্যে আমি আলমারি থেকে আমার ছাই-রঙের কোটটা বার করে ফেলেছি; কিন্তু সেটা এত খাটো যে দেখে মনে হয় আমার ছোট বোনের।

শেষ পর্যন্ত কী দাঁড়ায় দেখার জন্যে আমি মুখিয়ে আছি। তবে মতলবটা খাটবে বলে আমার মনে হয় না; কারণ, বৃটিশরা এখন সিঁচিলিতে অবতরণ করেছে এবং বাপি আবারও আশা করছেন লড়াই 'চটপট হতে' হবে।

আমাকে আর মা-মণিকে একগাদা অফিসের কাজ দিয়েছেন এলি; এতে আমাদের দুজনেরই যেমন বেশ একটু পায়াভারী ঠেকছে, তেমনি এলির কাজেও যথেষ্ট সাহায্য হচ্ছে। চিঠিচাপাটি ফাইলবন্দী করতে এবং বিক্রির হিসেব লিখতে যে কেউ পারে, তবে আমরা সে কাজ বিশেষ রকম গা লাগিয়ে করি।

মিপ যেন ঠিক ধোপার গাধা, কত কী যে যোগাড়-যন্ত্র করে তাঁকে বয়ে আনতে হয়। প্রায় প্রত্যেক দিনই আমাদের জন্য কিছু না কিছু সব্জী মিপ এখান-সেখান থেকে জুটিয়ে আনেন এবং সমস্তটাই আনেন বাজারের থলিতে পুরে ওঁর সাইকেলে। আমরা সারা সপ্তাহ শনিবারের জন্যে হাপিত্যেশ করে বসে থাকি; সেদিন আমাদের বই আসে। ঠিক যেমন ছোট ছেলেমেয়েরা উৎসুক হয়ে থাকে উপহারের জন্যে।

আমরা যারা এখানে বন্ধ হয়ে আছি, আমাদের কাছে বই যে কী জিনিস তা সাধারণ লোকের মাথাতেই ঢুকবে না। পড়া, জানা আর রেডিও শোনা– আমাদের কাছে আমোদ-প্রমোদ বলতে এই সব।

তোমার আনা।

মঙ্গলবার, ১৩ জুলাই, ১৯৪৩

আদরের কিটি,

বাপির মত নিয়ে, কাল বিকেলে আমি ডুসেলকে জিজ্ঞেস করেছিলাম উনি অনুগ্রহ করে (ভদ্রলোক যেহেতু খুবই শিষ্ট) আমাদের ঘরের ছোট টেবিলটা হপ্তায় দুদিন বিকেলবেলায় চারটে থেকে সাড়ে পাঁচটা আমাকে একটু ব্যবহার করতে দেবেন কি? ডুসেল যখন ঘুমোন, তখন রোজ আড়াইটে থেকে চারটে আমি টেবিলে গিয়ে বসি, তবে তা নইলে টেবিল সমেত ঘরটা আমার অধিকারের বাইরে। ভেতর দিকে, আমাদের বারোয়ারী যে ঘর, সেখানে বড় বেশি হৈ-হট্টগোল; সেখানে বসে কাজ করা অসম্ভব। তাছাড়া বাপি লেখার টেবিলটাতে বসতে চান এবং মাঝে মাঝে কাজও করেন।

সুতরাং অনুরোধটা ছিল যথেষ্ট যুক্তিসঙ্গত এবং প্রশ্নটা করা হয়েছিল খুবই সবিনয়ে। সত্যি, তুমি ভাবতে আরো তখন পণ্ডিত ডুসেল কী উত্তর দিলেন? উনি বললেন, 'না।' সোজা সিধে কথায়– 'না'। আমার খুব রাগ হল এবং অত সহজে দমে যেতে রাজী হলাম না। সুতরাং আমি ওঁর 'না' বলার কারণ জানতে চাইলাম। কিন্তু ওঁর কথা শুনে আমার কানের মধ্যে ভোঁ ভোঁ করতে লাগল। ওঁর আর আমার মধ্যে এই মর্মে খুব একচোট হয়ে গেল–

'আমাকেও কাজ করতে হবে, আর আমি বিকেলগুলোতে কাজ করতে না পারলে আমার আর কোনো সময়ই থাকছে না। হাতের কাজ আমাকে শেষ করতেই হবে, নইলে শুরু করারই আর কোনো মানে থাকে না। যাই হোক, তুমি এমন কিছু কাজের কাজ করো না। তোমার পৌরাণিক উপাখ্যান, ওটা আবার কেমন ধারা কাজ। বোনা আর পড়া কোনোটাই কাজ নয়। আমি টেবিলে বসে আছি, বসেই থাকব।'

আমার উত্তর হল– 'মিস্টার ডুসেল, আমি যেটা করি সেটা কাজের কাজ এবং বিকেলে আর কোথাও বসে আমার কাজ করার জায়গা নেই। আপনাকে আমি ব্যগ্রতা করছি, আমার অনুরোধের কথাটা আপনি আবার ভেবে দেখুন।'

এই বলে মনঃক্ষুণ্ণ আমি সেই ডাক্তার পণ্ডিতের দিকে পেছন ফিরে দাঁড়াই, তাঁকে আদৌ গ্রাহ্যের মধ্যে না এনে। আমি তখন রাগে ফুলছি এবং ভাবছি ডুসেল কী সাংঘাতিক অভদ্র মানুষ (নিশ্চয়ই উনি তাই) আর আমি কী অমায়িক।

সন্ধ্যেবেলা পিম্‌কে ধরতে পেরে তাঁকে বললাম কি ভাবে ব্যাপারটা কেঁচে গেছে এবং এরপর আমি কী করব সে বিষয়ে আলোচনা করলাম, কেননা আমি সহজে ছাড়ছি না। বললাম এর ফয়সালা আমি নিজেই করতে চাই।

পিম্ আমাকে বলে দিলেন কিভাবে ব্যাপারটা সামলাতে হবে; সেই সঙ্গে আমাকে পই পই করে বললেন কাল পর্যন্ত ব্যাপারটা আমি যেন ঝুলিয়ে রাখি, কেননা আজ আমি খুবই তেতে আছি। আমি এই উপদেশ চুলোয় যেতে দিয়ে বাসন ধোয়া শেষ করে ডুসেলের জন্যে অপেক্ষা করে থাকলাম।

আমাদের ঠিক পাশের ঘরেই পিম্ বসে ছিলেন, নিজেকে ঠাণ্ডা রাখতে সেটা আমাকে সাহায্য করেছিল। আমি বলা শুরু করলাম– মিস্টার ডুসেল, আপনি বোধহয় মনে করেন না ব্যাপারটা নিয়ে আর কথা বলে কোনো লাভ আছে, কিন্তু আপনাকে আমি বলব আবার ভেবে দেখতে।' ডুসেল তখন ওঁর মুখে মধুরতম হাসি ফুটিয়ে বললেন– 'এ নিয়ে আলোচনা করতে আমি যখন তখন যে কোনো সময়েই রাজী, কিন্তু ঠিক যা হবার তা তো হয়েই গেছে।'

ডুসেলের অনবরত কথার মধ্যে কথা বলা সত্ত্বেও আমি বকে চললাম– 'আপনি প্রথম

যখন এখানে এলেন তখন আমরা ঠিক করেছিলাম ঘরটা হবে আমাদের দুজনার, আমরা যদি ন্যায্য ভাবে নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিতাম, তাহলে সকালটা পেতেন আপনি আর আমি পেতাম বিকেলটা পুরোপুরি। কিন্তু আমি অতখানিও চাইছি না। আমি মনে করি, সত্যি আমার দুটো বিকেলের দাবি সম্পূর্ণভাবে ন্যায়সঙ্গত।' এ কথায় ডুসেল একেবারে লাফ দিয়ে উঠলেন, কেউ যেন তাঁর গায়ে ছুঁচ ফুটিয়ে দিয়েছে। 'এখানে তুমি তোমার অধিকারের কথা বলতেই পারো না।

এখন কোথায় যাব আমি তাহলে? মিস্টার ফান ডানকে গিয়ে আমি জিজ্ঞেস করব চিলেকোঠায় উনি আমার জন্যে একটা ছোট্ট কুঠুরি বানিয়ে দেবেন কিনা। আমি তাহলে সেখানে গিয়ে বসতে পারি। আমি যেখানে-সেখানে বসে কাজই করতে পারি না। তোমাকে নিয়ে সবাইকেই গোলমালে পড়তে হয়। তোমার দিদি মারগট, ওর বরং ঢের বেশি যুক্তি আছে চাইবার– মারগট যদি ঐ সমস্যা নিয়ে আমার কাছে আসত, আমি তাকে ফিরিয়ে দেওয়ার কথা ভাবতাম না, কিন্তু তুমি, তোমার সঙ্গে কোনো কথাই চলে না। তুমি এমন যাচ্ছেতাই রকমের একালষেঁড়ে, নিজে তুমি যেটা চাও সেটা পাওয়ার জন্যে আর সবাইকে কোণঠাসা করতে তোমার কিছু বাধে না, এরকম দুরন্ত বাচ্চা আমি কখনও দেখিনি। তবে সবকিছু সত্ত্বেও, আমাকে বোধহয় তোমার আবদার বাধ্য হয়ে মেনে নিতে হবে, কেননা তা না হলে পরে আমাকে শুনতে হবে যে, আনা ফ্রাঙ্ক পরীক্ষায় ফেল করেছে তার কারণ মিস্টার ডুসেল তাকে টেবিল ছেড়ে দিতে চাননি?'

এইভাবে অনেকক্ষণ ঝিরঝিরিয়ে চলার পর এমন তোড়ে শুরু হল যে আমি আর তার সঙ্গে তাল রাখতে পাররাম না। একটা সময়ে আমার মনে হল, 'এখুনি ওর মুখে এমন একটা কষে মারবো যে, মিথ্যের ঝুড়ি নিয়ে উড়ে লোকটা মট্‌কায় গিয়ে ঠেকবে।' কিন্তু পরক্ষণেই নিজেকে বললাম, 'শান্ত হয়ে থাকো! মশা মেরে হাত নষ্ট করার কোন মানে হয় না।'

শেষবারের মতন প্রচণ্ড ভাবে গায়ের ঝাল ঝেড়ে মিস্টার ডুসেল ক্রোধ আর জয়ের মিশ্রিত ভাব মুখে ফুটিয়ে পকেটে-খাবার-ঠাসা কোট গায়ে দিয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন। আমি এক ছুটে বাপিকে গিয়ে ওঁর না-শোনা বাকি কাহিনীটা বললাম। পিম্ ঠিক করলেন সেইদিন সন্ধ্যেবেলাতেই ডুসেলের সঙ্গে তিনি কথা বলবেন।

কথা তিনি বলেছিলেন। আধঘণ্টার বেশি তাঁদের কথা হয়। ওঁদের কথার বিষয়বস্তু ছিল অনেকটা এই রকম– আনা টেবিলে বসবে কি বসবে না এটার একটা হেস্তনেস্ত করতে গোড়ায় কথা হয়।

বাপি বললেন ডুসেলের সঙ্গে উনি একমত– ছোটদের সামনে ডুসেলকে অন্যায্য প্রতিপন্ন করতে তখন তিনি চাননি।

তবে তখন ডুসেল ঠিক করছেন বলে ওঁর মনে হয়নি। ডুসেল বলেছিলেন আমার এমন ভাবে কথা বলা উচিত নয় যাতে মনে হয় ডুসেল যেন উড়ে এসে জুড়ে বসেছেন এবং সবকিছু নিজের কুক্ষিগত করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু বাপি এ ব্যাপারে খুবই কড়াভাবে আমার পক্ষ নেন, কারণ আমি যে ও-ধরনের কোন কথাই বলিনি সেটা উনি স্বকর্ণে শুনেছিলেন।

একবার উনি বলেন তো একবার ইনি বলেন, এই ভাবে চলল। বাপি আমার স্বার্থপরতা আর 'তুচ্ছ' কাজ সংক্রান্ত কথার জবাব দেন, ডুসেল সমানে গজগজ করতে থাকেন।

শেষ পর্যন্ত ডুসেলকে অতঃপর হার মানতে হর, এবং সপ্তাহে দুটো করে বিকেল আমি পাঁচটা পর্যন্ত অবাধে কাজ করার সুযোগ পেলাম। ডুসেল আমার দিকে নাক সিটকে তাকান,

দুদিন আমার সঙ্গে কথা বলা বন্ধ করে দেন এবং তাও পাঁচটা থেকে সাড়ে পাঁচটা টেবিলে সেঁটে বসেন। চূড়ান্ত রকমের ছেলেমানুষি ব্যাপার।

চুয়ান্ন বছর বয়স হয়েছে, কী পাণ্ডিত্যের ভান আর কুচুটে মন! লোকটার স্বভাবই ঐরকম। ও স্বভাব শোধরাবার নয়।

তোমার আনা।

শুক্রবার, ১৬ জুলাই, ১৯৪৩

আদরের কিটি,

আবার সিঁদেল চোর। কিন্তু এবারেরটা সত্যিকার। আজ সকালে রোজকার মতন সাতটায় পেটার গিয়েছিল গুদামে এবং তৎক্ষণাৎ ওর নজরে পড়ে গুদামের দরজা আর রাস্তার ধারের দরজা হাট করে খোলা। পিম্‌কে গিয়ে ও বলে। পিম্ তখন খাসকামরার রেডিও কাঁটা জার্মানির দিকে ঘুরিয়ে রেখে দরজাটা তালাবদ্ধ করেন। তারপর দুজনে মিলে যান ওপরতলায়।

এইসব ক্ষেত্রের জন্যে যেসব চিরাচরিত নিয়ম আছে সেগুলো যথারীতি পালন করা হয়–পানির কোনো কল খোলা নয়; সুতরাং কোনো কাচাকাচি নয়, কোনো শব্দ নয়, আটটার মধ্যে সব চুকিয়ে ফেলতে হবে এবং পায়খানা বন্ধ।

এটা ভেবে আমার খুশি যে এমন অঘোরে আমরা ঘুমিয়েছি যে, কিছুই আমাদের কানে যায়নি। সাড়ে এগারোটার আগে আমরা কিছু জানতে পারিনি। ঐ সময় মিস্টার কুপহুইসের কাছে আমরা জানলাম যে সিঁদেল-চোররা শিক গলিয়ে দিয়ে বাইরের দরজাটা ঠেলে ভেতরে ঢুকিয়ে তারপর গুদামের দরজাটা ভাঙে।

যাই হোক, সেখানে চুরি করার মত খুব বেশি কিছু না পেয়ে ভাগ্য পরীক্ষার জন্যে যায় ওপরতলায়। সেখানে তারা চুরি করে চল্লিশ ফ্লোরিন সমেত দুটো ক্যাশবাক্স, কিছু পোস্টাল অর্ডার আর চেক বই। এবং তাছাড়া, সবচেয়ে খারাপ হল, ১৫০ কিলো চিনির সব কটা কুপন।

মিস্টার কুপহুইসের ধারণা, ছ'সপ্তাহ আগে যে দলটা পর পর তিনটে দরজা ভাঙার চেষ্টা করেছিল, এরা সেই দলেরই লোক। তখন তারা না পেয়ে ফিরে গিয়েছিল।

বাড়িটাতে এ নিয়ে বেশ হৈ-চৈ পড়ে গেছে। তবে এই ধরনের চাঞ্চল্য ছাড়া 'গুপ্ত মহলে'র চলতে পারে বলে মনে হয় না। আমাদের জামাকাপড়ের আলমারিতে রোজ সন্ধ্যেবেলায় যে সব টাইপরাইটার আর টাকাকড়ি তুলে এনে রাখা হয় তাতে হাত পড়েনি দেখে আমরা খুব খুশি।

তোমার আনা

সোমবার, ১৯ জুলাই, ১৯৪৩

আদরের কিটি,

রবিবার উত্তর আমস্টার্ডামে প্রচণ্ড বোমাবর্ষণ হয়েছে। মনে হয়, ক্ষয়ক্ষতি যা হয়েছে তা সাংঘাতিক। রাস্তা-কে রাস্তা ধ্বংসস্তূপে চাপা পড়েছে। সমস্ত লোককে খুঁড়ে বের করতে প্রচুর সময় লাগবে। এ পর্যন্ত মৃতের সংখ্যা দুশো আর আহতের কোনো ইয়ত্তা নেই; হাসপাতালগুলোতে তিল ধারণের জায়গা নেই। শোনা যায়, মা-বাবাকে খুঁজতে গিয়ে

বাচ্চারা ধুমায়মান ধ্বংসস্তূপে নিখোঁজ হয়েছে। দূরে চাপা গুনগুন গুড়গুড় আওয়াজের কথা মনে হলেই শিউরে উঠি, আমাদের কাছে সেটা আসন্ন ধ্বংসের লক্ষণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

তোমার আনা।

শুক্রবার, জুলাই ২৩, ১৯৪৩

আদরের কিটি,

নিছক তামাশা। সেই হিসেবেই তোমাকে বলব আমাদের প্রত্যেকের প্রথম কী ইচ্ছে যখন আমরা এখান থেকে বাইরে যেতে পারব। মারগট আর মিস্টার ফান ডানের ইচ্ছে সবকিছুর আগে উপচানো গরম পানিতে গোসল এবং আধ ঘণ্টা ধরে তাতে গা ডুবিয়ে রাখা। মিসেস ফান ডান চান সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে গিয়ে আগে ক্রিমকেক খেতে, ডুসেল তাঁর স্ত্রী রোডিয়েকে দেখার কথা ছাড়া আর কিছু ভাবেন না; মা-মণি চান জমিয়ে এক কাপ কফি; বাপি প্রথমেই যাবেন মিস্টার ফসেনকে দেখতে; পেটার চায় সেই শহর আর একটা সিনেমা। অন্যদিকে বেরোবার কথায় প্রাণে আমি যে কী শান্তি পাই, অথচ কোথা থেকে শুরু করব আমি জানি না! তবে আমি সবচেয়ে বেশি করে চাই নিজেদের একটা বাড়ি, চাই ইচ্ছেমত ঘুরে বেড়াবার স্বাধীনতা এবং শেষ অবধি আমরা কাজে ফিরে পেতে চাই কিছুটা সাহায্য অর্থাৎ-ইস্কুল।

এলি নিজে থেকে বলেছেন আমাদের জন্যে কিছু ফলমূল যোগাড় করে আনবেন। প্রায় পানির দাম– গ্রেপফল কিলোপ্রতি ৫.০০ ফে, গুজ্‌বেরি পাউণ্ড প্রতি ০.৭০ ফে, একটি পিচ্‌ফল ০.৫০ ফে, এক কিলো ফুটি ১.৬০ ফে। (ডলারে যথাক্রমে আনুমানিক ১.৪০ ড, একুশ সেন্ট, চৌদ্দ সেন্ট এবং বিয়াল্লিশ সেন্টের সমতুল্য)। তবে খবরের কাগজগুলোতে প্রতি সন্ধ্যাতেই দেখবে বড় বড় অক্ষরে লেখা হয়েছে ঃ 'ন্যায্য পথে চলো এবং দাম কমের মধ্যে রাখো।'

তোমার আনা।

সোমবার, ২৬ জুলাই, ১৯৪৩

আদরের কিটি,

গতকাল গেছে শুধু হট্টগোল আর হৈচৈ-এ; আমরা এখনও গোটা ব্যাপারটা নিয়ে বেশ তেতে আছি। তুমি অবশ্য বলতেই পারো, কিছু না কিছু উত্তেজনা ছাড়া কোন্ দিনই বা তোমাদের যায়? আমরা যখন প্রাতরাশে বসেছি সেই সময় প্রথম হুঁশিয়ারী সাইরেন বেজে ওঠে, তবে আমরা আদৌ ওর কোনো মুল্য দিই না; প্লেনগুলো উপকূল ভাগ পার হয়ে এল ওতে শুধু এইটুকুই বোঝায়।

মাথাটা খুব ধরেছিল বলে প্রাতরাশের পর আমি গিয়ে ঘণ্টাখানেক বিছানায় গড়াই। তারপর নিচের তলায় আসি। ঘড়িতে তখন প্রায় দুটো। মারগট তার অফিসের কাজ শেষ করে আড়াইটের সময়; জিনিসপত্র সে এক সঙ্গে মুড়ে রাখতে না রাখতে সাইরেন বাজতে শুরু করে দেয়, সুতরাং আমি আবার ওর সঙ্গে ওপরে উঠে আসি। ওপর তলায় আমরা এসেছি আর তার পাঁচ মিনিটের মধ্যে ওরা তুমুল গোলাগুলি ছোঁড়া শুরু করে দেয়। এত বেশি মাত্রায় শুরু হয়ে যায় যে, আমাদের সরে গিয়ে যাতায়াতের গলিতে গিয়ে দাঁড়াতে হয়। আর হ্যাঁ, বাড়িটা তখন গুড়গুড় শব্দে কাঁপছে আর সেই সঙ্গে নেমে আসছে বৃষ্টির মত বোমা।

একটা ধরবার কিছু চাই বলে আমি আমার 'সট্‌কান-দেওয়ার ব্যাগ'টা বুকে জড়িয়ে বসে আছি, পালাবার কথা ভেবে নয়, কেননা যাবার তো আর কোনো জায়গাই নেই। অবস্থা চরমে উঠলে আমাদের যদি এখান থেকে কখনও পালাতেই হয়, রাস্তা হবে ঠিক বিমান-হানার মতই বিপজ্জনক। এবারেরটা থিতিয়ে গেল আধ ঘণ্টা বাদে, কিন্তু বাড়ির মধ্যেকার ক্রিয়াকলাপ তাতে বেড়ে গেল। চিলেকোঠায় তার চৌকি দেওয়ার জায়গাটা থেকে পেটার নিচে নেমে এল।

ডুসেল ছিলেন সদর দপ্তরে; মিসেস ফান ডান নিজেকে নিরাপদ বোধ করেছিলেন খাসকামরায়। মিস্টার ফান ডান নজর রাখছিলেন ঘুলঘুলি থেকে। আমরা যারা ছোট দালানে ছিলাম, আমরাও ছড়িয়ে ছিটিয়ে গেলাম। বন্দরের মাথায় যে সব ধোঁয়ার কুণ্ডলী ওঠার কথা মিস্টার ফান ডান আমাদের বলেছিলেন, তা দেখবার জন্যে আমি ওপরে উঠলাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই পোড়ার গন্ধ পাওয়া গেল; বাইরেটা দেখে মনে হচ্ছিল যেন কুয়াশার একটা মোটা পর্দা সমস্ত জায়গাটা জুড়ে ঝুলছে।

ঐ ধরনের বিরাট অগ্নিকুণ্ডের দৃশ্য খুব সুখকর নয়, তবে সৌভাগ্যক্রমে আমাদের দিক থেকে ব্যাপারটার ঐখানেই ইতি ঘটে, এবং তারপর আমরা যে যার কাজে লেগে যাই। ঐদিন সন্ধ্যেবেলায় নৈশ আহারে বসতেই আবার বিমান-হানার হুঁশিয়ারি। খাবারটা বেশ ভালো ছিল, কিন্তু সাইরেনের শব্দ কানে যেতেই ক্ষিধে আমার মাথায় উঠল। কিছুই ঘটল না এবং তিন কোয়ার্টার পরেই বিপদ কেটে যাওয়ার সঙ্কেত হল। বাসনকোসন মাজার জন্যে সবে ডাঁই করা হয়েছে, অমনি বিমান-হানার হুঁশিযারি, বিমান-বিধ্বংসী কামানের গোলা, আসছে তো আসছেই গাদাগুচ্ছের প্লেন। আমরা সবাই মনে মনে বলছি, 'রক্ষে করো, দিনে দুবার, বড্ড বেশি হয়ে যাচ্ছে,' কিন্তু বলে কোনই ফল হল না।

এবারও বোমা পড়ল মুষলধারে, এবারে অন্য দিকে। ব্রিটিশদের ভাষ্য অনুযায়ী, পিপল-এর (আমস্টার্ডামের বিমানবন্দর) ওপর। প্লেনগুলো গোঁত্তা মেরে নেমে তারপর আকাশে চড়াও হচ্ছিল, আমরা ইঞ্জিনের গুঞ্জন শুনতে পাচ্ছিলাম, শব্দটা কী বিকট! প্রতি মুহূর্তে আমি ভাবছিলাম– 'এইবার একটা বই পড়ল। ঐ আসছে।'

জেনে রাখো, নটার সময় যখন আমি শুতে গেলাম আমার পা দুটোকে কিছুতেই আমি বশে রাখতে পারছি না। আমার ঘুম ভেঙে গেল তখন কাঁটায় কাঁটায় বারোটা– ঝাঁকে ঝাঁকে প্লেন।

ডুসেল কাপড় ছাড়ছিলেন। আমি সেসব না মেনে, গোলাগুলির প্রথম শব্দেই, বিছানা থেকে তড়াক করে লাফ দিলাম। আমার তখন ঘুমের দফারফা। বাপির কাছে দুই ঘণ্টা ছিলাম, তবু প্লেন আসছে তো আসছেই। তারপর গোলাগুলি বন্ধ হতে তখন আমি শুতে যেতে পরলাম। আমার ঘুম এল আড়াইটেয়।

ঘড়িতে সাতটা। আমি ধড়মড়িয়ে উঠে বসলাম। মিস্টার ফান ডান আর বাপির মধ্যে কী কথা হচ্ছে। আমার প্রথমেই মনে হল সিঁদেল-চোর। মিস্টার ফান ডানকে বলতে শুনলাম 'সব কিছু'। আমি ভাবলাম সর্বস্ব চুরি হয়ে গেছে। কিন্তু তা নয়, এবার দারুণ খবর; মাসের পর মাস কেন, বোধ হয় সারা যুদ্ধের বছরগুলোতেই এত ভালো খবর আমরা শুনিনি। 'মুসোলিনি ইস্তফা দিয়েছে, ইতালির রাজা সরকার হাতে নিয়েছে।' আমরা আনন্দে লাফাতে লাগলাম। কাল ঐ ভয়ঙ্কর রকমের দিন যাবার পর, শেষ অবধি আবার ভালো কিছু এবং আশা। এর শেষ হবে, এই আশা। যুদ্ধ মিটে গিয়ে শান্তি আসবে, এই আশা।

ক্রালার এসেছিলেন। উনি আমাদের বললেন ফোক্কার কারখানার সাংঘাতিক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। ইতিমধ্যে আমাদের মাথার ওপর দিয়ে প্লেন উড়ে যাওয়ায় আরেকটি বিমান-হামলার হুঁশিয়ারি হয়েছে এবং আরও একবার সাইরেন বেজেছে। হুঁশিয়ারিতে হুঁশিয়ারিতে আমাদের যেন দম বন্ধ হয়ে আসছে, বেজায় ক্লান্ত লাগছে এবং হাত পা নাড়তে ইচ্ছে করছে না। কিন্তু এখন ইতালির বুকে অনিশ্চয়তা এই আশা জাগিয়ে তুলবে যে, অচিরে এর অবসান হবে, হয়ত এমন কি এই বছরের মধ্যেই।

তোমার আনা।

বৃহস্পতিবার, ২৯ জুলাই, ১৯৪৩

আদরের কিটি,

মিসেস ফান ডান, ডুসেল আর আমি বাসনপত্র ধুচ্ছিলাম। আমি ছিলাম অসাধারণ রকমের চুপচাপ, সচরাচর যা হয় না। কাজেই ওঁরা নিশ্চয় সেটা লক্ষ্য করে থাকবেন।

গোলমাল এড়াবার জন্যে আমি তাড়াতাড়ি চাইলাম বেশ একটা নিরীহ গোছের প্রসঙ্গ তুলতে। ভাবলাম, 'অপর দিক থেকে হেনরী' বইটা আর উপযোগী হবে। কিন্তু আমার ভুল হল। মিসেস ফান ডানের হাত থেকে যদি বা ছাড়ান পাওয়া যায়, তো ডুসেল নাছোড়। ফলে, এই হল ব্যাপার– মিস্টার ডুসেল আমাদের বলেছিলেন, পড়ে দেখ, চমৎকার বই। মারগটের আর আমার আদৌ চমৎকার বলে মনে হয়নি। ছেলেটির চরিত্র সুন্দর ভাবে আঁকা হয়েছে, সন্দেহ নেই; কিন্তু বাকি সব– আমার উচিত ছিল সে সম্বন্ধে কিছু না বলা। বাসন ধুতে ধুতে ঐ প্রসঙ্গে কী যে বলে ফেলেছিলাম। আর যাবে কোথায়!

'মানুষের মনস্তত্ত্ব তুমি কী বুঝবে! বাচ্চারটা বোঝা শক্ত নয়(!)। ও-বই পড়বার এখনও তোমার বয়স হয়নি; কুড়ি বছরের একজন ধাড়িরও ও-বই মাথায় ঢুকবে না।' (তবে যে উনি মারগটকে আর আমাকে বিশেষ ভাবে সুপারিশ করে বলেছিলেন ও-বই পড়তে?) এবার ডুসেল আর মিসেস ফান ডান একজোট হয়ে শুরু করলেন– 'যা তোমার যোগ্য নয়, সেসব জিনিস সম্পর্কে তুমি অতিরিক্ত বেশি রকম জেনে বুঝে ফেলেছ। তোমাকে বেয়াড়া ভাবে মানুষ করা হয়েছে। পরে যখন তোমার বয়স বাড়বে, তখন কিছুতেই কোনো রস পাবে না, তুমি তখন বলবে, 'বিশ বছর আগেই ও আমি বইতে পড়েছি।' যদি তুমি বর চাও কিংবা প্রেমে পড়তে চাও বরং সেটা তাড়াতাড়ি করে ফেলো– নইলে পরে সব কিছুতেই তোমার আশা ভঙ্গ হবে। তত্ত্বের দিক থেকে ইতিমধ্যেই তুমি পেকে উঠেছ, এখন তোমার শুধু দরকার হাতে-কলমে সেটা ফলানো!'

আমার সঙ্গে আমার মা-বাবাকে লড়িয়ে দেওয়ার ওঁদের সব সময় যে চেষ্টা, বোধকরি সেটাই ওঁদের ভালোভাবে মানুষ হওয়ার ধারণা, কেননা প্রায়ই তাঁরা সেটা করে থাকেন। আর আমার বয়সী কোনো মেয়েকে 'সাবালক' বিষয় সম্পর্কে কিছু না বলা, তেমনি এও এক সুন্দর পদ্ধতি! এই জাতের মানুষ করার ফল তো হামেশাই চোখের ওপর দেখতে পাচ্ছি।

ওঁরা যখন ওখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমাকে অপদস্থ করছিলেন, সেই মুহূর্তে আমি ঠাস করে ওঁদের গালে চড় লাগিয়ে দিতে পারতাম। রাগে তখন আমার মাথায় রক্ত উঠে গিয়েছিল। আমি এখন দিন গুনছি কবে 'ওই সব' লোকের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাব।

মিসেস ফান ডান খাসা লোক! সুন্দর দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন উনি...করেন বৈকি– একেবারেই বদ দৃষ্টান্ত। ওঁকে সবাই জানে– উনি ঝালে-ঝোলে-অম্বলে, উনি স্বার্থপর, ধূর্ত,

হিসেবী এবং কিছুতেই উনি তুষ্ট নন। ঠেকার আর ছেনালি– তালিকায় এ দুটোও যোগ করতে পারি। উনি যে অকথ্য রকমের বিচ্ছিরি মানুষ তাতে কোনো সন্দেহ নেই। মহাশয়ার বিষয়ে আমি সাতকাণ্ড রামায়ণ লিখে ফেলতে পারি; কে জানে, হয়ত একদিন লিখেও ফেলব। যে কেউ তার বাইরেটাতে সুন্দর একপোঁচ রং লাগিয়ে নিতে পারে। বাইরের উটকো লোক এলে বিশেষ করে পুরুষ মানুষ, মিসেস ফান ডান ভারি অমায়িক ব্যবহার করেন; কাজেই ওঁকে কম সময়ের জন্যে দেখলে ওঁর সম্পর্কে সহজেই লোকে ভুল করে বসেন। মা-মণি মনে করেন ভদ্রমহিলা এতই নির্বোধ যে, ওঁর সম্পর্কে বাক্যব্যয় করা বৃথা, মারগট ওঁকে এলেবেলে লোক বলে মনে করে, পিম্ ওঁকে বলেন হতকুচ্ছিত (অভিধা ও ব্যঞ্জনা, দুই অর্থেই), এবং ওঁকে দীর্ঘকাল ধরে দেখে– কেননা একেবারে গোড়ায় ওঁর সম্পর্কে আমার কখনও কোনো জাতক্রোধ ছিল না– আমি এই সিদ্ধান্তে এসেছি যে, একাধারে উনি ঐ তিনটি তো বটেই, তদুপরি উনি আরও কিছু! ওর মধ্যে এত রকমের বদ্ গুণ যে, কোন্‌টা ছেড়ে কোন্‌টা দিয়ে শুরু করব?

তোমার আনা।

পুনশ্চ ঃ পাঠক কি এটা বিবেচনায় আনবেন যে, এই কাহিনী যখন লেখা হচ্ছিল তখনও লেখিকা রেগে টং হয়ে ছিলেন।

মঙ্গলবার, ৩ আগস্ট, ১৯৪৩

আদরের কিটি,

রাজনীতির খবর চমৎকার। ইতালিতে ফ্যাশিস্ট পার্টিকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। বহু জায়গায় লোকে ফ্যাশিস্টদের বিরুদ্ধে লড়ছে– এমন কি সৈন্যবাহিনীও এই লড়াইতে কার্যত যোগ দিয়েছে। এ রকম একটা দেশ কি ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে লড়াই চালাতে পারে?

এইমাত্র হাওয়াই হামলা হয়ে গেল, এই নিয়ে তিনবার; মনে সাহস আনার জন্যে আমি দাঁতে দাঁত দিয়ে ছিলাম। মিসেস ফান ডান, যিনি সবসময় বলে এসেছেন, 'একেবারেই শেষ না হওয়ার চেয়ে বরং ভয়ঙ্কর ভাবে শেষ হওয়া ভালো'– এখন দেখা যাচ্ছে, উনিই আমাদের মধ্যে সবচেয়ে কাপুরুষ। আজ সকালে উনি বাঁশপাতার মত তিরতির করে কাঁপছিলেন, এমন কি উনি ভ্যাঁ করে কেঁদেও ফেলেছিলেন। এক সপ্তাহ ধরে স্বামীর সঙ্গে চুলোচুলি ঝগড়া করার পর সদ্য উনি সেটা মিটিয়ে নিয়েছিলেন। ওঁর স্বামী যখন ওঁকে সান্ত্বনা দিচ্ছিলেন তখন একমাত্র ওঁর মুখের অবস্থা দেখে আমার মনটা প্রায় গলে গিয়েছিল।

মুশ্চি প্রমাণ করে দিয়েছে যে, বেড়াল পোষার সুফল আর কুফল দুই-ই আছে। সারা বাড়ি ডাঁশ মাছিতে ভরে গেছে। আর দিনকে দিন তার উৎপাত বাড়ছে। মিস্টার কুপহুইস হলুদ রঙের গুঁড়ো প্রত্যেক আনাচেকানাচে ছড়িয়ে দিয়েছেন বটে, কিন্তু ডাঁশমাছিগুলো সেসব আদৌ গায়ে মাখছে না। এতে আমরা খুবই ঘাবড়ে যাচ্ছি, মনে করা হচ্ছে হাতে পায়ে এবং শরীরের নানা অঙ্গপ্রত্যঙ্গে যেন বীজকুঁড়ি বীজকুঁড়ি বেরিয়েছে; তার ফলে, আমরা অনেকেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নানা রকম কসরত করছি যাতে ঘাড় বেঁকিয়ে বা পা উল্টে পেছন দিকটা দেখা যায়। সে রকম নমনীয় নই বলে এখন আমাদের তার দরুণ মাশুল গুনতে হচ্ছে– ঠিক ভাবে এমন কি এদিক ওদিক ফিরতে গেলেও ঘাড়টা শক্ত হয়ে থাকছে। প্রকৃত শরীরচর্চা ঢের আগেই ছেড়ে দিয়েছি।

তোমার আনা।

বুধবার, ৪ আগস্ট, ১৯৪৩

আদরের কিটি,

আজ এক বছরের ওপর হয়ে গেল আমরা এই 'গুপ্তমহলে' আছি; আমাদের জীবনের কিছু কিছু বৃত্তান্ত তুমি জানো, কিন্তু কিছু আছে যা একেবারে বর্ণনার অসাধ্য। বলবার মতো এত কিছু রয়েছে, সাধারণ সময়ের থেকে এবং সাধারণ মানুষের জীবনের থেকে সব কিছু এত তফাত। এ সত্ত্বেও, তুমি যাতে আমাদের জীবনগুলো আরেকটু কাছ থেকে দেখতে পাও, তার জন্যে তোমার সামনে আমি আমাদের একটা মামুলি দিনের ছবি থেকে থেকে তুলে ধরতে চাই। আজ আমি সন্ধ্যে আর রাতের কথা দিয়ে শুরু করছি।

সন্ধ্যে ন'টা। 'গুপ্তমহলে' শুতে যাওয়ার ব্যবস্থা শুরু হল এবং সব সময়ই এই নিয়ে রীতিমত একটা চক্কর বেঁধে যায়। চেয়ারগুলো এখানে সেখানে দুড়দাড় করে সরানো হয়, বিছানাগুলো টেনে নামানো হয়, কম্বলগুলোর ভাঁজ খোলা হয়, দিনের বেলার জিনিস কোনোটাই আর যেখানকার সেখানে থাকে না। ছোট ডিভানটাতে আমি শুই, দৈর্ঘ্যে সেটা দেড় মিটারের বেশি হবে না। কাজেই লম্বা করার জন্যে তার সঙ্গে একাধিক চেয়ার জুড়তে হয়। লেপ, চাদর, বালিশ, কম্বল সমস্তই দিনের বেলায় তোলা থাকে ডুসেলের খাটে; সেখান থেকে সেগুলো এনে নিতে হয়। পাশের ঘরে সাংঘাতিক ক্যাঁচর-কোঁচর শব্দ হয়; মারগটের ঐকতানিক খাটটি টেনে বের করা হচ্ছে। কাঠের পাটিগুলো আরেকটু বেশি আরামপ্রদ করার জন্যে আবার ডিভান, কম্বল আর বালিশ বিলকুল ওঠানো নামানো শুরু হয়ে যায়। মনে হয় যেন মাথার ওপর কড়্ কড়্ করে মেঘ ডাকছে; তা নয়, আসলে জিনিসটা মিসেস ফান ডানের খাট ছাড়া কিছু না। ওটাকে ঠেলে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে জানলার দিকে, বুঝলে, যাতে তরতাজা হাওয়ায় গোলাপী- শোয়ার জামা-পরা মহামান্য রানীসাহেবার সুদর্শন নাসারন্ধ্রে সুড়সুড়ি দেওয়া যায়।

পেটারের হয়ে গেলে আমি গিয়ে ঢুকি কলঘরে; আপাদমস্তক ধোয়ামোছা করি এবং তারপর সাধারণভাবে প্রসাধন করি। কখনও কখনও এমনও হয় (কেবল তেতে-ওঠা সপ্তাহ বা মাসগুলোতে) যে, পানির মধ্যে এটা ক্ষুদে ডাঁশমাছি পাওয়া গেল। তারপর দাঁত মাজা, চুল কোঁকড়ানো, নখে রং লাগানো এবং হাইড্রোজেন পেরোক্সাইড দেওয়া হয় আমার তুলোর প্যাড পরা (কালো গোঁফের রেখাগুলো সাদা করা) সব আধ ঘণ্টার মধ্যে।

সাড়ে ন'টা। চট্ করে গায়ে ড্রেসিং গাউন চড়িয়ে, এক হাতে সাবান আর অন্য হাতে মগ, চুলের কাঁটা, প্যান্ট, চুর কোঁকড়াবার জিনিস আর তুলোর বাণ্ডিল নিয়ে গোসলখানা থেকে হুড়মুড় করে বেরিয়ে পড়ি; কিন্তু সাধারণত যে আমার পরে যায়, তার ডাকে আমাকে একবার ফিরে যেতে হয়– কেননা বেসিনে নানা ধরনের কেশে আঁকাবাঁকা রেখার অলঙ্করণ তার মনঃপূত নয়।

দশটা। সব নিষ্প্রদীপ করো। শুভ রাত্রি! অন্তত মিনিট পনেরো ধরে বিছানাগুলোতে ক্যাঁচর ক্যাঁচর শব্দ আর ভাঙা স্প্রিঙের দীর্ঘশ্বাস। তারপর সব চুপচাপ অন্তত যদি আমাদের ওপরতলার প্রতিবেশীরা বিছানায় শুয়ে কোঁন্দল শুরু করে না দেয়।

সাড়ে এগারোটা। বাথরুমের দরজার ক্যাঁচর ক্যাঁচ আওয়াজ। ঘরের মধ্যে এসে পড়ে সরু এক ফালি আলো। জুতোর মচ্ মচ্ শব্দ, একটা ঢাউস কোট, যে পরে রয়েছে তার চেয়েও বড়– ক্রালারের অফিসে রাতের কাজ সেরে ফিরলেন। দশ মিনিট ধরে মেঝের ওপর পা ঘষে বেড়ানো, কাগজের মুড় মুড় শব্দ (ঠোঙায় করে খাবারদাবার সঞ্চয় করা হবে), এবং

তারপর বিছানা পাতা হল। অতঃপর সেই মূর্তিটা আবার উধাও এবং এরপর মাঝে মধ্যে পায়খানায় সন্দেহজনক সব শব্দ হতে শোনা গেল।

তিনটে। টিনের টুকরিতে আমাকে ছোট্ট একটা কাজ সারতে উঠতে হবে। লিক্ করার ভয়ে টুকরিটা আমার বিছানার তলায় একটা রবারের পাতের ওপর বসানো আছে। যখন এটা সরাতে হয়, আমি সব সময় দম বন্দ করে থাকি, কেননা টিনের গায়ে পাহাড়ের ঝোরার মতো ছ্যার ছ্যার করে সজোরে শব্দ হয়। তারপর টুকরিটা যথাস্থানে এবং সাদা নাইট গাউন পরা মূর্তিটা বিছানায় প্রত্যাবর্তন করে। মারগট আমার এই নাইট গাউনটা দেখলেই রোজ সন্ধ্যেবেলায় চেঁচিয়ে ওঠে, 'ইস্, আবার সেই অসভ্য রাতের পোশাক!'

এরপর একজন নৈশ আওয়াজগুলোর প্রতি কান খাড়া করে মিনিট পনেরোর মতো জেগে থাকে। প্রথমত, নিচের তলা কোনো সিঁদের-চোর ঢুকেছে কিনা, তারপর ওপরে, পাশের ঘরে এবং আমার ঘরে কোন্ বিছানায় কি রকমের শব্দ হচ্ছে, যা থেকে এটা বোঝা যায় যে, বাড়ির সবাই কে কি রকম ঘুমোচ্ছে, না কেউ রাত্তিরটা জেগে কাটাচ্ছে।

ঘুম-না আসা লোক নিয়ে ভারি জ্বালা। বিশেষ করে তিনি যদি বাড়ির এমন একজন হন যাঁর নাম ডুসেল। প্রথমে মাছের খাবি খাওয়ার মতন একটা আওয়াজ পাই, নয় দশ বার এর পুনরাবৃত্তি হয়, তারপর পরম উৎসাহে, মধ্যে মধ্যে খানিকটা চক্‌চক্ শব্দ তুলে, জিভ দিয়ে ঠোঁটগুলোকে ভেজানো হতে থাকে, তারপর অনেকক্ষণ ধরে চলে বিছানায় এপাশ ওপাশ করা এবং বার বার বালিশগুলো ওলটপালট করা। ডাক্তার কিছুক্ষণের জন্যে তন্দ্রাচ্ছন্ন থাকার পর পাঁচ মিনিটের পূর্ণ বিরতি; ব্যস্, তারপর আবার সেই যথাক্রমে আগের পুনরাবৃত্তি শুরু হয় কম করে আরও তিন বার। এমনও হতে পারে যে রাত্তিরে কিছুটা গোলাগুলি চলতে লাগল, রাত একটা থেকে চারটের মধ্যে কোনো একটা সময়ে। অভ্যেসবশে বিছানা ছেড়ে তড়াক করে দাঁড়িয়ে না ওঠা পর্যন্ত আমি সেটা কখনও ঠিক মাথায় নিতে পারি না। কখনও কখনও আমি স্বপ্নে এমন বুঁদ হয়ে থাকি– তখন আমার মন জুড়ে থাকে ফরাসী ভাষার অনিয়মিত ক্রিয়াগুলো কিংবা ওপরতলার কোনো ঝগড়াঝাঁটি। ফলে, কামান ফাটছে এবং আমি ঘরের মধ্যে আছি– এ সম্বন্ধে আমার হুঁশ আসতে খানিকটা দেরি হয়। তবে ওপরে যেভাবে বর্ণনা করলাম সেই ভাবেই এটা ঘটে। ঝট করে একটা বালিশ আর রুমাল থাবা দিয়ে তুলে গায়ে ড্রেসিং গাউন আর পায়ে চটি গলিয়ে নিয়ে তড়বড়িয়ে বাপির কাছে ছুটে যাই, মারগট যেভাবে জন্মদিনের কবিতায় লিখেছিল ঃ

গোলার প্রথম আওয়াজ নিশুতি রাত
চুপ, চুপ! দেখ, খুট করে দ্বার খোলে
ছোট্ট একটি মেয়ে ঢোকে সেই সাথে
জড়িয়ে একটি বালিশ নিজের কোলে।

বড় বিছানায় ধপাস করে একবার পড়লে, ব্যস্, আর চিন্তা নেই– যদি গোলাগুলির হাল খুব খারাপ হয়ে না পড়ে।

পৌনে সাতটা। ট্ র্ র্ র্– অ্যালার্ম ঘড়িতে গলা বের করার কোনো সময় অসময় নেই (কেউ যদি সেটা চায় এবং কখনও কখনও না চাইলেও) আক্ পিং– মিসেস ফান ডান চাবি বন্ধ করে দিলেন। ক্যাঁচর– মিস্টার ফান ডান উঠলেন। পানি ভরে নিয়েই বাথরুমে ভোঁ দৌড়।

সোয়া সাতটা। ক্যাঁচ শব্দে দরজা আবার খুলে গেল। স্বচ্ছন্দে ডুসেল বাথরুমে যেতে

পারেন। একবারটি নিজেকে একা পেয়ে আমি নিষ্প্রদীপ উপভোগ করি– আর ততক্ষণে 'গুপ্তমহলে' শুরু হয়ে যায় নতুন একটা দিন।

তোমার আনা।

বৃহস্পতিবার, ৫ আগস্ট, ১৯৪৩

আদরের কিটি,

আজ আমি মধ্যাহ্ন ভোজের সময় নেব।

এখন সাড়ে বারোটা। পুরো পাঁচমিশেলী ভিড়টা আবার জ্ঞান ফিরে পেয়েছে। গুদামের ছোকরাগুলো এখন যে যার বাড়ি ফিরে গেছে। মিসেস ফান ডানের সুন্দর এবং একমাত্র কার্পেটের ওপর তাঁর ভ্যাকুয়াম ক্লিনার চালানোর ধর্ধর আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। মারগট কয়েকটা বই বগলদাবা করে চলেছে– 'যে ছেলেমেয়েদের কোনো জ্ঞানোন্নতি হয় না'– তাদের ডাচ ভাষার অনুশীলনের জন্যে– কেননা ডুসেলের মনোভাব তাই। পিম্ তাঁর অচ্ছেদ্য ডিকেন্স্ সঙ্গে নিয়ে কোথাও একটু শান্তিতে বসবার জন্যে একটা কোণে চলে যাচ্ছেন। মা-মণি হন্তদন্ত হয়ে ওপরে যাচ্ছেন পরিশ্রমী গিন্নীটিকে সাহায্য করার জন্যে। আর আমি বাথরুমে চলেছি একই সঙ্গে নিজেকে এবং ঘরটাকে সাফসুফ করার জন্যে।

পৌনে একটা। জায়গাটা লোকজনে ভরে উঠছে। প্রথমে মিস্টার ফান সান্টেন তারপর কুপহুইস বা ক্রালার, এলি আর কখনও-সখনও মিপ্‌ও।

একটা। আমরা সবাই পুঁচকে রেডিও সেটটা ঘিরে বসে বি-বি-সি শুনছি; এই হচ্ছে একমাত্র সময় যখন 'গুপ্ত মহলে'র লোকেরা একে অন্যের কথার মধ্যে কথা বলে না, কেননা এ সময় এমন একজন বলে যার কথার মধ্যে কথা বলার সাধ্যি এমন কি মিস্টার ফান ডানেরও নেই।

সওয়া একটা। জবর ভাগাভাগি। নিচের লোকেরা প্রত্যেকে পায় এক কাপ করে সুপ এবং যদি কখনও পুডিং থাকে, তাহলে তারও খানিকটা। মিস্টার ফান সান্টেন খুশি হয়ে ডিভানে গিয়ে বসেন কিংবা লেখার টেবিলে হেলান দেন। ওঁর সঙ্গে থাকে খবরের কাগজ, কাপ আর সাধারণত বেড়াল। উনি যদি দেখেন তিনটির একটি নেই, তাহলেই গাঁইগুঁই করতে শুরু করে দেবেন। কুপহুইস বলেন শহরের হালফিল খবর, ওঁর কাছ থেকে সত্যি অনেক কিছু জানতে পারা যায়। ক্রালার হুড়মুড়িয়ে ওপরে চলে এসে আস্তে ঠক্ করে দরজায় শব্দ করেন এবং হাত কচলাতে কচলাতে ভেতরে ঢোকেন। যেদিন মন ভালো থাকে সেদিন খোশমেজাজে খুব বকবক করেন, নইলে তিরিক্ষি মেজাজে মুখে কুলুপ এঁটে বসে থাকেন।

পৌনে দুটো। সবাই টেবিল ছেড়ে উঠে যে যার কাজে চলে যায়। মারগট আর মা-মণি এঁটো বাসন তোলেন। মিস্টার আর মিসেস ফান ডান ওঁদের ডিভানে গিয়ে বসেন। পেটার যায় চিলেকোটায়। বাপি নিচের তলার ডিভানে। ডুসেল গিয়ে বিছানায় লম্বা হল আর আনা তার কাজে বসে। এর পরেকার সময়টা সবচেয়ে শান্তিতে কাটে; কারো কোনো ঝামেলা থাকে না। ডুসেল উপাদেয় খাবারদাবারের স্বপ্ন দেখেন– ওঁর মুখের ভাবভঙ্গিতে সেটা ধরা পড়ে, কিন্তু ঊর্ধ্বশ্বাসে সময় চলে যায় বলে আমি বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে দেখতে পারি না। এরপর চারটের সময় ঘড়ি হাতে নিয়ে দিগ্‌গজ ডাক্তারটি দাঁড়িয়ে থাকেন, কেননা ওঁকে টেবিল খালি করে দিতে একটি মিনিট আমার দেরি হয়ে গেছে।

তোমার আনা।

সোমবার, ৯ আগস্ট, ১৯৪৩

আদরের কিটি,

'গুপ্ত মহলে'র দৈনিক নির্ঘণ্টের পূর্বানুবৃত্তি চলেছে। এবার আমি বর্ণনা করব সান্ধ্যভোজ।

মিস্টার ফান ডান আরম্ভ করেন। দিতে হবে তাঁকেই প্রথমে; তাঁর যা যা পছন্দ তিনি তা নেবেন প্রচুর পরিমাণে। সাধারণত খেতে খেতে কথা বলেন, এমন ভাবে মতামত দেন যেন একমাত্র তাঁর কথাই শোনবার যোগ্য, যেন তিনি যখন বলেছেন তখন আর তাঁর কথার ওপর কোনো কথাই চলে না। যদি কেউ কোনো প্রশ্ন তোলার ধৃষ্টতা দেখায়, তাহলে উনি তৎক্ষণাৎ রেগে অগ্নিশর্মা হবেন। বেড়ালের মতন, ওঃ, উনি কী ফ্যাঁচ্ ফ্যাঁচ্ করতে পারেন– আমি তোমাকে বলছি, আমি বাপু ওঁর সঙ্গে তর্ক করতে যাব না– একবার যে সে চেষ্টা করেছে, দ্বিতীয়বার আর সে তা করবে না। ওঁর হল লাখ কথার এক কথা, উনি হলেন প্রায় সবজান্তা। আচ্ছা, না হয় মেনে নিলাম ওঁর মাথা আছে, কিন্তু তুঙ্গ স্পর্শ করেছে ভদ্রলোকের 'আত্মপ্রসাদ'।

শ্রীমতী। সত্যি বলতে, আমার নীরব থাকাই উচিত। বিশেষত যদি মেজাজ খিঁচড়ে যেতে থাকে, তাহলে কোনো কোনো দিন ওঁর মুখের দিকে তুমি তাকাতেই পারবে না। একটু খুঁটিয়ে দেখলে ধরা যায় সব বাদানুবাদে উনিই নাটের গুরু। বিষয়টা নয়। না, না। ও ব্যাপারে প্রত্যেকেই একটু সরে থাকতে চায়, তবে ওঁর সম্বন্ধে বোধ হয় বলা যায় যে, উনিই 'উস্কানিদাতা'। গোলমাল পাকিয়ে দেওয়া, কী মজা। আনার সঙ্গে মিসেস ফ্রাঙ্কের; বাপির সঙ্গে মারগটকে লাগিয়ে দেওয়ার কাজটা তত সহজ হয় না।

কিন্তু খাবার টেবিলে মিসেস ফান ডান একবার বসলে হল, ওঁর অল্পে হয় না– যদিও মাঝে মধ্যে উনি তাই মনে করে থাকেন। সবচেয়ে কুঁচো আলু, যেটা সবচেয়ে মিষ্টি সেটা গালভর্তি, সবকিছুর সেরা জিনিস; হুমড়ি খেয়ে পড়ে তুলে নেওয়া ওঁর নিয়ম। অন্যরা নিজেদের পালা আসার জন্যে অপেক্ষা করুক, আমি তো সেরা জিনিসগুলো নিয়ে নিই। তারপর বকবক বকবক। কারো আগ্রহ থাক বা না থাক, কেউ শুনুক বা না শুনুক– তাতে ওঁর কিছু যায় আসে বলে মনে হয় না। আমার ধারণা, উনি মনে করেন, 'মিসেস ফান ডান যাই বলবেন সবাই আগ্রহভরে শুনবে।' ঢলানিমার্কা হাসি, চালচলনে সবজান্তার ভাব, সবাইকে একটু করে উপদেশ আর পিঠ চাপড়ানি– নির্ঘাত এ সমস্তই উনি করেন অন্যের কাছে নিজেকে তোলার জন্যে। কিন্তু ঠায় একটু চেয়ে থাকলেই ওঁর স্বরূপ ধরা পড়ে।

এক, ভদ্রমহিলা পরিশ্রমী, দুই হাসিখুশি, তিন ছেনাল– এবং কখনও-সখনও সুশ্রিরি। ইনিই হলেন পেট্রোনেলা ফান ডান।

খাওয়ার টেবিলের তৃতীয় সাথীটি। ওকে তেমন টুাঁ ফোঁ করতে শোনা যায় না। তরুণ শ্রীমান ফান ডান খুব চুপচাপ এবং ওর দিকে কারো বড় একটা দৃষ্টি পড়ে না। ওর ক্ষিধের কথা বলতে গেলে সেটা যেন (গ্রীক পুরানের) দেনাইদিনের সেই পাত্র, যা কখনই ভর্তি হয় না। চর্বচোষ্য করে ভরপেট খাওয়ার পরও অম্লানবদনে সে বলবে আবার দিলে আবারও সে খেতে পারে।

চার নম্বর– মারগট। নেংটি ইঁদুরের মতন কুট্ কুট্ করে খায় এবং কোনো রা কাড়ে না। গলা দিয়ে একমাত্র যায় তরিতরকারি আর ফলমূল। ফান ডানদের বিচারে 'মাথা-খাওয়া'; আমাদের মতে, যথেষ্ট 'খোলা হাওয়া এবং খেলাধুলোর অভাব'।

সে বাদে– মা-মণি। ক্ষিধের সঙ্গে খান, বড্ড বেশি কথা বলেন। মিসেস ফান ডান

যেমন, তেমন কারো মনেই হয় না; ইনিই হলেন গৃহকর্ত্রী। তফাতটা কোথায়? তফাত হল গিয়ে মিসেস ফান ডান করেন রান্না, আর মা-মণি করেন মাজাঘষা।

নম্বর ছয় আর সাত। বাপি আর আমার সম্বন্ধে বেশি কিছু বলব না। প্রথমোক্ত জন হলেন খাওয়ার টেবিলে সবচেয়ে সাদাসিধে মানুষ। তিনি আগে দেখে নেন সবাই কিছু কিছু করে পেয়েছে কিনা। তাঁর নিজের কিছু না পেলেও চলে, কেননা সেরা জিনিসগুলো পাবে ছোটরা। উনি হলেন এমন দৃষ্টান্ত যার কোনো ঘাট নেই।

ওঁর পাশে 'গুপ্ত মহলে'র 'বদ্‌মেজাজী' ডাক্তার ডুসেল। নিতে কার্পণ্য করেন না। বিনাবাক্যে ঘাড় গুঁজে খেয়ে যান। কেউ মুখ খুললে, দোহাই, কেবল খাওয়ার কথা হোক। এ নিয়ে কে আর কোঁদল করে, করে শুধু বাক্‌ফাট্টাই। ভদ্রলোক নেন কব্জি ডুবিয়ে, খেতে ভালো হলে কখনই আর 'না' বলেন না, খারাপ হলে বলেন মাঝে মধ্যে। বুকের কাছে টানা ট্রাউজার, লাল কোট, শোবার ঘরের কালো চটি আর শিঙের তৈরি চশমার ফ্রেম। ছোট্ট টেবিলটাতে ওঁর এই চেহারাটা চোখে ভাসে– সব সময় কাজ করছেন, তারই ফাঁকে ফাঁকে দিবানিদ্রা, খাওয়ার পর্ব, আর-তাঁর প্রিয় জায়গা– পায়খানা। দিনে তিন, চার, পাঁচবার দোরগোড়ায় অস্থির হয়ে দাঁড়ানো, একবার এ-পায়ে একবার ও-পায়ে ভর দিয়ে এমন ভাবে শরীরটাকে দোমড়ানো মোচড়ানো যে বোঝাই যায় আর সামলানো যাচ্ছে না। তাতে কি উনি অতিষ্ঠ হন? একটুও না! সওয়া সাতটা থেকে সাড়ে সাতটা, সাড়ে বারোটা থেকে একটা, দুটো থেকে সওয়া দুটো, চারটে থেকে সওয়া চারটে, ছটা থেকে সওয়া ছটা, সাড়ে এগারোটা থেকে বারোটা। সময়গুলো মনে করে রেখে দেওয়া ভালো– এগুলো হল রোজকার 'বৈঠকী সময়'। দরজায় যদি আসন্ন বিপদের জানান-দেওয়া, কাতর কণ্ঠস্বর শোনা যায়! ওঁর ভারি বয়েই গেছে বেরিয়ে আসতে কিংবা তাতে কান দিতে।

নয় নম্বরটি গুপ্ত মহলে'র পরিবারভুক্ত নন, কিন্তু এ বাড়ির এবং খাওয়ার টেবিলের সঙ্গীসাথী। এলির রয়েছে সুস্থ সবল মানুষের ক্ষিধে। ওঁর প্লেটে কিচ্ছু পড়ে থাকে না এবং ওঁর ওটা খাব না সেটা খাব না নেই। একটুতেই এলি সন্তুষ্ট হন এবং ঠিক সেই কারণেই আমরা আনন্দ পাই। সদাপ্রফুল্ল এবং ঠাণ্ডা মেজাজ কোনো কিছুতে 'না' বলা নেই এবং ভালো মানুষ– এই সব ওঁর চরিত্রের গুণ।

তোমার আনা।

মঙ্গলবার, ১০ আগস্ট, ১৯৪৩

আদরের কিটি,

নতুন মতলব মাথায় এসেছে। খাওয়ার সময় অন্যদের সঙ্গে কম কথা বলি, বেশি বলি নিজের সঙ্গে। দুটো কারণে এটা প্রশস্ত। প্রথমত, সারাক্ষণ আমি মুখে খই না ফোটালে সবাই খুশি হয়, এবং দ্বিতীয়ত, অন্যেরা কী বলে না বলে তা নিয়ে আমার বিরক্ত হওয়া উচিত নয়। আমি মনে করি না, আমি বোকার মতন ফোড়ন কাটি; অন্যেরা মনে করে। সুতরাং আমার কথা আমার মনে মনে রাখাই ভালো। আমি একই জিনিস করি যখন আমাকে এমন কিছু খেতে হয় যা আমার দু'চক্ষের বিষ। আমি প্লেটটা আমার সামনে রেখে খাবারটা যেন অতি উপাদেয় এইভাবে মনকে চোখ ঠারি, পারতপক্ষে সেদিকে তাকাই না বললেই হয়, এবং কোথায় আছি সে সম্বন্ধে হুঁশ হওয়ার আগেই জিনিসটা লোপাট হয়। আরেকটা খুব বিচ্ছিরি প্রক্রিয়া হল সকালে ওঠা। বিছানা থেকে পা ছুঁড়ে উঠে পড়তে পড়তে নিজের মনে বলি–

'আসছি, এক সেকেণ্ড'– বলে জানালায় গিয়ে দাঁড়িয়ে নিষ্প্রদীপের গ্রন্থি খুলি, জানলার ফাঁকে নাক লাগিয়ে থেকে কিছুক্ষণ পরে খানিকটা তাজা হাওয়ার অনুভূতি পাই, তখন আমি জেগে যাই। যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি বিছানাটা তুলে ফেললে ঘুমোবার প্রলোভন চলে যায়। এই ধরনের জিনিসকে মা-মণি কী বলেন জানো? 'বাঁচার কলাকৌশল'। কথাটা যেন কেমন-কেমন। গত হপ্তায় সময়ের ব্যাপারে আমরা সবাই কেমন যেন তালগোল পাকিয়ে ফেলেছি। তার কারণ, আমাদের বড় আদরের ভেস্টারটোরেন ঘণ্টা-বাজা ঘড়িটা বাহ্যত যুদ্ধের প্রয়োজনে নিয়ে চলে গেছে। ফলে, দিনে বা রাত্রে ঠিক কটা বাজল আমরা জানতে পারি না। আমি এখনও কিছুটা আশা করছি যে, ওঁরা ওর একটা বদ্‌লির (টিনের তামার বা ঐ ধরনের কিছুতে তৈরি) কথা ভাববেন যা ঐ বড় ঘড়িটাকে কতকটা মনে পড়িয়ে দেবে।

ওপর তলায় বা নিচের তলায়, যখন যেখানেই থাকি, আমার পায়ের দিকে সবাই হাঁ করে চেয়ে থাকে, আমার পায়ে একজোড়া অসাধারণ ভালো জুতো (আজকালকার কথা ভাবলে) চকচক করতে থাকে। দ্রাক্ষাসবের রং দেওয়া সুয়েড-লেদারে তৈরি, বেশ উঁচু হিল্‌তোলা এই জুতোজোড়া মিপ্ কোথা থেকে যেন ২৭.৫০ ফ্লোরিনে কিনে এনেছিলেন। পরলে রণ্‌পায় দাঁড়িয়েছি বলে মনে হয়। এবং আমাকে অনেক বেশি ঢ্যাঙা দেখায়।

ডুসেল পরোক্ষে আমাদের জীবন বিপন্ন করে তুলেছেন। আসলে মুসোলিনি আর হিটলারকে গালাগাল দেওয়া একটা নিষিদ্ধ বই উনি মিপ্‌কে আনতে দেন। আসবার সময় ঝটিকা বাহিনীর একটি গাড়ি মিপের প্রায় ঘাড়ে এসে পড়েছিল। মিপ্ চটে গিয়ে বলে ওঠেন, 'হতভাগা নচ্ছার কাঁহাকা।' বলে সাইকেল চালিয়ে দেন। ওঁকে যদি ওদের সদর দপ্তরে পাকড়াও করে নিয়ে যেত তাহলে যে কী হত সে কথা না ভাবাই ভালো।

তোমার আনা।

বুধবার, ১৮ আগস্ট, ১৯৪৩

আদরের কিটি,

এই লেখাটার শিরোনাম হল : 'আজকের যৌথ কর্তব্য– আলু ছোলা।'

একজন খবরের কাগজ আনে, আরেকজন ছুরি (অবশ্যই, সেরা ছুরিটা সে নিজে নেয়), তৃতীয়জন আনে আলু আর চতুর্থজন এক ডেক্‌চি পানি।

শুরু করেন মিস্টার ডুসেল, সব সময় ওঁর ছোলা ভালো হয় না, তবু ডাইনে বাঁয়ে তাকিয়ে অনবরত ছুলে যান। সবাই কি ওঁর পন্থা অনুসরণ করে? উঁহু! 'এই আনা, এদিকে তাকাও; এইভাবে আমি ছুরিটা ধরছি, তারপর ওপর থেকে নিচের দিকে ছুলছি! উঁহু, ওভাবে নয়–এই ভাবে!'

আমি আমতা আমতা করে বলি, 'মিস্টার ডুসেল, এইভাবে আমার ভালো হয়!'

'তাহলেও, সবচেয়ে ভালো হয় এইভাবে। তবে তোমার দ্বারা এটা হবে না। স্বভাবতই ও নিয়ে আমি মাথা ঘামাই না। করতে করতে এটা তোমার জানা হবে।' আমরা ছুলে চলি। আমার পাশের লোকের দিকে আমি আড়চোখে তাকাই। উনি কী যেন ভাববে ভাবতে আরেকবার মাথা নাড়ান (বোধ হয়, আমাকে মনে করে), কিন্তু রা কাড়েন না।

আমি আবার ছুলতে থাকি, বাপি যে দিকটাতে বসে আছেন, এবার আমি সেইমুখো তাকাই। ওঁর কাছে আলু ছোলার ব্যাপারটা নেহাত একটা নগণ্য কাজ নয়, ওটা রীতিমত একটা সূক্ষ্ম কাজ। বাপি যখন বই পড়েন, ওঁর মাথার পেছন দিকের চামড়ায় গভীর টোল

পড়ে, কিন্তু আলু, বিন্ আর অন্যান্য তরিতরকারি কাটাকুটো করবার সময় মনে হয় ওঁর মাথায় আর কিছু ঢোকে না। তখন উনি পরে নেন 'আলুর মুখচ্ছবি' এবং নিখুঁত ভাবে না ছুলে কোনো আলু কিছুতেই উনি হাতছাড়া করবেন না; একবার ঐ মুখচ্ছবি ধারণ করলে সে প্রশ্নই আর ওঠে না।

তারপর আবার কাজ করতে করতে এক মুহূর্তের জন্যে একবার মুখ তুলি; ঘটনাটা আমার বিলক্ষণ জানা, মিসেস ফান ডান চেষ্টা করছেন ডুসেলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে। প্রথমে উনি ডুসেলের দিকে তাকিয়ে থাকেন, ডুসেল সেটা খেয়াল করেন বলে বোধ হয় না। এরপর চোখের ইশারা করেন; ডুসেল ঘাড় গুঁজে কাজ করে যান। তখন উনি হাসতে থাকেন, ডুসেল মুখ তোলেন না। এরপর মা-মনিও হাসতে থাকেন; ডুসেল গ্রাহ্য করেন না। মিসেস ফান ডান কিছু করতে না পেরে, তখন অন্য উপায় অবলম্বন করার কথা ভাবলেন। খানিক চুপ করে থেকে তারপর বললেন : 'পুট্টি, একটা অ্যাপ্রন জড়িয়ে নাও না। নইলে কাল তোমার স্যুট থেকে ঘষে ঘষে সব দাগ আমাকে তুলতে হবে।'

'আমি মোটেই স্যুট নোংরা করছি না!'

আরেক মুহূর্ত সব চুপচাপ।

'পুট্টি, তুমি বসছ না কেন?'

'দাঁড়িয়ে থেকে আমি আরাম পাচ্ছি। এই বেশ ভালো।' চুপ।

'পুট্টি ডু স্পাট্স্ট্শন!' ('পিণ্ডি পাকাচ্ছ!')

'আমার খেয়াল আছে গো, খেয়াল আছে।'

মিসেস ফান ডান বিষয়ান্তর খোঁজেন। 'আচ্ছা. পুট্টি, বলো তো ইদানীং ইংরেজদের হাওয়াই হামলা নেই কেন?'

'আবহাওয়া এখন সুবিধের নয় বলে।'

'কালকের দিনটা তো চমৎকার ছিল, কই ওদের প্লেন তো এল না।'

'ওসব নিয়ে কথা না বলাই ভালো।'

'কেন, আলবৎ বলব। আমরা আমাদের মতো বলতে পারি।'

'না।'

'কেন নয়?'

'চুপ করে থাকো।'

'মিস্টার ফ্রাঙ্ক সব সময় ওঁর স্ত্রীর প্রশ্নের উত্তর দেন। কী, দেন না?'

'মিস্টার ফান ডান নিজের সঙ্গে লড়েন। এটা তাঁর ব্যথার জায়গা, এটা এমন জিনিস যা তাঁর সহ্যের বাইরে এবং মিসেস ফান ডান আবার শুরু করেন– 'মনে হচ্ছে স্থলাভিযান কোনোদিনই হবে না!'

মিস্টার ফান ডান সাদা হয়ে গেলেন; সেটা লক্ষ্য করে মিসেস ফান ডান লাল হয়ে গিয়ে আবার বলে চললেন : 'বৃটিশরা কচু করছে।' ব্যস্, বোমা ফাটল!

'আর একটা কথা নয়, ডনারভেটার-নখ-আইনমাল!' ('কালবোশেখি আবার!')

মা-মণি আর হাসি চাপতে পারেন না। আমি সোজা সামনের দিকে তাকাই।

প্রায় রোজই এই এক ধরনের ঘটনা। ওঁদের মধ্যে খুব একচোট ঝগড়া হয়ে গেলে অবশ্য এর ব্যতিক্রম হয়। কেননা তখন দুজনেই মুখ বন্ধ করে থাকেন।

আমাকে চিলেকোঠায় উঠে গিয়ে কিছু আলু নিয়ে আসতে হয়। পেটার বেড়ালের উকুন

বেছে দিচ্ছিল। পেটার মুখ তুলে তাকাতেই বেড়ালটার নজরে পড়ে– হুস্– খোলা জানালা দিয়ে সোজা সে নালীর মধ্যে উধাও হয়। পেটার এই মারে তো সেই মারে। আমি হো হো করে সট্‌কে পড়ি।

তোমার আনা।

শুক্রবার, ২০ আগস্ট, ১৯৪৩

আদরের কিটি,

মালখানার লোকেরা ঠিক সাড়ে পাঁচটায় বাড়ি চলে যায়। তারপর আমরা ঝাড়া হাত পা।

সাড়ে পাঁচটা। এলি এসে আমাদের অর্পণ করেন সান্ধ্য স্বাধীনতা। সঙ্গে সঙ্গে আমরা আমাদের কাজকর্মে লেগে পড়ি। প্রথমে এলির সঙ্গে আমি ওপরতলায় যাই, এলি সাধারণত আমাদের দ্বিতীয় ক্রমের খাবার থেকে নিয়ে চাখতে শুরু করে দেন।

এলি বসবার আগেই মিসেস ফান ডান ভেবে ভেবে বের করতে থাকেন কী কী জিনিস তাঁর চাই। সে সব প্রকাশ হতে দেরি হয় না ; 'দেখ, এলি, আমার একটা ছোট্ট জিনিস চাই... ।' এলি আমাকে চোখ টেপে; ওপরে যেই আসুক, মিসেস ফান ডান কাউকে কখনও বলতে ছাড়েন না যে তাঁর কোন্ জিনিসটা চাই। লোকজনেরা যে ওপরতলায় আসতে চায় না এটা নিশ্চয় তার একটা কারণ।

পৌনে ছটা। এলি বিদায় নেন। দু'তলার সিঁড়ি ভেঙে নিচে গিয়ে আমি একবার চারদিক দেখে আসি। প্রথমে রান্নাঘরে, তারপর অফিসের খাস কামরায়, এরপর মুশ্চির জন্যে কল-আঁটা দরজাটা খুলতে কয়লার গর্তে। বেশ অনেকক্ষণ ধরে সবকিছু দেখাশুনো করার পর শেষে গেলাম ক্রালারের কামরায়। ফান ডান ড্রয়ার আর পোর্টফোলিওগুলো ঘেঁটে ঘেঁটে দেখছিলেন আজকের কোনো ডাক আছে কিনা। পেটার গেছে মালখানার চাবি আর বোখাকে আনতে; পিম্ টাইপরাইটারগুলো টেনে টেনে ওপরে তুলছেন; মারগট একটা নিরিবিলি জায়গা খুঁজছে যাতে সে তার অফিসের কাজগুলো করতে পারে; মিসেস ফান ডান গ্যাসের উনুনে কেট্‌লি চাপাচ্ছেন; মা-মণি আলুর ডেক্‌চি নিয়ে নিচে নেমে আসছেন; প্রত্যেকেই জানে কার কী কাজ।

পেটার একটু বাদেই মালখানা থেকে ফিরে এল। প্রথম সওয়াল হল–রুটি। রান্নাঘরের আলমারিতে সব সময়ই রুটি রাখেন মহিলারা; কিন্তু সেখানে নেই। রাখতে ভুলে গেছেন ওঁরা? পেটার সদর দপ্তরের খোঁজ করতে চাইল। যাতে বাইরে থেকে দেখা না যায় তার জন্য নিজেকে গুটিয়ে যথাসম্ভব ছোট করে দরজার সামনে সে গুটিসুটি মেরে বসে হাতে আর হাঁটুতে ভর দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে চলল স্টীলের আলমারির দিকে; রুটি সেখানেই রাখা ছিল; রুটিটা হস্তগত করে পেটার হাওয়া হল; অন্তত, সে চেয়েছে হাওয়া হয়ে যেতে, কিন্তু ঘটনাটা ভালোরকম মালুম হওয়ার আগেই মুশ্চি তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, সোজা গিয়ে গ্যাট হয়ে বসেছে লেখার টেবিলের তলায়।

পেটার ফ্যাল ফ্যাল করে এদিক ওদিক তাকায়– এইও, মুশ্চিকে দেখতে পেয়ে, আবার হামাগুড়ি দিয়ে অফিসে ঢুকে গিয়ে মুশ্চির ল্যাজ ধরে টানতে থাকে। মুশ্চি ফ্যাঁচ ফ্যাঁচ করে, পেটার ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলে। কিন্তু তাতে ফল কী দাঁড়াল? মুশ্চি এবার জানলার পাশে উঠে বসে পেটারের হাত এড়াতে পেরে মহাসুখে গা চাটছে। পেটার ওকে ভজাবার জন্যে বেড়ালটার নাকের নিচে একখণ্ড রুটি ধরে শেষ চেষ্টা দেখছে। মুশ্চি ওতে ভুলবে না, দরজা

বন্ধ হয়ে গেল। দরজার ফাঁক দিয়ে আমি আগাগোড়া দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলাম। আমরা বসে নেই। খুট, খুট, খুট। দরজায় তিনটে শব্দ মানে খাবার দেওয়া হয়েছে।

তোমার আনা।

মঙ্গলবার, ২৩ আগস্ট, ১৯৪৩

আদরের কিটি,

'গুপ্ত মহলে'র দৈনিক নির্ঘণ্টের বাকি কিস্তি। ঘড়িতে সকাল সাড়ে আটটা বাজলেই মারগট আর মা-মণি ছটফট করতে থাকেন, 'চুপ, চুপ...বাপি, আস্তে অটো, চুপ...পিম।' 'সাড়ে আটটা বাজে, এদিকে চলে এসো, এখন আর পানির কল খোলা চলবে না; পা টিপে টিপে চলে এসো।' বাথরুমে বাপিকে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে এমনি সব অনুশাসন দেওয়া হতে থাকে। ঘড়িতে সাড়ে আটটা বাজা মাত্র তাঁকে বসবার ঘরে হাজির হতে হবে। কলে এক ফোঁটাও পানি পড়বে না, কেউ পায়খানায় যাবে না, পায়চারি করা চলবে না, কোথাও কোনো টু শব্দ হবে না। অফিসে যতক্ষণ লোকজন না থাকে, মালখানায় সব কিছু শ্রুতিগোচর হয়। আটটা বেজে কুড়ি মিনিট হলে ওপর-তলার দরজা খুলে যায় এবং তার কিছুক্ষণ পরেই মেঝের ওপর ঠুক্ ঠুক্ করে তিনবার আওয়াজ হয়— আনার পরিজ। আমি সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠে আমার 'কুকুরছানা'র প্লেটটা হস্তগত করি। তারপর আবার একছুটে আমার ঘরে। সব কিছুই করা হয় প্রচণ্ড দ্রুতগতিতে। চুল আঁচড়ে নিই, আমার আওয়াজ করা টিনের টুক্‌রিটা সরিয়ে ফেলি, বিছানাটা যথাস্থানে রাখি। এই চুপ, ঘড়িতে ঘণ্টা বাজছে! ওপর তলায় মিসেস ফান ডান জুতো খুলে ফেলে বেডরুম স্লিপারে পা গলাচ্ছেন। মিস্টার ফান ডানও তাই করছেন; চারিদিক নিস্তব্ধ। এতক্ষণে আমরা ফিরে পাচ্ছি একটুখানি সত্যিকার পারিবারিক জীবন। আমি এখন পড়াশুনো করতে চাই। মারগটও চায়, আর সেই সঙ্গে চান বাপি আর মা-মণি। ঝুলে পড়া, ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ করা খাটের একপ্রান্তে বসে বাপি (হাতে চিরাচরিত ডিকন্স আর অভিধান); একটু ভদ্রগোছের গদিও তাতে নেই; ওপর নিচে দুটো পাশ-বালিশ জোড়া দিলেও কাজ চলে যায়, বাপি তখন ভাবেন : 'কাজ নেই ওসবে, এমনিতেই আমি চালিয়ে নেব।'

বাপি যখন পড়েন, মুখ তোলেন না, এদিক ওদিক তাকানও না। থেকে থেকে হাসেন আর তখন বিস্তর চেষ্টা করে কোনো একটা ছোট্ট গল্পে মা-মণির আগ্রহ জাগাতে। উত্তর পান— 'আমার এখন সময় নেই।' বাপি এক সেকেণ্ড একটু দমে যান, তারপর আবার পড়তে থাকেন; খানিক পরে, যখন বাড়তি মজাদার কিছু পান, তখন আবার চেষ্টা করেন 'এই জায়গাটা তোমার পড়া উচিত, মা-মণি।' মা-মণি 'ওপক্লাপ' (ওলন্দাজদের এক ধরনের খাট, সামনে পর্দা খাটিয়ে দেয়ালে ভাঁজ করে রাখলে বুককেসের মতন দেখায়) চৌকিতে বসে বসে যখন যেমন ইচ্ছে বইপত্র পড়েন, সেলাই করেন, বোনেন অথবা কাজ করেন। তখন হঠাৎ একটা কিছু তাঁর মনে পড়ে যায়। তড়বড় করে বলে ওঠেন : 'আনা, তুই জানিস...মারগট, লিখে নে...!' খানিক পরে আবার সব মিটমাট হয়ে যায়।

মারগট ফটাস করে তার বই বন্ধ করে। বাপি তাঁর ভুরুজোড়া তুলে অদ্ভুত ভাবে বাঁকান, তাঁর চোখ কুঁচকে পড়বার ধরনটা আবার স্পষ্ট হয় এবং আবার একবার তিনি বইয়ের মধ্যে ডুবে যান; মা-মনি মারগটের সঙ্গে বকবক করতে থাকেন, আমিও কান খাড়া করে শুনি। পিম্ সেই আলোচনায় ভিড়ে যান...ঘড়িতে নটা। প্রাতরাশ এখন।

তোমার আনা।

শুক্রবার, ১০ সেপ্টেম্বর, ১৯৪৩

আদরের কিটি,

যখনই আমি তোমাকে লিখতে বসি, যেন একটা বিশেষ কিছু ঘটে, কিন্তু ঘটনাগুলো প্রীতিকর হওয়ার বদলে প্রায়ই অপ্রীতিকর হয়। যাই হোক, এখন অবিশ্বাস্য কিছু ঘটছে। গত বুধবার সন্ধ্যেবেলায়, ৮ই সেপ্টেম্বর, আমরা গোল হয়ে বসে সাতটার খবর শুনছিলাম। প্রথম খবরই হল : 'সারা যুদ্ধের সেরা খবর শুনুন এবার। ইতালি আত্মসমর্পণ করেছে।' ইংলণ্ড থেকে ডাচ ভাষায় খবর শুরু হল সওয়া আটটায়। 'শ্রোতাবৃন্দ এক ঘণ্টা আগে আজকের ঘটনাপঞ্জি লেখা যখন সবে শেষ করেছি, সেই সময় ইতালির আত্মসমর্পণের অবিশ্বাস্য খবরটা এসে পৌঁছোয়। বিশ্বাস করুন, লেখা নোটগুলো বাজে কাগজের ঝুড়িতে ফেলে দিতে এত আনন্দ এর আগে কখনও পাইনি। 'গড সেভ দি কিং', আমেরিকার জাতীয় সঙ্গীত এবং 'ইণ্টারন্যাশনাল' বাজানো হল। বরাবরের মতই ডাচভাষার প্রোগ্রামটা ছিল মন-চাঙ্গা-করা, কিন্তু খুব একটা আশাবাদী নয়।

আমাদের মুশকিলও আছে বেশ; মুশকিলটা মিস্টার কুপহুইসকে নিয়ে। তুমি জানো উনি আমাদের খুব প্রিয়জন; সবসময় ওঁর মুখে হাসি এবং আশ্চর্যরকমের সাহসী মানুষ, যদিও কখনই ওঁর শরীর ভালো নয়, নিদারুণ যন্ত্রণা পান, ওর পেট ভরে, খাওয়া আর বেশি হাঁটাচলা করা বারণ। মা-মনি কদিন আগে খুব খাঁটি কথাই বলেছিলেন, 'মিস্টার কুপহুইস ঘরে পা দিলে, রোদ হেসে ওঠে।' ওঁকে এখন হাসপাতালে যেতে হয়েছে। তলপেটে একটা খুব বিচ্ছিরি ধরনের অস্ত্রোপচারের জন্যে। অন্তত চার সপ্তাহ তাঁকে হাসপাতালে থাকতে হবে। তুমি যদি দেখতে কি রকম আটপৌরে ভাবে উনি আমাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে গেলেন– যেন কিছুই নয়, যেন উনি একটু কোনাকাটা করতে বেরোচ্ছেন।

তোমার আনা।

বৃহস্পতিবার, ১৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৪৩

আদরের কিটি,

আমাদের ভেতরকার সম্পর্ক দিন দিন আরও খারাপ আকার ধারণ করেছে। খেতে বসে কেউ মুখ খুলতে (খাবারের গ্রাস তোলা ছাড়া) সাহস পায় না, পাছে কিছু বললেই কারো গায়ে লাগে কিংবা কেউ উল্টো বোঝে। দুশ্চিন্তা এবং মানসিক অবসাদ থেকে বাঁচার জন্যে আমি ভালেরিয়ান পিল্ গিলছি, কিন্তু তাতে পরের দিন আমার অবস্থা আরও শোচনীয় হওয়া আটকাচ্ছে না। দশটা ভালেরিয়ান পিল্ খাওয়ার চেয়েও বেশি কাজ হত প্রাণ খুলে একবার হাসতে পারলে– কিন্তু আমরা যে ভুলেই গিয়েছি কেমন করে হাসতে হয়। মাঝে মাঝে আমার ভয় হয় যে, অত গুরুগম্ভীর হয়ে থাকতে থাকতে আমার মুখচ্ছবি হয়ত প্যাঁচার মত হয়ে মুখের দুটো কোণ ঝুলে যাবে। অন্যদেরও গতিক তেমন সুবিধের নয়, শীত হলে সেই মহা বিভীষিকা যার দিকে প্রত্যেকেই সভয়ে আর সংশয়িত চিত্তে তাকায়। আরেকটি জিনিসও আমাদের আদৌ খুশি করছে না– সেটা হল এই যে, মালখানদার ফ.ম. 'গুপ্ত মহল' সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে উঠেছে। ফ.ম. এ বিষয়ে কী ভাবছে না ভাবছে তা নিয়ে আমরা প্রকৃতপক্ষে মাথাই ঘামাতাম না যদি লোকটা অত বেশি ছোঁক-ছোঁক না করতো, যদি ওর চোখে ধুলো দেওয়া শক্ত না হত, আর তাছাড়া, ও এমন যে ওকে বিশ্বাস করা যায় না। একদিন ক্রালার চাইলেন একটু বেশি রকম সাবধান হতে; একটা বাজার দশ মিনিট আগে কোট গায়ে দিয়ে

উনি মোড়ের কাছে ওষুধের দোকানে গেলেন। পাঁচ মিনিটও হয়নি, উনি ফিরে এসে চোরের মত গুটিসুটি মেরে খাড়া সিঁড়ি বেয়ে সোজা আমাদের ডেরায় চলে এলেন। সওয়া একটার সময় উনি যখন ঠিক করলেন ফিরে যাবেন, তখন এলি এসে ওঁকে এই বলে হুঁশিয়ার করে দিলেন যে, ফ.ম. তখনও অফিসে রয়েছে। ক্রালার আর ও-মুখো না হয়ে আমাদের সঙ্গে দেড়টা অবধি বসে কাটালেন। তারপর জুতোজোড়া খুলে ফেরে মোজা-পরা পায়ে চিলেকোঠার দরজার মুখে গিয়ে ধাপে ধাপে নিচের তলায় নেমে গেলেন; সেখানে যাতে ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ না হয় তার জন্যে পনেরো মিনিট ধরে তাল সামলে ক্রালার বাইরের দিক থেকে ঢুকে নির্বিঘ্নে অফিস-ঘরে অবতরণ করলেন। ইতিমধ্যে ফ.ম.-কে কাটিয়ে এলি আমাদের ডেরায় উঠে এলেন ক্রালারকে নিয়ে যেতে। কিন্তু ক্রালার তার ঢের আগেই চলে গেলেন; তখনও তিনি খালি পায়ে সিঁড়ি দিয়ে নামছেন। রাস্তার লোকে যদি দেখত ম্যানেজার সায়েব বাইরে দাঁড়িয়ে জুতো পরছেন, তাহলে কী ধারনা হত তাদের? শুধু মোজা পায়ে ম্যানেজার সায়েব!

তোমার আনা।

বুধবার, ২৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৪৩

আদরের কিটি,

আজ মিসেস ফান ডানের জন্মদিন। আমরা ওঁকে জ্যাম দিয়েছি এক পাত্র, সেই সঙ্গে পনির, মাংস আর রুটির কুপন। ওঁর স্বামী, ডুসেল আর আমাদের ত্রাণকর্তাদের কাছ থেকে উনি পেয়েছেন নানা খাবারদাবার আর ফুল। এমনই এক সময়ে আমরা বাস করছি।

এই সপ্তাহে এলির মেজাজ ঠিক থাকে নি; দ্যাখ্-না-দ্যাখ্ তাঁকে বাইরে পাঠানো হয়েছে; বার বার তাঁকে বলা হয়েছে দৌড়ে গিয়ে এই জিনিসটা আনো, যার মানে বাড়তি ফরমাশ খাটা অথবা প্রকারান্তরে বলা যে এটা এলির ভুল হয়েছে। নিচের তলায় অফিসের কাজ পড়ে আছে এলিকে সেসব সারতে হবে, কুপহুইস অসুস্থ, ঠাণ্ডা লেগে মিপ্ বাড়িতে তাছাড়া এলির নিজেরও গোড়ালিতে মচকানোর ব্যথা, মনের মানুষকে নিয়ে ভাবনাচিন্তা, এবং তার ওপর খুঁত-খুঁত করা বাবা– এসব কথা মনে রাখলে বোঝা যায় এলির কেন সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেছে। আমরা এলিকে এই বলে প্রবোধ দিই যে, দু-একবার উনি জোর করে বলুন যে ওঁর সময় নেই– তাহলে বাজারের ফর্দ আপনা থেকেই হালকা হয়ে আসবে।

মিস্টার ফান ডানের ব্যাপারে আবার কোনো গোলমাল পাকিয়েছে। আমি বেশ বুঝতে পারছি শীগগিরই একটা কিছু বাধবে। কি কারণ যেন বাপি খুব ক্ষেপে আছেন। একটা কোনো বিস্ফোরণ ঘটবে, কিন্তু সেটা কী ধরনের তা জানি না। শুধু আমি যদি এই সব ঝগড়াঝাটিতে অতটা জড়িয়ে না পড়তাম তো ভালো হত! আমি যদি এ থেকে বেরিয়ে যেতে পারতাম! ওরা শীগগিরই আমাদের পাগল করে ছাড়বে।

তোমার আনা।

রবিবার, ১৭ অক্টোবর, ১৯৪৩

আদরের কিটি,

কী ভাগ্যিস, কুপহুইস ফিরে এসেছেন! এখনও ওঁর ফ্যাকাশে ভাব যায় নি। কিন্তু তা সত্ত্বেও উনি হাসিমুখে ফান ডানের জামাকাপড় বিক্রির ভার কাঁধে তুলে নিয়েছেন। একটা বিশ্রী

ব্যাপার হল, ফান ডানদের হাতে এই মুহূর্তে কোনো টাকাকড়ি নেই। মিসেস ফান হাতছাড়া করবেন না। মিস্টার ফান ডানের স্যুট সহজে বিক্রি হবে না, কেননা ওঁর খাঁই খুব বেশি। শেষ পর্যন্ত যে কী হবে এখনও বোঝা যাচ্ছে না। মিসেস ফান ডানকে তাঁর ফারকোট হাতছাড়া করতেই হবে। ওপর-তলায় এই নিয়ে স্বামী-স্ত্রীতে প্রচণ্ড বচসা হয়ে গেছে; এখন চলছে ওঁদের 'ও সোনার পুষ্টি' এবং 'আদরের কেলি' বলে মানভঞ্জনের পালা।

গত মাসে এই পুন্যবান বাড়িতে যে পরিমাণ গালিগালাজ বিনিময় হয়েছে তাতে আমি হকচকিয়ে গিয়েছি। বাপি মুখে কুলুপ এঁটে ঘুরে বেড়াচ্ছেন; কেউ ওঁকে ডেকে কিছু বললে উনি চমকে উঠে এমনভাবে মুখ তুলে তাকান যেন ওঁর ভয় আবার কার সঙ্গে কার কী খিটিমিটি হয়েছে ওঁকে তা মেটাতে হবে। উত্তেজনার দরুন মা-মণির গালে লাল ছোপ পড়েছে। মারগটের সব সময় মাথা ধরে আছে। ডুসেল অনিদ্রায় ভুগছেন। মিসেস ফান ডান সারাদিন গজগজ করেন আর আমার হয়েছে সম্পূর্ণ মাথা-খারাপের অবস্থা! সত্যি বলছি; মাঝে মাঝে আমার মনে থাকে না কার সঙ্গে আমাদের আড়ি চলছে আর কার সঙ্গেই বা ভাব। এসব জিনিস থেকে মনটাকে সরিয়ে রাখার একমাত্র উপায় হল– পড়াশুনা নিয়ে থাকা এবং আমি এখন প্রচুর পড়ছি।

তোমার আনা।

শুক্রবার, ২৯ অক্টোবর, ১৯৪৩

আদরের কিটি,

মিস্টার আর মিসেস ফান ডানের মধ্যে কয়েকবার তুমুল ঝগড়া হয়ে গেছে। ব্যাপারটা ঘটেছিল এই রকম– তোমাকে আমি আগেই বলেছি, ফান ডানদের টাকাপয়সা সব ফুরিয়ে গেছে। কিছুদিন আগে একদিন কথায় কথায় কুপহুইস বলেছিলেন ফার-ব্যবসায়ীর সঙ্গে তাঁর ভালো সম্পর্ক আছে; তাতে স্ত্রীর ফার-কোটটা বেচার কথা ফান ডানের মাথায় আসে। ফার-কোটটা খরগোসের চামড়ায় তৈরি এবং ভদ্রমহিলা সতেরো বছর ধরে সেটা সমানে পরেছেন। ওটা বেচে ভদ্রলোক পেয়েছেন ৩২৫ ফ্লোরিন– প্রচুর টাকা। যাই হোক, মিসেস ফান ডান চেয়েছিলেন যুদ্ধের পর কাপড়চোপড় কেনবার জন্যে টাকাটা রেখে দিতে; ধানাই-পানাই করার পর ফান ডান তাঁর স্ত্রীকে পরিষ্কার বলেন যে সংসারের জন্যে টাকাটা এখুনি দরকার।

সে যে কী চিৎকার আর চেঁচামেচি পা-দাপানো আর গালাগালি– তুমি ধারণা করতে পারবে না। সে এক ভয়ানক ব্যাপার– আমার পরিবারের সবাই সিঁড়ির নিচে রুদ্ধ নিশ্বাসে দাঁড়িয়ে, দরকার হলে টেনে হিঁচড়ে ওদের ছাড়িয়ে দেবার জন্যে তৈরি। এইসব গলাবাজি আর কান্না আর স্নায়বিক উত্তেজনা এমন অস্বস্তিকর এবং এত ক্লান্তিকর যে সন্ধ্যেবেলায় আমি কাঁদতে কাঁদতে বিছানায় ঢলে পড়লাম আর সৃষ্টিকর্তাকে এই বলে ধন্যবাদ দিলাম যে, কখনও কখনও আমি আধ ঘণ্টা সময় পাই যা আমার নিজস্ব।

মিস্টার কুপহুইস আবার আসছেন না; পাকস্থলী নিয়ে ওঁর ভোগান্তির একশেষ। রক্ত পড়া বন্ধ হয়েছে কিনা উনি জানেন না। যখন উনি বললেন ওঁর শরীর ভালো যাচ্ছে না এবং বাড়ি চলে যাচ্ছেন, তখন সেই প্রথম ওঁকে খুব কাহিল দেখলাম।

আমার খিদে হচ্ছে না, এ ছাড়া মোটের ওপর আমার খবর ভালো। সবাই বলছে– 'দেখে মনে হচ্ছে, তুমি মোটেই সুস্থ নও।' আমাকে এটা স্বীকার করতেই হবে যে, আমাকে

ঠিক রাখার জন্যে ওরা যথাসাধ্য করছে। গ্লুকোজ, কডলিভার অয়েল, ইস্ট ট্যাবলেট আর ক্যালসিয়াম– সব একধার থেকে খাওয়ানো হচ্ছে।

প্রায়ই আমি মানসিক স্থৈর্য হারিয়ে ফেলি; বিশেষ করে আমার মেজাজ খিঁচড়ে যায় রবিবারগুলোতে। সিসের মত ভারী এমন বুকচাপা আবহাওয়া, খালি হাই ওঠে। বাইরে একটি পাখিও ডাকে না, চারিদিকে মারাত্মক নৈঃশব্দ্যের ঘেরাটোপ, আমাকে ধরে বেঁধে যেন পাতালের দিকে টেনে নিয়ে যাবে।

যখন এইরকম হয়, তখন বাপি, মা-মণি আর মারগট, কারো সম্বন্ধেই আমার কোনো স্পৃহা থাকে না। একবার এ-ঘর একবার ও-ঘর, একবার নিচে একবার ওপরে আমি ঘুরে ঘুরে বেড়াই, মনে হয় আমি যেন সেই গান-গাওয়া পাখি যার ডানা দুটো কেটে দেওয়া হয়েছে আর সে যেন নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে খাঁচার গরাদে আছাড়ি-পিছাড়ি খাচ্ছে। আমার ভেতর থেকে কেউ চেঁচিয়ে বলে, 'যাও না বাইরে, হেসেখেলে বেড়াও, গায়ে খোলা হাওয়া লাগাও,' কিন্তু তাতেও আমার কোনো সাড়া জাগে না। আমি গিয়ে ডিভানে শুই, তারপর ঘুমিয়ে পড়ি, যাতে আরও তাড়াতাড়ি কাটে সময়, আর স্তব্ধতা আর সাংঘাতিক ভয়, কেননা তাদের কোতল করার কোনো উপায় নেই।

তোমার আনা।

বুধবার, ৩ নভেম্বর, ১৯৪৩

আদরের কিটি,

আমরা যাতে এমন কিছু করতে পারি, একাধারে যা শিক্ষামূলকও হবে, তার জন্যে বাপি লিডেনের টিচার্স ইনস্টিটিউটে প্রস্পেক্টাস চেয়ে চিঠি লিখেছিলেন। মারগট ঐ মোটা বইটা অন্তত তিনবার খুঁটিয়ে পড়েও তাতে এমন কিছু পায়নি যা তার মনে ধরে কিংবা যা তার সাধ্যায়ত্ত। বাপি তার আগেই ঠিক করে ফেলেছেন, উনি 'প্রাথমিক লাটিন' শিক্ষার পরীক্ষামূলক অনুশীলনী চেয়ে ইনস্টিটিউটে চিঠি লিখতে চান।

আমিও যাতে নতুন কিছু লিখতে শুরু করতে পারি, বাপি কুপহুইসকে তার জন্যে একটি শিশুপাঠ্য বাইবেল আনতে বলেছেন; তাতে শেষ পর্যন্ত নিউ টেস্টামেন্ট সম্পর্কে আমি কিছুটা জানতে পারব। মারগট খানিকটা বিচলিত হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'খানুকার জন্যে আনাকে তোমরা বুঝি বাইবেল দেবে?' বাপি জবাব দিলেন, 'হ্যাঁ, তা–সেন্ট নিকোলাস ডে হলে আরও ভালো হয় খানুকার (দ্রষ্টব্য– ৭ ডিসেম্বর, ১৯৪২) সঙ্গে যীশু ঠিক চলে না।'

তোমার আনা।

সোমবার সন্ধ্যা, ৮ নভেম্বর, ১৯৪৩

আদরের কিটি,

তুমি যদি আমার চিঠির তাড়া একটার পর একটা পড়ো, তুমি নিশ্চয়ই দেখে অবাক হবে কত রকমারি মেজাজে চিঠিগুলো লেখা হয়েছে। এখানকার আবহাওয়ার ওপর আমি এত বেশি নির্ভরশীল যে, এতে আমার বিরক্তিই ধরে; তাই বলে আমি একা নই– আমাদের সকলেরই এক অবস্থা। কোনো বই যদি আমার মনে রেখাপাত করে, অন্য কারো সঙ্গে মেশবার আগে নিজেকে আমার শক্ত হাতে ধরে রাখতে হয়; তা নইলে ওরা ভাববে আমার মনটা কি রকম অদ্ভুত হয়ে আছে। এই মুহূর্তে তুমি হয়ত লক্ষ্য করে থাকবে, আমি একটু মন-মরা হয়ে

আছি। আমি তোমাকে এর কারণ বলতে পারব না, তবে আমার বিশ্বাস আমি ভীরু প্রকৃতির মানুষ বলে, এবং তাতেই আমি সারাক্ষণ ধাক্কা খাই।

আজ সন্ধ্যেবেলায়, এলি তখনও এখানে, দরজায় খুব জোরে অনেকক্ষণ ধরে তীক্ষ্ণস্বরে বেল বেজে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে আমি সাদা হয়ে গেলাম, আমার পেট ব্যথায় মোচড় দিয়ে উঠল আর বুক ধড়ফড় করতে লাগল– বিলকুল ভয়ে। রাত্তিরে বিছানায় শুয়ে আমি দেখি মা-মণি নেই, বাপি নেই– এক অন্ধকার গুদামঘরে আমি একা। কখনও কখনও দেখি হয় রাস্তার ধার দিয়ে আমি ঘুরে বেড়াচ্ছি, নয় 'গুপ্ত মহলে' আগুন লেগেছে, নয় রাত্রে হানা দিয়ে ওরা আমাদের নিয়ে চলেছে। যা কিছুই দেখি, মনে হয় বাস্তবিকই সেটা ঘটেছে; এ থেকে কেমন যেন আমার মনে হয় এ সমস্তই আমার ভাগ্যে অতি সত্বর ঘটতে চলেছে। মিপ্‌ প্রায়ই বলে থাকেন আমাদের এখান এমন অনাবিল শান্তি দেখে ওঁর হিংসে হয়। সেটা হয়ত সত্যি, কিন্তু আমাদের তাবৎ ভয়ের কথা উনি হিসেবে আনেন না। আমি একদম ভাবতে পারি না পৃথিবীটা আবার কখনও আমাদের কাছে স্বাভাবিক হয়ে ধরা দেবে। আমি বলি বটে 'যুদ্ধের পর', কিন্তু সেটা শূন্যে সৌধ নির্মাণ মাত্র, যা কখনই বাস্তবে ঘটবে না। যখন পুরনো কথাগুলো মনে করি-আমাদের সেই বাড়ি, আমার মেয়ে বন্ধুরা, ইস্কুলের সেই মজা– তখন মনে হয় সেসব আমার নয়, যেন অন্য কারো জীবনে ঘটেছে।

আমাদের 'গুপ্ত মহলে' এই যে আমরা আটজন মানুষ– আমি দেখি আমরা যেন ঘন কালো জলদ মেঘে এক ফালি ছোট্ট নীল আকাশ। যে গোলাকার সুনির্দিষ্ট জায়গায় আমরা দাঁড়িয়ে, এখনও তা বিপদ-সীমার বাইরে, কিন্তু চারদিক থেকে মেঘগুলো ক্রমশ আমাদের ছেঁকে ধরছে এবং আসন্ন বিপদ থেকে আমাদের পৃথক করে রাখা বৃত্তটি ক্রমে তার গণ্ডি ছোট করে আনছে। এখন আমরা বিপদাপদে আর অন্ধকারে এমন ভাবে ঘেরাও হয়ে পড়েছি যে পরিত্রাণের পথ খুঁজতে গিয়ে আমরা পরস্পরের সঙ্গে ঠোকাঠুকি খাচ্ছি। আমরা সবাই নিচের দিকে তাকিয়ে দেখছি সেখানে মানুষজনেরা নিজেদের মধ্যে মারামারি কাটাকাটি করছে, ওপরে তাকিয়ে দেখছি কী শান্ত সুন্দর। তার মধ্যে আমাদের বিচ্ছিন্ন করে ফেলে সেই বিশাল অন্ধকার, যে আমাদের ওপরে যেতে দেবে না, যে আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে আছে অভেদ্য প্রাচীরের মত; সে আমাদের পিষে মারতে চায়, কিন্তু এখনও পারছে না। আমি কেবল চিৎকার করে ব্যগ্রতা জানাতে পারি; 'ইস্‌, কালো বৃত্তটা যদি পিছিয়ে গিয়ে আমাদের পথ একটু খোলসা করে দিত।'

তোমার আনা।

বৃহস্পতিবার, ১১ নভেম্বর, ১৯৪৩

আদরের কিটি,

এই অধ্যায়ের একটা ভালো শিরোনাম পেয়েছি– আমার ফাউন্টেন পেনের উদ্দেশ্যে স্মৃতিতর্পণ। আমার কাছে বরাবর আমার ফাউন্টেন পেনটি ছিল সবচাইতে অমূল্য একটি সম্পদ; বিশেষ করে তার মোটা নিবের জন্যে কলমটি আমার এত আদরের, কেননা একমাত্র মোটা নিব হলে তবেই আমার হাতের লেখাটা পরিপাটি হয়। আমার ফাউন্টেন পেনের পেছনে রয়েছে এক অতি দীর্ঘ আগ্রহ-জাগানো কলম-জীবন, তার কথা সংক্ষেপে আমি তোমাকে বলব।

আমার যখন ন'বছর বয়স, তখন আমার ফাউন্টেন পেনটি এসেছিল একটি প্যাকেটে (তুলো দিয়ে মোড়ানো অবস্থায়), 'বিনামূল্যের নমুনা' হিসেবে; পেনটি এসেছিল সুদূর আখেন

থেকে; সহৃদয় উপহারদাতা আমার দিদিমা সেখানে থাকতেন। ফ্লু হয়ে আমি তখন শয্যাগত, ফেব্রুয়ারির হাওয়া তখন বাড়ির চারদিকে হুঙ্কার দিয়ে ফিরছে। জমকালো সেই ফাউন্টেন পেনের ছিল একটা লাল চামড়ার খাপ। পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত বন্ধুকে সেটা দেখানো হয়ে গেল। আমি, আনা ফ্রাঙ্ক, একটি ফাউন্টেন পেন থাকার গর্বে গরবিনী। যখন আমি দশ বছরের হলাম তখন আমাকে কলমটি ইস্কুলে নিয়ে যেতে দেওয়া হল এবং শিক্ষয়িত্রী এমন কি তা দিয়ে আমাকে লেখবারও অনুমতি দিলেন।

যখন আমার বয়স এগারো, আমাকে আবার আমার সম্পত্তিটি সরিয়ে ফেলতে হল; কেননা ষষ্ঠ শ্রেণীর শিক্ষয়িত্রী ইস্কুলের দোয়াত কলমে ছাড়া আমাদের লিখতে দিতেন না।

বারো বছর বয়সে যখন আমি ইহুদী লিসিয়ামে (এক ধরনের মাধ্যমিক ইস্কুল যেখানে বিশেষভাবে প্রাচীন বিষয়াদি শেখানো হয়। ইউরোপের প্রায় সর্বত্র এর চলন আছে) ভর্তি হলাম তখন সেই বিরাট ঘটনা উপলক্ষে আমার ফাউন্টেন পেন পেল একটি নতুন খাপ; তাতে পেনসিল রাখারও ব্যবস্থা ছিল এবং জিপার টেনে বন্ধ করা যেত বলে খাপটা দেখতে আরও বাহারে হল।

আমার তেরো বছরে ফাউন্টেন পেনটি আমাদের সঙ্গে এসে উঠল 'গুপ্ত মহলে' সেখানে সে আমার হয়ে অসংখ্য ডায়রি আর রচনার ভেতর দিয়ে সজোরে ছুটেছে।

এখন আমার বয়স চৌদ্দ; আমাদের শেষ বছরটা আমরা একসঙ্গে কাটিয়েছি।

সেদিন ছিল শুক্রবার; বিকেল পাঁচটা বেজে গিয়েছিল। আমি আমার ঘর থেকে বেরিয়ে লিখবার জন্যে টেবিলে বসতে যাব, এমন সময় আমাকে একপাশে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে বাপিকে নিয়ে আমার জায়গায় গিয়ে বসল মারগট। ওরা 'লাটিন' নিয়ে রেওয়াজ করবে। টেবিলে ফাউন্টেন পেনটা বেকার পড়ে রইল আর তার মালিক দীর্ঘশ্বাস ফেলে বাধ্য হয়ে টেবিলের ছোট্ট একটা কোণে বসে বিন্‌গুলো ডলতে আরম্ভ করল। 'বিন্ ডলা' বলতে ছাতা-পড়া বিন্‌গুলোকে ফের চকচকে করে তোলা। পৌনে ছ'টার সময় মেঝে ঝাঁট দিয়ে খারাপ বিন্‌সুদ্ধ জঞ্জালগুলো খবরের কাগজে মুড়ে উনুনে বিসর্জন করলাম। সঙ্গে সঙ্গে জিনিসটা দাউ দাউ করে জ্বলে উঠতে দেখে আমার ভালই লাগল। কেননা আমি ভাবিনি যে প্রায় নিভন্ত আগুনে জিনিসটা ওরকম দপ্ করে জ্বলে উঠবে। এরপর আবার সব চুপচাপ, 'লাটিন পড়ুয়া'দের অনুশীলন শেষ, তারপর আমি টেবিলে গিয়ে বসে লেখার জিনিসগুলো গোছগাছ করতে শুরু করে দিলাম। কিন্তু এদিক-ওদিক তাকিয়ে কোথাও আমার ফাউন্টেন পেনটা দেখতে পেলাম না। আরও একবার খোঁজাখুঁজি করলাম, মারগটও খুঁজল, কিন্তু কোথাও আমার ফাউন্টেন পেনের হদিশ করতে পারলাম না। না তা হতেই পারে না! সেদিন সন্ধ্যেবেলায় ফাউন্টেন পেনটা না পেয়ে আমরা সবাই ধরে নিলাম যে, ওটা নিশ্চয়ই আগুনে পুড়েছে, আরও এই কারণে যে সেলুলয়েড জিনিসটা সাংঘাতিক রকমের দাহ্য।

পরে আমাদের মন-খারাপ-করা ভয়টাই সত্যি বলে প্রমাণ হল; পরদিন সকালে উনুন পরিষ্কার করতে গিয়ে ছাইয়ের মধ্যে বাপি পেন আটকানোর ক্লিপটা দেখতে পেলেন। সোনার নিবটার কোনো পাত্তা পাওয়া গেল না। বাপির ধারণা– 'ওটা নিশ্চয় আগুনে গলে গিয়ে পাথরে বা আর কিছুতে সেঁটে গেছে।'

খুব ক্ষীণ হলেও আমার একমাত্র সান্ত্বনা ঃ কলমটির সৎকার হয়েছে, ঠিক আমি যা পরে এক সময়ে চাই!

তোমার আনা।

বুধবার, ১৭ নভেম্বর, ১৯৪৩

আদরের কিটি,

এমন সব ঘটনা ঘটছে যে আমাদের মাথায় হাত। এলির বাড়িতে ডিপ্‌থিরিয়া, ফলে ছ'সপ্তাহ ধরে আমাদের এখানে ওঁর আসা বন্ধ। খাবার-দাবার আর কেনাকাটার ব্যাপারে আমরা মহাফাঁপড়ে পড়েছি। তাছাড়া এলির সাহচর্য থেকে আমাদের বঞ্চিত হওয়া তো আছেই। কৃপহুইস এখনও শয্যাগত এবং তিন সপ্তাহ ধরে ওঁর পথ্য বলতে শুধু পরিজ্‌ আর দুধ। ক্রালার নিশ্বাস ফেলার সময় পাচ্ছেন না।

মারগট তার লাটিন অনুশীলনীগুলো ডাকে দেয়, একজন শিক্ষক সেসব সংশোধন করে ফেরত পাঠান। মারগট এটা করে এলির নামে। শিক্ষকটি চমৎকার মানুষ এবং সেই সঙ্গে তাঁর রসবোধ আছে। অমন বুদ্ধিমতী ছাত্রী পেয়ে উনি নিশ্চয়ই খুব খুশী।

ডুসেল খুব ম্রিয়মাণ হয়ে আছেন, আমরা কেউই জানি না কেন। এটা শুরু হয় যখন দেখা গেল ওপরতলায় উনি একেবারেই মুখ খুলছেন না; মিস্টার এবং মিসেস ফান ডানের সঙ্গে ওঁর একেবারেই কথা নেই। এটা প্রত্যেকেরই নজরে পড়ে; দুদিন ধরে এটা চলবার পর মা-মণি তাঁকে সাবধান করে দিয়ে বলেন যে, উনি যদি এরকম করেন তাহলে মিসেস ফান ডান তাঁর জীবন অতিষ্ঠ করে তুলতে পারেন। ডুসেল বলেন যে, মিস্টার ফান ডানই প্রথম তাঁর সঙ্গে কথা বলা বন্ধ করেন এবং তিনি নিজে কিছুতেই আগ বাড়িয়ে কথা বলবেন না।

তোমাকে এখন বলা দরকার যে, গতকাল ছিল ষোলই নভেম্বর– ঐদিন 'গুপ্ত মহলে' ডুসেলের আসার এক বছর পূর্ণ হল। এই উপলক্ষে মা-মণি একটি গাছ উপহার পান, কিন্তু কিছুই পেলেন না মিসেস ফান ডান, যিনি গত কয়েক সপ্তাহ ধরে একথা গোপন করেননি যে, তাঁর মতে ডুসেলের উচিত আমাদের খাওয়ানো।

আমরা যে নিঃস্বার্থভাবে ডুসেলকে আমাদের মধ্যে নিয়েছি, তার জন্যে একদিন এই প্রথম ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা দূরের কথা, সে প্রসঙ্গে তিনি একটিও কথা বললেন না। ষোল তারিখ সকালে আমি যখন তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম যে, আমি অভিনন্দন জানাব, না শোক প্রকাশ করব– উনি তার উত্তরে বললেন– ওঁর কিছুতেই কিছু আসে যায় না। মা-মণি চেয়েছিলেন মধ্যস্থ হয়ে ব্যাপারটা মিটিয়ে দিতে, কিন্তু ওঁর পক্ষে এক পা-ও এগোনো সম্ভব হল না; শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা যে-কে সেই থেকে গেল।

ডের মান হাট আইনেন গ্রোসেন গাইস্ট্‌
উণ্ড্‌ ইস্ট্‌ সো ক্লাইন ফন টাটেন।
(মানুষের মন দরাজ, কত ছোট তার কাজ)

তোমার আনা।

শনিবার, ২৭ নভেম্বর, ১৯৪৩

আদরের কিটি,

কাল রাত্তিরে ঘুমিয়ে পড়বার আগে হঠাৎ কে আমার চোখের সামনে এসে দাঁড়াল, বলো তো? লিস্‌! আমি দেখলাম শতচ্ছিন্ন বস্ত্রে জীর্ণ শীর্ণ মুখে সে আমার সামনে দাঁড়িয়ে। প্রকাণ্ড বড় বড় চোখ মেলে বিষণ্নভাবে আর ভর্ৎসনার দৃষ্টিতে আমার দিকে সে তাকিয়ে ছিল; যেন তার চোখ দিয়ে আমাকে সে বলছিল– 'ওহে আনা, কেন আমাকে তুমি ত্যাগ করেছ? এই নরক থেকে তুমি আমাকে বাঁচাও, আমাকে টেনে তোলো!'

আমার তো তাকে সাহায্য করার ক্ষমতা নেই, আমি শুধু চেয়ে দেখতে পারি, অন্যরা কিভাবে কষ্ট পাচ্ছে আর মারা যাচ্ছে। তাকে আমাদের কাছে এনে দাও বলে আমি শুধু সৃষ্টিকর্তার কাছে প্রার্থনা করতে পারি।

আমি কেবল লিস্‌কে দেখেছি; অন্য কাউকে নয়; এখন আমি এর অর্থ বুঝতে পারছি। আমি ওকে বিচার করেছিলাম ভুলভাবে; আমি তখন খুব ছোট বলে ওর মুশকিলগুলো বুঝিনি। ওর তখন এক নতুন মেয়ে-বন্ধুর ওপর খুব টান এবং ওর এটা মনে হয়েছিল যে, আমি যেন তাকে ওর কাছছাড়া করতে চাইছি। বেচারার মনে কতটা লেগেছিল আমি জানি; আমি নিজেকে দিয়ে জানি মনের অবস্থা কেমন হয়।

কখনও কখনও এক ঝলকে তার জীবনের কোনো কিছু আমার চোখে ভেসে উঠেছে, পরক্ষণেই স্বার্থপরের মত আমি আমার নিজস্ব সুখস্বাচ্ছন্দ্য আর সমস্যার মধ্যে ডুবে গিয়েছি। আমি তার প্রতি যে ব্যবহার করেছি তা খুবই খারাপ এবং এখন সে ফ্যাকাসে মুখে আর করুণ দৃষ্টিতে কী অসহায়ভাবে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। শুধু আমি যদি তাকে সাহায্য করতে পারতাম। হে সৃষ্টিকর্তা, আমি যা ইচ্ছে করি তাই আমি পাই, আর ও বেচারা কী সাংঘাতিক নিয়তির ফেরে পড়েছে। আমি তো ওর চেয়ে বেশি পুণ্য করিনি; লিস্‌ও তো চেয়েছিল ন্যায়ের পথে থাকতে। তবে কেন আমার ভবিতব্য হল বেঁচে থাকা আর ওর সম্ভবত মৃত্যু? আমাদের মধ্যে কী তফাত ছিল? আজ কেনই বা আমরা পরস্পর থেকে এতটা দূরে?

স্বীকার করছি, কত যে মাস; হ্যাঁ, তা প্রায় একটা বছর, আমি তার কথা ভাবিনি। সম্পূর্ণ যে ভুলেছিলাম তা নয়। তবে দুঃখে ভেঙে পড়া অবস্থায় তাকে দেখার আগে তার কথা এভাবে কখনও ভাবিনি।

ও লিস্‌, যুদ্ধ শেষ হওয়া পর্যন্ত যদি তুই বেঁচে থাকিস, আবার আমাদের মধ্যে ফিরে আসবি; আমি তখন আবার তোকে কাছে টেনে নেব; তোর প্রতি যে অন্যায় করেছি আমি কোনো না কোনোভাবে সেই দোষ স্খালন করব।

তবে আমি যখন তাকে সাহায্য করতে সক্ষম হব, তখন হয়ত আজকের মত এত চরমভাবে সাহায্যের তার দরকার হবে না। আমার জানতে ইচ্ছে করে, লিস্‌ কি আমার কথা ভাবে? ভাবলে, ওর মনের মধ্যে কি রকম হয়?

হে মঙ্গলময় প্রভু, ওকে তুমি রক্ষা করো, ও যাতে অন্তত নিঃসঙ্গ না হয়। প্রভু, ওকে দয়া করে একটু বলো আমি প্রীতি আর সমবেদনার সঙ্গে ওর কথা ভাবি, তাতে হয়ত ওর সহ্যশক্তি আরও বাড়বে।

আমি আর এ নিয়ে ভাবব না, কেননা ভেবে কোনো লাভ নেই। আমার সামনে সারাক্ষণ ভাসতে থাকে তার দুটো ড্যাবডেবে চোখ, আমি কিছুতেই তা থেকে নিজেকে সরাতে পারি না। যে জিনিস তার ঘাড়ে এসে পড়েছে, সেটা ছাড়াও আমার জানতে ইচ্ছে করে, নিজের ওপর সত্যিকার ভরসা আছে তো তার?

আমি সেসব জানি না, কোনোদিন স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে জিজ্ঞেস পর্যন্ত করিনি।

লিস্‌, লিস্‌, শুধু আমি যদি তোকে তুলে আনতে পারতাম, যদি তোর সঙ্গে আমার সব সুখস্বাচ্ছন্দ্য ভাগ করে নিতে পারতাম। আমি নিরুপায়, অনেক দেরি হয়ে গেছে কিংবা আমি যে ভুল করেছি এখন তা ঠিক করে নেওয়ার কোনো উপায় নেই। কিন্তু আমি আর কখনো তাকে ভুলছি না, আমি সর্বক্ষণ তার জন্যে প্রার্থনা করব।

তোমার আনা।

সোমবার, ৬ ডিসেম্বর, ১৯৪৩

আদরের কিটি,

সেন্ট নিকোলাস ডে যখন আসন্ন, তখন আমাদের সকলেরই মনের মধ্যে জেগে উঠেছিল গত বছরের সেই সুন্দর করে সাজানো ঝুড়িটার কথা; বিশেষ করে আমার মনে হল, এ বছর কিছুই না করলে খুব বাজে লাগবে। এই নিয়ে অনেক ভেবে ভেবে শেষ পর্যন্ত একটা জিনিস আমার মাথায় এল, তাতে বেশ মজাই হবে।

পিমের সঙ্গে আমি এ নিয়ে কথা বললাম। এক সপ্তাহ আগে প্রত্যেকের জন্যে আমরা একটি করে ছোট্ট পদ্য লেখা শুরু করেছিলাম।

রবিবার সন্ধ্যেবেলায় পৌনে আটটা নাগাদ ময়লা কাপড় রাখার বড় ঝুড়িটা ধরাধরি করে ওপরতলায় আমরা হাজির হলাম। তার গায়ে ছোট ছোট মূর্তি আঁকা আর সেই সঙ্গে গিঁট বাঁধা নীল আর গোলাপী কার্বন কাগজ। একটা বড় বালির কাগজ দিয়ে ঝুড়িটা ঢাকা, তাতে আলপিন দিয়ে গাঁথা একটা চিঠি। আজব গাঁটরির আকার দেখে সবাই বেশ অবাক।

বালির কাগজ থেকে চিঠিটা বের করে নিয়ে আমি পড়তে থাকি ঃ

সাণ্টা ক্লজের পুনরাগমন
তা বলে নয় কো আগের মতন
গতবার হয়েছিল যত ভালো
হবে না এবার তত জমকালো।
তখন যে ছিল উজ্জ্বল আশা
ভবিষ্যৎকে মনে হত খাসা,
স্বাগত জানাব ভাবেই নি কেউ
সাণ্টাকে পুনরপি এবারেও।
হাত খালি, কিছু নেইকো দেবার
তবুও জাগাব আত্মাকে তাঁর,
ভেবে ভেবে বের করা গেছে কিছু
যে যার জুতোয় দেখ হয়ে নিচু।

ঝুড়ি থেকে যার যার জুতো বের করে নিতেই প্রত্যেকের সে কী হো হো করে হাসি। প্রত্যেকটি জুতোর মধ্যে কাগজের একটি ছোট মোড়ক, তাতে জুতোর মালিকের ঠিকানা লেখা।

তোমার আনা।

বুধবার, ২২ ডিসেম্বর, ১৯৪৩

আদরের কিটি,

এমন খারাপ ধরনের ফ্লু হয়েছিল যে, এর মধ্যে আর তোমাকে লিখে উঠতে পারিনি। এই জায়গায় অসুখে পড়লে ভোগান্তির একশেষ। একবার, দুবার, তিনবার– কাশতে হলেও আমাকে কম্বলের তলায় গিয়ে দেখতে হবে যেন আওয়াজ বাইরে না যায়। সাধারণত এর একমাত্র ফল হয় এই যে, সারাক্ষণ গলা সুড়সুড় করে; তখন দুধ আর মধু, চিনি কিংবা লজেন্সের শরণাপন্ন হতে হয়।

যে পরিমাণ দাওয়াই আমার ওপর চাপানো হয়েছে ভাবলে মাথা ঘুরে যায়। গা দিয়ে

ঘাম বের করা, গরম সেঁক, বুকে জলপট্টি, বুকে শুক্‌নো পট্টি, গরম পানীয়, গার্গল্‌ করা, গলায় বেল্ট লাগানো, চুপচাপ শুয়ে থাকা, বাড়তি উষ্ণতার জন্যে কুশন, গরম পানির বোতল, লেমন স্কোয়াশ, এবং তার ওপর, দু ঘণ্টা পর পর থার্মোমিটার।

এভাবে কি সত্যিই কেউ ভালো হয়ে উঠতে পারে? সবচেয়ে যন্ত্রণাদায়ক ব্যাপার হয় তখনই, যখন মিস্টার ডুসেল ভাবেন যে তিনি ডাক্তারি করবেন; উনি এসে আমার খালি গায়ে বুকের ওপর তাঁর মাথা রাখবেন, যাতে ভেতরকার শব্দ শোনা যায়।

একে তো ওঁর চুলের দরুন অসহ্য রকমের সুড়সুড়ি লাগে, তার ওপর মরমে মরে যাই– হোক না, কবে তিরিশ বছর আগে উনি মেডিকেল পড়েছিলেন এবং ওঁর একটা ডাক্তার খেতাব আছে। ভদ্রলোক এসে কেন আমার বুকের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়বেন। আর যাই হোক, উনি তো আমার প্রেমিক নন! আর তাছাড়া, আমার ভেতরটা সুস্থ, না অসুস্থ উনি তো তার আওয়াজও পাবেন না; দিন দিন উনি যে রকম ভয়াবহ ধরনের কম শুনছেন, তাতে আগে তো ওঁর কানের ভেতরেই নল ঢোকানো দরকার।

ঢের হয়েছে, অসুখের কথা থাক। আমি আবার পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠেছি, লম্বা হয়েছি আরও এক সেন্টিমিটার, ওজন বেড়েছে দুই পাউণ্ড, রং হয়েছে ফ্যাকাসে, সেই সঙ্গে জ্ঞানলাভের সত্যিকার স্পৃহা বেড়ে গেছে।

তোমাকে দেবার মত খুব বেশি খবর নেই। এখন আর আগের মত নয়, আমরা সবাই মিলেমিশে আছি। ঝগড়াঝাঁটি নেই– অন্তত ছ'মাস ধরে এখানে বিরাজ করছে একটানা শান্তি। আগে কখনও এমন হয়নি। এলি এখনও আমাদের কাছ ছাড়া।

আমরা বড়দিনের জন্যে বাড়তি তেল, মিষ্টি আর সিরাপ পেয়েছি; 'প্রধান উপহার' হল একটা ব্রুচ– আড়াই সেন্টের মুদ্রা দিয়ে তৈরি সুন্দর ঝকঝকে দেখতে। যাই হোক, জিনিসটা এত ভালো যে, ভাষায় প্রকাশ করা যায় না।

মা-মণিকে আর মিসেস ফান ডানকে মিস্টার ডুসেল একটা চমৎকার কেক দিয়েছেন; উনি মিপকে দিয়ে কেকটা তৈরি করিয়েছেন। মিপ আর এলির জন্যে আমিও কিছু জিনিস রেখেছি। আমার পরিজ থেকে, বুঝলে, অন্তত ছমাস ধরে আমি চিনি বাঁচিয়েছি; কুপহুইসের সাহায্যে তাই দিয়ে আমি মিঠাই বানিয়ে নেব।

বিশ্রী বাদুলে আবহাওয়া, উনুনে সোঁদা গন্ধ, প্রত্যেকের পেটের মধ্যে খাবার গ্যাজ গ্যাজ করছে, তার ফলে চারদিকে মেঘ-ডাকা আওয়াজ। যুদ্ধ এক জায়গায় এসে দাঁড়িয়ে আছে, মনোবলের অবস্থা যাচ্ছেতাই।

তোমার আনা।

শুক্রবার, ২৪ ডিসেম্বর, ১৯৪৩

আদরের কিটি,

আগেই লিখেছি এখানকার আবহাওয়ায় আমরা কতটা আক্রান্ত হচ্ছি; আমি মনে করি আমার ক্ষেত্রে এই অসুবিধে ইদানীং আরও বৃদ্ধি পেয়েছে।

'হিমেলহোখ ইয়াউখ্‌ৎসেণ্ড্‌ ইণ্ডৎসুম টোডা বেট্রুব্ট্' (গয়টের বিখ্যাত পঙ্ক্তি– 'সুখের স্বর্গে নয় দুঃখের রসাতলে') এটা রীতিমত এখানে খাপ খায়। আমি যখন অন্য ইহুদী ছেলেমেয়েদের সঙ্গে তুলনা করে শুধু নিজেদের সৌভাগ্যের কথা ভাবি তখন মনে হয় আমি আছি 'সুখের স্বর্গে'; আর 'দুঃখের রসাতলে' আছি মনে হয় যখন, যেমন আজকে, মিসেস

কুপহুইস এসে বলছিলেন তাঁর মেয়ে করি-র হকি ক্লাব, ডোঙায় করে জলযাত্রা, থিয়েটার করা আর সেই সঙ্গে তার বন্ধুদের কথা। এটা নয় যে করিকে আমি হিংসে করি, আসলে আমার খুব ইচ্ছে হয় একবার প্রচুর আনন্দ করি এবং হাসতে হাসতে যেন পেটে খিল ধরে যায়। বিশেষ করে বড়দিন আর নববর্ষের এই ছুটির মরসুম আর এখন কিনা আমরা এখানে আটক হয়ে আছি একঘরের মতন।

তবু এটা আমার লেখা উচিত নয়, কেননা তাতে মনে হবে আমি অকৃতজ্ঞ এবং অবশ্যই আমি তিলকে তাল করছি। এ সত্ত্বেও, আমাকে তুমি যাই ভাবো, আমি সব কিছু চেপে রাখতে পারি না, সুতরাং আমি তোমাকে মনে করিয়ে দেব আমার সেই গোড়ার কথাগুলো; 'কাগজের সবই সয়।'

যখন কামাকাপড়ে হাওয়া আর মুখগুলোতে হিম লাগিয়ে লোকে বাইরে থেকে আসে, তখন 'কবে আমরা খোলা হাওয়ার গন্ধ নেবার সুযোগ পাব?'– এই ভাবনা মনে যাতে উদয় না হয় তার জন্যে কম্বলে মুখ গুঁজে রাখতে পারি। আর যেহেতু আমি কম্বলে মুখ তো গুঁজবই না, বরং করব তার উল্টো– আমাকে মাথা উঁচু রাখতেই হবে, সাহসে বুক বাঁধতে হবে, ভাবনাগুলো আসবে একবার নয়, আসবে অসংখ্যবার।

বিশ্বাস করো, যদি তুমি দেড় বছর ধরে আটক থাকো, কখনও কখনও তোমার তা অসহ্য বলে মনে হবে। সুবিচার আর কৃতজ্ঞতা সত্ত্বেও, তোমার অনুভূতিগুলোকে তুমি পিষে মারতে পারো না। সাইকেল চালানো, নাচা, শিস্ দেওয়া, পৃথিবীকে চোখ মেলে দেখা, তারুণ্যকে অনুভব করা– আমি তার জন্যে মরে যাই; তবু বাইরে এটা প্রকাশ করা চলবে না, কেননা সময় সময় আমি ভাবি যদি আমরা আটজন সবাই নিজেদের নিয়ে খেদ করতে থাকি আমরা হাঁড়িমুখ করে ঘুরে বেড়াই, তাতে আমাদের কী দশা হবে?

মাঝে মাঝে আমি নিজেকে জিজ্ঞেস করি, 'আমি একজন কাঁচা বয়সের মেয়ে, কিছুটা হাসিখেলা আমার না হলেই নয়– এটা কি ইহুদী বা ইহুদী নয় যারা, তারা কি অনুধাবন করতে পারে?' আমি জানি না; এ কথা কাউকে বলতেও পারিনি, কারণ আমি জানি করতে গেলে আমি কান্নায় ভেঙে পড়ব। কাঁদলে বুকটা কী যে হালকা হয়।

আমার সব তত্ত্বজ্ঞান এবং আমার শত চেষ্টা সত্ত্বেও প্রতিদিন আমার মনে হয় এমন একজন সত্যিকার জননী নেই– যিনি আমার এবং আমাকে বুঝতে পারেন। তাই যাই করি আর যাই লিখি, আমি সেই 'মা-সোনা'র কথা ভাবি যা আমি পরে আমার সন্তানদের ক্ষেত্রে হতে চাই। সেই 'মা-সোনা', যিনি সাধারণ কথাবার্তায় যা বলা হয় তার সব কিছুতেই অতখানি গুরুত্ব দেবেন না, অথচ যিনি আমার কথাগুলো নিশ্চয়ই গুরুত্ব দিয়ে শুনবেন। কী করে তা বলতে পারব না, তবে আমি লক্ষ্য করেছি 'মা-সোনা' কথার মধ্যেই সব কিছু বলা আছে। জানো আমি কী খুঁজে পেয়েছি?

'মা-মণি'কে আমি প্রায়ই 'ও মা' বলে ডাকি, যাতে কাছাকাছি ধ্বনি থেকে আমি 'মা-সোনা' বলার অনুভূতিটা পাই; তা থেকে আসে 'মা গো', সেটা যেন 'মা-সোনা'রই অসম্পূর্ণ রূপ; 'সোনা' যোগ করে আমি তাঁকে কত সম্মানিত করতে চাই, কিন্তু হলে কী হবে, উনি সে সব বোঝেন না। এটা ভালো, কেননা জানলে উনি অসুখী হতেন।

এই প্রসঙ্গে যথেষ্ট হল, লেখার ফলে 'দুঃখের রসাতলে'র ভাব কিছুটা কেটে গেছে।

তোমার আনা।

সোমবার, ২৭ ডিসেম্বর, ১৯৪৩

আদরের কিটি,

শুক্রবার সন্ধ্যেবেলা জীবনে এই প্রথম বড়দিনে কিছু পেলাম। কুপহুইস, ক্রালার আর মেয়ের দল আবার মনোরম চমক লাগিয়েছেন। মিপ্ একটা ভারি সুন্দর বড়দিনের কেক বানিয়েছিলেন, তাতে লেখা 'শান্তি ১৯৪৪'। এলি দিয়েছিলেন যুদ্ধের আগে যে রকম ভালো মিষ্টি বিস্কুট পাওয়া যেত সেই রকম বিস্কুট এক পাউণ্ড। পেটার, মারগট আর আমার জন্যে এক বোতল দই আর বড়দের প্রত্যেকের জন্যে এক বোতল করে বীয়ার। প্রত্যেকটি জিনিস সুন্দর ভাবে সাজানো ছিল এবং বিভিন্ন প্যাকেটের ওপর ছবি সাঁটা ছিল। এ বারে বড়দিন এত তাড়াতাড়ি চলে গেল যে আমাদের বুঝতেই দিল না।

তোমার আনা।

বুধবার, ২৯ ডিসেম্বর, ১৯৪৩

আদরের কিটি,

কাল সন্ধ্যেবলায় আবার মনটা খুব খারাপ হয়েছিল। ঠাকুমা আর লিসির কথা আমার মনে পড়ে গিয়েছিল। দিদু, ও আমার দিদু, কী কষ্ট পেয়েছিলেন! কী ভালো ছিলেন! আমরা তার কতটুকু বুঝেছিলাম। এসব ছাড়াও, সারাক্ষণ তিনি অন্যের কাছ থেকে সযত্নে গোপন করে রেখেছিলেন একটি ভয়ঙ্কর জিনিস (একটি গুরুতর আন্ত্রিক ব্যাধি)।

দিদু ছিলেন বরাবর কত অনুগত, কত ভালো একজন মানুষ; আমাদের একজনকেও কখনও তিনি বিপদে পড়তে দেননি। আমি যাই করি, যত দুষ্টুই হই– দিদু সব সময় আমার পাশে দাঁড়াতেন।

দিদু, তুমি কি আমাকে ভালবাসতে, নাকি তুমিও আমাকে বুঝতে পারোনি? আমি জানি না। কেউ কখনও দিদুকে নিজেদের বিষয়ে কথা বলেনি। দিদু নিশ্চয়ই নিজেকে খুব নিঃসঙ্গ বোধ করতেন, আমরা থাকা সত্ত্বেও তিনি কত একা ছিলেন। বহুজনে ভালবাসলেও একজন নিঃসঙ্গ বোধ করতে পারেন, কেননা তিনি তো কারো কাছেই 'এক এবং একমাত্র' নন।

আর লিস্, এখনও কি সে বেঁচে আছে? কী করছে সে? হে সৃষ্টিকর্তা, তুমি লিস্‌কে দেখো, তাকে আমাদের কাছে ফিরিয়ে এনো। লিস্, আমি সবসময় তোমার মধ্যে দেখি আমার কপালে যা ঘটতে পারত, আমি তোমার জায়গায় নিজেকে রেখে দেখে থাকি। এখানে যা ঘটে তা নিয়ে কেন তবে আমি প্রায়ই মন খারাপ করি? যে সময়ে আমি তার এবং তার সঙ্গীদের বিপদের কথা ভাবি, তখন ছাড়া অন্য সবসময়ে আমার কি আনন্দিত, সন্তুষ্ট আর সুখী হওয়া উচিত নয়? আমি স্বার্থপর আর ভীতু। কেন আমি সব সময় সাংঘাতিক সাংঘাতিক দুঃস্বপ্ন আর বিভীষিকা দেখি– কখনও কখনও আমি ভয়ে আর্তনাদ করে উঠতে চাই। কারণ, এখনও এত কিছু সত্ত্বেও, ঈশ্বরে আমার যথেষ্ট বিশ্বাস নেই। আমাকে তিনি কত কিছু দিয়েছেন– আমি যা পাবার অধিকারী নই– তবু আমি প্রতিদিন কত কিছু করি যা করা ঠিক নয়। তুমি যদি তোমার স্বজাতীয় মানুষজনের কথা ভাবো, তোমার তাহলে ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছা করবে, সারাদিন কেঁদেও তুমি কূল পাবে না। একটাই করবার আছে, সৃষ্টিকর্তার কাছে প্রার্থনা করা– তিনি এমন অলৌকিক কিছু করুন যাতে তাদের কেউ কেউ বেঁচে থাকে। সেটাই আমি করছি– এই আমার আশা।

তোমার আনা।

রবিবার, ২ জানুয়ারি, ১৯৪৪

আদরের কিটি,

আজ সকালে কিছু করবার না থাকায় আমার ডায়রির কিছু কিছু পাতা উল্টাচ্ছিলাম। বেশ কয়েকবার চোখে পড়ল 'মা-মণি'র বিষয়ে লেখা চিঠিগুলো– এমন মাথা গরম করে চিঠিগুলো লেখা হয়েছে যে, আমি পড়ে রীতিমত স্তম্ভিত হয়ে নিজেকে প্রশ্ন করলাম– 'আনা, ঘৃণার কথা এই যে বলেছো এ কি প্রকৃতই তুমি? ইস্, এ তুমি কী করে পারলে, আনা?' খোলা পাতা সামনে নিয়ে বসে আছি। এ বিষয়ে ভাবছিলাম যে, কী করে আমার মধ্যে এ রকম ক্রোধ উপচে পড়ল এবং সত্যিই ঘৃণার মতন এমন জিনিসে মন ভরে উঠল যে, তোমাকে সব কিছু গোপনে না বলে পারলাম না। এক বছর আগের আনাকে আমি বুঝতে এবং তার অপরাধ মার্জনা করতে চেষ্টা করছি, কেননা কিভাবে তা ঘটল সেটা পেছনে তাকিয়ে যতক্ষণ না ব্যাখ্যা করতে পারছি, ততক্ষণ এইসব অভিযোগ তোমার কাছে ফেলে রেখে আমার বিবেক শান্তি পাবে না।

আমার মনের অবস্থা হয়েছিল যেন (বলতে গেলে) ডুবে যাওয়ার মতন– ফলে, সবকিছু আমি শুধু নিজেকে দিয়ে দেখছিলাম; আমি অন্যপক্ষের কথাগুলো নির্বিকারচিত্তে বিচার করতে পারিনি; মাথা গরম করে মেজাজ দেখিয়ে যাদের আমি চটিয়েছি কিংবা মনে আঘাত দিয়েছি, সেইভাবে তাদের কথার আমি জবাব দিতে পারিনি।

নিজের মধ্যে আমি নিজেকে আড়াল করেছি, শুধুমাত্র নিজেরটা দেখেছি আর আমার ডায়রিতে চুপচাপ লিখে রেখেছি আমার যত সুখ-দুঃখ আর ঘৃণার কথা। আমার কাছে এই ডায়রির অনেক মূল্য, কেননা অনেক জায়গায় এই ডায়রি হয়ে উঠেছে আমার স্মৃতিকথার বই, কিন্তু বেশ অনেক পৃষ্ঠাতেই আমি লিখে দিতে পারতাম 'অতীতের কথা চুকেবুকে গেছে।'

এক সময়ে আমি মা-মণির ওপর প্রচণ্ড রেগে যেতাম, এখনও মাঝে মাঝে রেগে যাই। মা-মণি আমাকে বোঝেন না এটা ঠিক, কিন্তু আমিও তো ওঁকে বুঝি না। আমাকে তিনি ভালবাসতেন খুবই, স্নেহের ঘাটতি ছিল না, কিন্তু আমার দরুন এত রকমের অপ্রীতিকর অবস্থায় ওঁকে পড়তে হয়েছে, সেইসঙ্গে অন্যান্য দুশ্চিন্তা আর মুশকিলের জন্যে ওঁকে এমন ভয়ে ভয়ে থাকতে হত এবং ওঁর মেজাজ এমন তিরিক্ষে হয়ে থাকত যে, এটা স্পষ্ট বোঝাই যায় কেন উনি আমাকে দাঁতঝাড়া দিতেন।

আমি সে জিনিসটাতে অতিরিক্ত গুরুত্ব দিতাম, মনে মনে ক্ষুণ্ন হতাম এবং মা-মণির প্রতি রূঢ় ব্যবহার করে তাঁকে আরও চটিয়ে দিতাম; এই সবের ফলে আবার মা-মণির মন খারাপ হত। সুতরাং প্রকৃতপক্ষে সমস্ত সময় এটা হত অশান্তি আর দুঃখকষ্টের ঘাত প্রতিঘাত। দুজনের কারো পক্ষেই সেটা ভালো ছিল না, তবে সেটা কেটে যাচ্ছে।

আমি এসব সম্পর্কে চোখ বুজে থেকে নিজের মনে অসম্ভব দুঃখ পেয়েছি। তবে তারও মানে বোঝা যায়। খুব রাগ হলে সাধারণ জীবনে আমরা বন্ধ ঘরে বার দুই দুম দুম করে পা ঠুকে কিংবা আড়ালে মা-মণিকে এটা-ওটা বলে গায়ের ঝাল ঝেড়ে নিতে পারি– কাগজে ঐ রকম চড়াগলায় চোটপাটের ব্যাপারটাও তাই।

আমার জন্যে মা-মণির চোখের পানি ফেলার পর্যায় শেষ হয়ে গেছে। আগের চেয়ে এখন আমার জ্ঞানবুদ্ধি বেড়েছে, মা-মণিও এখন আগের মত একটুতেই চটে যান না। বিরক্ত হলে আমি সাধারণত মুখ বুঝে থাকি, মা-মণিও তাই করেন; কাজেই লোকে দেখে, আমরা

দুজনে আগের চেয়ে ঢের বেশি মানিয়ে চলছি। পরাধীন শিশুর মত করে মা-মণিকে আমি সত্যি ভালবাসতে পারি না– আমার মধ্যে সে ভাব আদৌ নেই।

মনে মনে এই বলে আমি আমার বিবেককে শান্ত করি যে, মা-মণি তাঁর হৃদয়ে বহন করার চেয়ে কড়া কথাগুলো কাগজে থেকে যাওয়াই ভালো।

তোমার আনা।

বুধবার, ৫ জানুয়ারি, ১৯৪৪

আদরের কিটি,

আজ আমি তোমার কাছে দুটো জিনিস কবুল করব। তাতে বেশ খানিকটা সময় লাগবে। কাউকে আমায় বলতেই হবে, সেদিক থেকে তোমাকে বলাই সবচেয়ে ভালো। কেননা যতদূর জানি, যে অবস্থাই আসুক, তুমি সব সময় গোপন কথা রক্ষা করো।

প্রথমটা মা-মণিকে নিয়ে। তুমি জানো, মা-মণির ব্যাপারে আমি প্রচুর গজগজ করেছি তবু নতুন করে আমি চেষ্টা করেছি তাঁর মন পেতে। আজ হঠাৎ আমি স্পষ্ট বুঝতে পারছি তাঁর মধ্যে কিসের অভাব। মা-মণি নিজেই আমাদের বলেছেন যে, আমাদের তিনি মেয়ের চেয়ে বেশি করে বন্ধু হিসেবে দেখেন। তা সে সব খুব ভালো কথা। কিন্তু তবু মায়ের স্থান কখনও বন্ধু নিতে পারে না।

আমি একান্তভাবে চাই আমার মা হবেন এমন এক আদর্শ– যাঁকে আমি অনুসরণ করতে পারি, আমি চাই যাতে তাঁকে আমি ভক্তিশ্রদ্ধা করতে পারি। আমার মনে হয়, মারগট এসব জিনিস অন্য ভাবে দেখে এবং আমি তোমাকে যা বললাম ও কখনই তা অনুধাবন করতে পারবে না। আর বাপি তো মা-মণির ব্যাপারে কোনো রকম বাদানুবাদে যেতে রাজী নন।

আমার ধারণায়, মা হবেন এমন একজন স্ত্রীলোক– বিশেষত নিজেরই সন্তানদের ব্যাপারে যিনি প্রথমত যথেষ্ট বিবেচনার পরিচয় দেবেন– যখন তারা আমাদের বয়সে পৌঁছবে এবং আমি চেঁচামেচি করলে– ব্যথায় নয়, অন্য সব ব্যাপারে– উনি তা নিয়ে আমাকে ঠাট্টা করবেন না, মা-মনি যা করে থাকেন।

আমি কখনই ভুলতে পারিনি তাঁর একটা জিনিস, যেটা হয়ত খানিকটা বোকামি বলে মনে হবে। আমাকে একদিন দাঁতের ডাক্তারের কাছে যেতে হয়েছিল।

মারগটকে নিয়ে মা-মণি যাচ্ছিলেন আমার সঙ্গে; আমি সাইকেল নিয়ে যাব বলতে ওঁরা রাজী হলেন। দাঁতের ডাক্তার সেরে, যখন আমরা বাইরে বেরোলাম– মারগট আর মা-মণি বললেন ওরা শহরের বাজারে যাবেন কী একটা জিনিস দেখতে কিংবা কিছু একটা কিনতে– ঠিক কী জন্যে আমার মনে নেই।

আমিও যেতে চাইলে ওঁরা আমাকে নিয়ে যেতে রাজী হলেন না– কেননা আমার সঙ্গে সাইকেল ছিল। রাগে আমার চোখ ফেটে পানি বেরিয়ে এল; তাই দেখে মারগট আর মা-মণি আমাকে নিয়ে হাসাহাসি করতে লাগলেন। তাতে আমি প্রচণ্ড রেগে গিয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে ওদের জিভ ভেঙাতে লাগলাম– ঠিক সেই সময় এক বৃদ্ধা সেখান দিয়ে যাচ্ছিলেন, আমার কাণ্ড দেখে তাঁর চক্ষু ছানাবড়া! সাইকেল করে বাড়ি ফিরে এসে, আমার মনে আছে, আমি অনেকক্ষণ ধরে কেঁদেছিলাম।

সেদিন বিকেলে কী ভীষণ রেগে গিয়েছিলাম, এটা যখন ভাবি, আশ্চর্য, আমার প্রাণে মা-মণির দুঃখ দেয়া ব্যাপারটা এখনও বুকের মধ্যে খচখচ করে।

দ্বিতীয় জিনিসটা তোমার কাছে ব্যক্ত করা খুব কঠিন, কেননা ব্যাপারটা আমার নিজেকে নিয়ে।

লজ্জায় লাল হওয়ার বিষয়ে মিস্ হেস্টারের লেখা একটা প্রবন্ধ পড়লাম কাল। প্রবন্ধটা ব্যক্তিগত ভাবে আমার উদ্দেশ্যে লেখা হতে পারত।

যদিও খুব সহজে আমি লজ্জায় লাল হই না, তাহলেও প্রবন্ধের অন্যান্য জিনিস আমার ক্ষেত্রে সমস্তই খাপ খেয়ে যায়। ভদ্রমহিলা যা লিখেছেন মোটামুটি ভাবে তা এই রকম– বয়ঃসন্ধির বছরগুলোতে মেয়েরা ভেতরে ভেতরে চুপচাপ হয়ে পড়ে এবং তাদের শরীরে যে অবাক কাণ্ড ঘটছে তাই নিয়ে ভাবতে থাকে।

আমিও দেখছি তা ঘটছে এবং সেই জন্যে মারগট, মা-মণি আর বাপির ব্যাপারে ইদানীং আমি কেমন যেন সঙ্কোচ বোধ করছি। মজার বিষয়, আমার চেয়ে মারগট অত যে লাজুক, ও কিন্তু আদৌ সঙ্কোচ বোধ করে না।

আমার যেটা হচ্ছে আমি মনে করি সে এক অদ্ভুত ব্যাপার, এবং শুধু যে শরীরে তা ফুটে উঠেছে তাই নয়, আমার ভেতরেও তার যাবতীয় ক্রিয়া চলেছে। নিজের বিষয়ে কিংবা এর একটা কিছু নিয়েও কারো সঙ্গে আমি আলোচনা করি না; সেইজন্যে এই সব প্রসঙ্গ নিয়ে আমাকে নিজের সঙ্গে কথা বলতে হবে।

প্রত্যেকবার যখনই আমার মাসিক হয়– এটা হয়েছে মোটে তিন বার– সমস্ত ব্যথা, অস্বস্তি এবং কদর্যতা সত্ত্বেও, আমার কেমন যেন মনে হয় আমার একটা মধুর রহস্য আছে, তাই একদিক থেকে দেখলে এটা আমার কাছে নিছক একটা উৎপাত হওয়া সত্ত্বেও, আমি বারবার সেই সময়টার জন্যে উন্মুখ হয়ে থাকি যখন আমার মধ্যে আমি আবার অনুভব করব সেই রহস্য।

মিস্ হেস্টর এও লিখেছেন যে, এই বয়সের মেয়েদের খুব একটা মনের জোর থাকে না, এবং তারা যে নিজস্ব ধ্যানধারণা এবং প্রকৃতিযুক্ত একেকটি ব্যক্তিসত্তা– এটা তাদের চোখে ধরা পড়ে।

এখানে আসার পর আমার বয়স যখন সবে চৌদ্দ, অন্য বেশির ভাগ মেয়ের আগেই আমি নিজের সম্পর্কে ভাবতে এবং আমি যে একজন 'ব্যক্তি' এটা বুঝতে শুরু করি। মাঝে মাঝে, রাতের বেলায় বিছানায় শোয়ার পর স্তনযুগলে হাত দিতে এবং হৃদপিণ্ডের নিঃশব্দ স্পন্দন শুনতে আমার প্রচণ্ড ইচ্ছে হয়।

এখানে আসার আগেই অবচেতনভাবে এই ধরনের জিনিস আমি অনুভব করেছি, কেননা আমার মনে আছে একবার এক মেয়ে বন্ধুর সঙ্গে শুয়ে থাকতে থাকতে আমার ওকে চুমো খাওয়ার প্রবল বাসনা হয়েছিল এবং চুমো আমি খেয়েওছিলাম। তার শরীর সম্পর্কে আমি প্রচণ্ড কৌতূহল বোধ না করে পারিনি, কেননা সে তার শরীরকে সবসময় আমার কাছ থেকে গোপন করে রাখত।

আমি তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, আমাদের বন্ধুত্বের প্রমাণস্বরূপ, আমরা পরস্পরের স্তন স্পর্শ করতে পারি কিনা, কিন্তু সে তাতে রাজী হয়নি।

যখনই কোনো নগ্ন নারীমূর্তি দেখি, যেমন ভেনাস, আনন্দে আমি মাতোয়ারা হই। আমার কাছে এত বিস্ময়কর, এত অপরূপ বলে মনে হয় যে অনেক চেষ্টা করেও আমি চোখের পানি সামলাতে পারি না।

তোমার আনা।

বৃহস্পতিবার, ৬ জানুয়ারি, ১৯৪৪

আদরের কিটি,

কারো সঙ্গে কথা বলার বাসনা আমার মধ্যে এমন তীব্র হয়ে উঠেছিল যে, কিভাবে যেন পেটারকে বেছে নেওয়ার কথা আমার মাথায় ঢুকেছিল।

কখনও কখনও দিনের বেলায় ওপরতলায় পেটারের ঘরে গেলে আমার সব সময়ই জায়গাটা খুব আরামদায়ক বলে মনে হত, কিন্তু পেটার এমন ভালোমানুষ বলে এবং কেউ এসে উৎপাত করলেও তাকে সে কখনই ঘর থেকে বের করে দেবে না বলে আমি কখনই সাহস করে বেশিক্ষণ থাকিনি, কেননা আমার ভয় হত ও হয়ত বিরক্ত বোধ করবে। আমি চেষ্টা করলাম ওর ঘরে বসে থাকার একটা অছিলা বের করে ওকে দিয়ে যাতে কথা বলাতে পারি– করতে হবে এমনভাবে যাতে বিশেষ টের না পায়। কাল আমার সেই সুযোগ জুটে গেল। পেটারের এখন বাতিক ক্রসওয়ার্ড পাজ্‌ল্; আর প্রায় কিছুই সে করে না। আমি ওকে ক্রসওয়ার্ডে সাহায্য করলাম এবং অচিরেই ওর ছোট্ট টেবিলে আমার মুখোমুখি হয়ে বসলাম– পেটার চেয়ারে আর আমি ডিভানে।

যতবারই আমি ওর গভীর নীল চোখের দিকে তাকাই, ততবারই আমার কেমন একটা অনুভূতি হয়; ঠোঁটের চারদিকে সেই রহস্যময় হাসি খেলিয়ে পেটার বসে। আমি তার মনোগত ভাবনাগুলো ধরতে পারছিলাম। দেখতে পাচ্ছিলাম তার মুখচোখে একদিকে আচার আচরণ নিয়ে অসহায়তা আর সংশয়ের ভাব এবং অন্যদিকে একই সঙ্গে সে যে পুরুষমানুষ এই চেতনার আভাষ। আমি তার সলজ্জ হাবভাব লক্ষ্য করে খুব নরম হয়ে পড়েছিলাম; আমি তার নীল চোখ দুটোর দিকে বার বার না তাকিয়ে পারছিলাম না আর সর্বান্তঃকরণে আমি প্রায় তার কাছে যাঞ্চা করছিলাম– আমাকে তুমি বলো গো, তোমার মনের মধ্যে কী হচ্ছে এই হজরং-বজরং কথার বাইরে কি তোমার দৃষ্টি যায় না?

কিন্তু সন্ধ্যেটা কেটে গেল, কিছুই হল না; আমি তাকে শুধু লজ্জায় লাল হওয়ার ব্যাপারটা বলেছিলাম– আমি যা লিখেছি স্বভাবতই তা বলিনি। বলেছি শুধু এইটুকু– যেটাকে বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মনে সে আরও বেশি বল পায়।

বিছানায় শুয়ে শুয়ে পুরো ব্যাপারটা নিয়ে পরে আমি ভেবেছি। আমার খুব আশাব্যঞ্জক মনে হয়নি এবং পেটারের অনুগ্রহ ভিক্ষা করতে হবে এটা আমার কাছে একেবারে অসহ্য বলে মনে হচ্ছিল। নিজের বাসনা চরিতার্থ করার জন্যে একজন অনেক কিছু করতে পারে, আমার ক্ষেত্রে সেটা নিশ্চয়ই বড় হয়ে উঠেছিল; কেননা আমি মনে মনে ঠিক করে ফেলেছিলাম যে, আবারও ঘন ঘন আমি পেটারের কাছে গিয়ে বসব এবং এ-ও-তা নিয়ে আমি ওকে কথা বলাব।

আর যাই করো, তুমি যেন তাই বলে ধরে নিও না যে, আমি পেটারের প্রেমে পড়েছি। একেবারেই নয়! ফান ডানদের ছেলের বদলে যদি মেয়ে থাকত তাহলে তার সঙ্গেও বন্ধুত্ব পাতাতে আমি চেষ্টা করতাম।

আজ সকালে যখন আমার ঘুম ভাঙল, তখন প্রায় সাতটা বাজতে পাঁচ। তৎক্ষণাৎ খুব স্পষ্ট আকারে মনে পড়ল স্বপ্নে আমি কী দেখেছি। ...আমি একটা চেয়ারে বসে আছি আর আমার ঠিক সামনে বসে পেটার...ভেসেল। মারি বস্-এর আঁকা একটি ছবির বই আমার দুজনে মিলে দেখছি। স্বপ্নটা এত জীবন্ত যে, কিছু কিছু ছবি এখনও আমার চোখে ভাসছে। কিন্তু সেটাই সব নয়– স্বপ্নটা দেখে যেতে লাগলাম। হঠাৎ পেটারের সঙ্গে আমার চোখাচোখি

হল; আমি অনেকক্ষণ ধরে ওর সুন্দর মখমলের মতো বাদামী চোখের দিকে চেয়ে রইলাম। পেটার তখন খুব নরম করে বলল, 'আগে জানলে অনেক আগেই আমি তোমার কাছে চলে আসতাম।' আমি আবেগ সামলাতে না পেরে ঝট্ করে মুখ সরিয়ে নিলাম। এরপর আমি বুঝলাম আমার গালে একটা স্নিগ্ধ মমতাময় গাল এসে ঠেকল। আমার কী যে ভালো লাগল, কী ভালো যে লাগল...।

ঠিক এই সময় আমার ঘুম ভেঙে গেল, তখনও আমার গালে লেগে রয়েছে তার গালের স্পর্শ; আমার হৃদয়ের গভীরে, এত গভীরে তার বাদামী চোখের চাহনি আমি অনুভব করছি যে, সেখানে সে দেখতে পাচ্ছে তাকে আমি কতটা ভালবেসে ছিলাম এবং এখনও কতখানি ভালবাসি। আরও একবার আমার চোখ ফেটে পানি বেরিয়ে এল; তাকে আবার হারিয়ে ফেলে আমার মন বিষাদে ভরে গেল; সেই সঙ্গে ভালোও লাগল; কেননা এর ফলে এ বিষয়ে আমি কৃতনিশ্চয় হলাম যে পেটার এখনও আমার কাছে বরণীয়।

এটা অদ্ভুত, এখানে আমি প্রায়ই আমার স্বপ্নে সব যেন জীবন্ত দেখতে পাই। প্রথম আমি এক রাত্রে দিদিমাকে এত স্পষ্ট দেখতে পাই যে, আমি তাঁর পুরু তুলতুলে কোঁচকানো মখমলের মতো গায়ের চামড়া পর্যন্ত যেন আলাদা করতে পারছিলাম। এরপর দিদিমা দেখা দেন বিপত্তারিণী পরীর মতন; তারপর আসে লিস্। ও আমার কাছে আমার সমস্ত মেয়ে বন্ধু এবং ইহুদীর লাঞ্ছনার প্রতীক। ওর জন্যে যখন আমি সৃষ্টিকর্তাকে ডাকি, তখন আমার সেই প্রার্থনা হয় সকল ইহুদী এবং সকল আর্তের জন্যে। আর এখন এল পেটার, আমার প্রাণাধিক পেটার– এর আগে আমার মানসপটে তার এত স্পষ্ট ছবি কখনও ছিল না। আমার কাছে তার ফটোর কোনো দরকার নেই, আমি তাকে আমার মনশ্চক্ষে দেখতে পাই এবং কী সুন্দরভাবে।

তোমার আনা।

শুক্রবার, ৭ জানুয়ারি, ১৯৪৪

আদরের কিটি,

আমি কী বোকা গাধা। আমি একেবারে ভুলে বসে আছি যে, আমি আমার নিজের এবং আমার তাবৎ ছেলে-বন্ধুদের ইতিহাস তোমাকে কখনও বলিনি।

যখন আমি নিতান্তই ছোট– কিন্ডারগার্টেনের গণ্ডীও যখন ছাড়াইনি– কারেল সামসনের প্রতি আমার টান হয়। ওর বাবা মারা গিয়েছিলেন; মাকে নিয়ে সে তার এক মাসীর কাছে থাকত। কারেলের এক মাসতুতো ভাই ছিল, তার নাম রবী; ছেলেটি ছিল রোগা, সুশ্রী, গায়ের রং একটু চাপা। কারেল ছিল ছোটখাটো, কৌতুকপ্রিয়। কারেলের চেয়ে রবীকে নিয়ে সবাই বেশি আদিখ্যেতা করত। কিন্তু আমি চেহারা জিনিসটাকে আমল দিতাম না; বেশ কয়েকবছর আমি কারেলের খুব অনুরক্ত ছিলাম।

আমরা বিস্তর সময় প্রায়ই একসঙ্গে কাটাতাম, কিন্তু সে ছাড়া, আমার ভালবাসার প্রতিদান পাইনি।

এরপর পেটারকে পেলাম; ছেলেমানুষের মতো আমি সত্যিই প্রেমে পড়লাম। আমাকেও সে খুব পছন্দ করত এবং একটি পুরো গ্রীষ্ম আমরা পরস্পর অচ্ছেদ্যভাবে কাটালাম। এখনও মনে পড়ে, দুজনে হাত ধরাধরি করে আমরা একসঙ্গে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছি; পেটারের পরনে একটা সাদা স্যুট আর আমি পরেছি গরমকালের খাটো পোশাক।

গরমের ছুটির পর পেটার গিয়ে ভর্তি হল উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রাথমিক শ্রেণীতে আর আমি নিম্নতর বিদ্যালয়ের ষষ্ঠ শ্রেণীতে। ইস্কুল থেকে ও আসত আমার কাছে, আমিও তেমনি যেতাম। দুজনের দেখা হত। পেটার ছেলেটা ছিল খুব প্রিয়দর্শন, লম্বা, সুন্দর আর ছিপছিপে; অমায়িক, শান্ত, বুদ্ধিদীপ্ত মুখ। কালো চুল, আশ্চর্য বাদামী চোখ, রক্তিম গাল আর টিকোলো নাক। সবচেয়ে বড় কথা, আমাকে মাত করে দিত ওর হাসি– ওকে তখন এমন মিচ্‌কে শয়তানের মতো দেখাতো।

ছুটিতে আমি গ্রামে গিয়েছিলাম; ফিরে এসে দেখি– পেটার যেখানে থাকত সেখান থেকে উঠে গেছে; ঐ একই বাড়িতে থাকত পেটারের চেয়ে বয়সে ঢের বড় একটি ছেলে। সম্ভবত পেটারকে সে এটা বুঝিয়েছিল যে, আমি হলাম একজন বাচ্চা ক্ষুদে শয়তান এবং সেই শুনে পেটার আমাকে ত্যাগ করে। আমি পেটারকে এত বেশি ভক্তি-শ্রদ্ধা করতাম যে, প্রকৃত সত্যের মুখোমুখি হতে আমার মন চায়নি। আমি তাকে আঁকড়ে ধরে থাকতে চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু পরে আমার খেয়াল হল যে, আমি যদি এভাবে তার পেছনে ছুটি, তাহলে শীগগিরই লোকে আমাকে ছেলে-ধরা বলে বদনাম দেবে। বছরগুলো চলে গেল। তার মধ্যে পেটার তার সমবয়সী মেয়েদের নিয়ে ঘুরে বেড়ায়, একবার ডেকে আমার খবর নেওয়ার কথাও তার মনে হয় না। আমি কিন্তু তাকে ভুলতে পারিনি।

আমি চলে গেলাম ইহুদীদের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে। আমাদের ক্লাসের প্রচুর ছেলে আমার সঙ্গ পাওয়ার জন্য উদ্‌গ্রীব– তাতে আমার মজা লাগত, ইজ্জত বাড়ত, কিন্তু অন্যদিকে থেকে সেসব আদৌ আমার মন স্পর্শ করত না। এরপর একটা সময়ে হ্যারি আমার প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছিল। কিন্তু তোমাকে তো আগেই বলেছি আমি আর কখনো কারো প্রেমে পড়িনি।

কথায় বলে, 'সময় সব ব্যথা ভুলিয়ে দেয়,' আমার ক্ষেত্রেও তাই ঘটল। আমি ধারণা করেছিলাম পেটারকে আমি ভুলে গিয়েছি, তার প্রতি আমার আর এতটুকুও টান নেই। তবু তার স্মৃতি আমার অবচেতন মনে খুব প্রবলভাবে থেকে গিয়েছিল; মাঝে মাঝে আমি নিজের কাছে কবুল করতাম যে, অন্য মেয়েগুলোকে আমি হিংসে করি; আর সেই জন্যেই হ্যারিকে আমার পছন্দ হত না। আজ সকালে আমি জানলাম, কিছুই বদলায়নি; বরং, বয়স আর বুদ্ধি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আমার ভালবাসারও বৃদ্ধি ঘটেছে। এখন আমি বিলক্ষণ বুঝতে পারি, পেটার আমাকে খুকী মনে করত; কিন্তু ও আমাকে একেবারে ভুলে যাওয়ায় আমার মনে লেগেছিল। ওর মুখ এত স্পষ্ট দেখাচ্ছিল যে, এখন আমি এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ যে, ও ছাড়া আর কেউ আমার কাছে টিকে থাকতে পারত না।

স্বপ্নটা দেখা অব্দি আমি যেন আর আমাতে নেই। আজ সকালে বাপির চুমো খাওয়ার সময় আমি তারস্বরে বলে উঠতে পারতাম– 'ইস্‌, তুমি যদি পেটার হতে!' সারাক্ষণ আমার ধ্যানজ্ঞান হল সে আর আমি। সারাদিন মনে মনে আওড়াতে থাকলাম, 'ও প্লেটেল, আমার আদরের পেটেল...!'

এখন কে আমার সহায় হবে? বেঁচে থেকে আমাকে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে হবে যখন আমি এখান থেকে বের হব তখন তিনি যেন এমন করেন যাতে পেটারের সঙ্গে আমার দেখা হয়; পেটার আমার দিকে তাকিয়ে আমার চোখে ভালবাসার লেখন পড়ে বলবে– 'আনা গো, আগে জানলে কবে আমি তোমার কাছে চলে আসতাম!'

আর্শিতে নিজের মুখ দেখলাম। একেবারে অন্যরকম দেখাল। চোখ দুটো কী স্বচ্ছ আর গাঢ়, গাল দুটো গোলাপী– এ রকম যে কতদিন ছিল না– আমার হাঁ-মুখটা অনেক তুলতুলে

দেখাল; দেখে মনে হবে আমি আছি মনের সুখে, অথচ আমার মধ্যে কোথায় যেন একটা করুণ বিষাদের ভাব, আর আমার ঠোঁটে হাসি ফুটে উঠতে না উঠতে মিলিয়ে যায়। আমার মনে যে সুখ নেই, তার কারণ কবে হয়ত জানব আমার কথা পেটার আর ভাবে না; কিন্তু এ সত্ত্বেও আমি আজও যেন আমার চোখে তার দুটি অসামান্য চোখ আর আমার গালে তার স্নিগ্ধ নরম গাল অনুভব করি।

পেটেল, ও পেটেল, আমার মানসপট থেকে কেমন করে তোমার মূর্তি আমি সরিয়ে নেব? তোমার জায়গায় আর যাকেই বসাই, কেউই তো তোমার নখের যুগ্যিও হবে না? আমি তোমাকে ভালবাসি, সে ভালবাসা এত বড় যে আমার হৃদয়ের কূল ছাপিয়ে একদিন সে প্রকাশ্যে আছড়ে পড়বে, হঠাৎ সবকিছু ধসিয়ে দিয়ে নিজেকে সে লোকচক্ষে তুলে ধরবে!

এক সপ্তাহ আগে কেন, কেউ যদি গতকালও আমাকে জিজ্ঞাসা করত, 'তোমার বন্ধুদের মধ্যে কাকে তুমি বিয়ে করার সবচেয়ে উপযুক্ত বলে মনে করো?' আমি বলতাম, 'আমি জানি না'; কিন্তু এখন হলে আমি গলা ফাটিয়ে বলব, 'পেটেলকে। কেননা মনপ্রাণ দিয়ে তাকে আমি ভালবাসি। নিজেকে আমি নিঃশেষে তার কাছে সঁপে দিয়েছি।' তবে একটা কথা, পেটেল আমার মুখ স্পর্শ করতে পারে, কিন্তু তার বেশি নয়।

একবার যৌন বিষয়ে কথা হওয়ার সময় বাপি আমাকে বলেছিলেন যে, আমি এখনও সম্ভবত সেই কামনা বোধ করি না; আমি জানতাম আমার এই কামনাবোধ সব সময়েই ছিল এবং এখন আমি সে সম্বন্ধে পূর্ণভাবে সজাগ। এখন একজনই আমার পরম প্রিয়, সে হল আমার পেটেল।

তোমার আনা।

বুধবার, ১২ জানুয়ারি, ১৯৪৪

আদরের কিটি,

এলি ফিরেছেন দিন পনেরো হল। মিপ্ আর হেঙ্ক দুদিন কাজে আসেননি– দুজনেরই পেটের গণ্ডগোল হয়েছিল।

এখন আমাকে পেয়ে বসেছে নাচ আর ব্যালে; রোজ সন্ধ্যেবেলা আমি নাচের তালে তালে পা ফেলা অভ্যেস করি। মা-র একটা লেস-লাগানো হালকা নীল সায়া ছিল, তাই দিয়ে আমি একটা অতি আধুনিক ঢংয়ের নীচের ঘাঘরা তৈরি করে নিয়েছি। ওপর দিয়ে গোল করে একটা রিবন পরিয়ে নিয়েছি আর ঠিক মাঝখানে লাগিয়ে নিয়েছি একটা বো-টাই; একটা পাকানো গোলাপী রিবনে হয়েছে ষোলকলা পূর্ণ। বৃথাই চেষ্টা করলাম আমার জিমন্যাস্টিকের জুতোটাকে সত্যিকার ব্যালে-জুতোর রূপ দিতে। আমার কাঠ-কাঠ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আবার আগের মতন নমনীয় হয়ে আসছে। সবচেয়ে সাংঘাতিক যে ব্যায়াম, সেটা হল মাটিতে বসে দুই হাতে দুটো গোড়লি ধরে শূন্যে উঁচু করে তোলা। বসবার জন্যে আমাকে একটা কুশন পেতে নিতে হয়, নইলে আমার পাছার অবস্থাটা খুবই সংকটজনক হয়ে ওঠে।

এখানে 'নির্মেঘ সকাল' বইটা সবাই পড়ছে। মা-মণি বইটা অসাধারণ বলে মনে করেন; বইটাতে তরুণ-তরুণীদের সমস্যার বিষয়ে অনেক কিছু আছে। আমি ঠোঁট উল্টে মনে মনে ভাবি; 'তার আগে তোমাদের নিজেদের ছেলেপুলেদের ব্যাপারে একটু মাথা দিলেই তো পারো।'

আমার বিশ্বাস, মা-মণি মনে করেন মা-বাবার সঙ্গে ওঁদের ছেলেপুলেদের যে সম্পর্ক

তার চেয়ে ভালো কিছু আর হতে পারে না, এবং ছেলেপুলেদের ব্যাপারে তাঁর মতন অত আদরযত্ন আর কেউই করতে পারে না। কিন্তু এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে, মা-মণি দেখেন শুধু মারগটকে– আমার মনে হয় না মারগটের আমার মতন সমস্যা বা চিন্তাভাবনা। তবু মা-মণিকে এটা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেবার কথা আমি ভাবতেই পারি না যে, মেয়েদের ব্যাপারে তাঁর মনগড়া ধারণাটা আদৌ ঠিক নয়– কেননা সেটা জানলে তিনি একেবারে আকাশ থেকে পড়বেন এবং বুঝে নিজেকে বদল করাও কোনোভাবেই তাঁর পক্ষে সম্ভব হবে না। এতে তিনি মনে যে দুঃখ পাবেন, আমি সে দুঃখ তাঁকে দিতে চাই না– বিশেষত আমি তো জানি আমার তাতে কিছুতেই কিছু যাবে আসবে না।

মা-মণি নিশ্চয় মনে করেন যে আমার চেয়ে মারগট তাঁকে বেশি ভালবাসে, তবে তাঁর ধারণা চন্দ্রকলার মতন এর হ্রাসবৃদ্ধি আছে। মারগট বড় হয়ে খুব মিষ্টি হয়েছে; ও অনেক বদলেছে, এখন আর আগের মতো অতটা হিংসুটে নেই। ক্রমশ ও আমার সত্যিকার বন্ধু হয়ে উঠছে। ও আমাকে আর এখন আগের মতো নেহাত এলেবেলে ছেলেমানুষ বলে মনে করে না।

কখনও কখনও আমার মধ্যে একটা অদ্ভুত ব্যাপার হয়; আমি অন্যের চোখ দিয়ে নিজেকে দেখতে পারি। তখন আমি অনায়াসে জনৈক 'আনা'র ব্যাপার-স্যাপার দেখতে পাই এবং একজন বাইরের লোক হিসেবে তার জীবনের পাতাগুলো আমি উল্টে যাই। এখনে আসার আগে, যখন আমি আজকের মতো এটা-ওটা নিয়ে অত বেশি মাথা ঘামাতাম না, মাঝে-মাঝে আমার মনে হত মা, পিম্ আর মারগট– এরা আমার কেউ নয়, ভাবতাম চিরদিনই আমি থেকে যাব খানিকটা বাইরের লোক। কখনও কখনও এমন ভান করতাম যেন আমি অনাথ; পরে তার জন্যে নিজেকেই বকতাম এবং শাস্তি দিতাম; নিজেকে বোঝাতাম যে, এত ভাগ্য করে এসেও এই যে আমি আত্মনিগ্রহ করি এটা তো আমারই দোষ।

এরপর একটা সময়ে আমি নিজেকে জোর করে আত্মীয় করে তুলি। রোজ সকালে নিচের তলায় কেউ এলে আমি ভাবতাম নিশ্চয়ই মা-মণি, এবার আমার শিয়রে এসে সুপ্রভাত বলবেন। আমি তাঁকে দেখলেই আন্তরিক সম্ভাষণ জানাতাম, কেননা মনে মনে আমি সত্যিই চাইতাম যে, মা-মণি আমার দিকে স্নেহভরে তাকান।

ঠিক তখন মা-মণি এমন একটা মন্তব্য করলেন বা কথা বললেন যাতে প্রতিকূলতা আছে বলে মনে হল, তারপর একেবারে ভাঙা মন নিয়ে আমি চলে গেলাম ইস্কুলে। বাড়ি ফেরার সময় ভাবতে ভাবতে আসতাম– মা-মণির আর দোষ কী, তাঁর মাথায় এতরকমের বোঝা! বাড়ি ফিরতাম খুব হাসিখুশী হয়ে, মুখে খই ফুটত শেষে এই কথা যখন বার বার বলতে শুরু করতাম, তখন ইস্কুলের ব্যাগ বগলে করে মুখে চিন্তার ভাব ফুটিয়ে সট্ করে ঘর ছেড়ে চলে যেতাম।

মাঝে মাঝে ঠিক করতাম মুখ ভার করে থাকব, কিন্তু তখন ইস্কুল থেকে ফিরতাম তখন আমার এত খবর থাকত বলবার যে, সেসব সংকল্প কোথায় ভেসে যেত। আর মা-মণির হাতে যতই কাজ থাক, আমার সারাদিনের ঘটনা শোনার জন্যে মা-মণিকে কান খাড়া করে থাকতে হত। এরপর আবার সেই সময় এল, যখন আমি সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শোনা ছেড়ে দিলাম। আর রাত্তিরে আমার বালিশ চোখের পানিতে ভিজে যেত।

সেই সময়টাতে সবকিছুই আরো খারাপ হয়ে পড়ল; বলতে কি, সে সবই তুমি জানো।

এখন আল্লাহর দয়ায় পেয়েছি একজন সহায়ক–পেটার...। আমি আমার লকেটটা

জড়িয়ে ধরি, চুমো খাই আর আপন মনে বলি, 'ওদের আমি কলা দেখাই! আমার আছে পেটার। ওরা তার কী জানে?' আমি যে এত দাবড়ানি খাই, এইভাবে তার আঘাত কাটিয়ে উঠি। একজন কমবয়সী মেয়ের গহন মনে এত কিছু তোলপাড় করে! কার আর সে কথা মাথায় আসে?

তোমার আনা।

শনিবার, ১২ জানুয়ারি, ১৯৪৪

আদরের কিটি,

আমাদের যেসব ঝগড়া-বিবাদ, তা নিয়ে প্রতিবারই সবিস্তারে তোমাকে বলার কোনো মানে হয় না। তোমাকে শুধু এইটুকু বললেই হবে যে, বিস্তর জিনিস– তার মধ্যে আছে মাখন আর মাংস– আমরা ভাগবাঁটোয়ারা করে নিয়েছি এবং নিজেদের আলু আমরাই ভেজে নিই। কিছুদিন থেকে আজকাল আমরা দুই বেলার আহারের মাঝখানে অতিরিক্ত হিসেবে ময়দার রুটি খাচ্ছি, কেননা বিকেল চারটে নাগাদ রাতের খাবারের জন্যে আমরা এমন উতলা হয়ে পড়ি যে, পেটের ভোঁচকানি আর আমরা সামাল দিতে পারি না।

মা-মণির জন্মদিন দ্রুত এসে যাচ্ছে। ক্রালারের কাছ থেকে মা-মণি কিছুটা বাড়তি চিনি পাওয়ায় ফান ডানদের খুব গায়ের জ্বালা, কেননা মিসেস ফান ডানের জন্মদিনে এভাবে দাক্ষিণ্য করা হয়নি। কিন্তু এ নিয়ে অকথা-কুকথা বলে, চোখের পানি ফেলে, মেজাজ খারাপ করে একে অন্যের অশান্তি সৃষ্টি করে কী লাভ? এ কথা জেনে রাখো কিটি, ওদের ওপর আমাদের আগের চেয়েও বেশি ঘেন্না ধরে গেছে। এক পক্ষকাল যেন ফান ডানদের মুখ আর না দেখি। মা-মণি তাঁর এই ইচ্ছের কথা বলেই ফেলেছেন। এখুনি অবশ্য সেটা পূর্ণ হওয়া সম্ভব নয়।

আমি বসে বসে ভাবি, এক বাড়িতে যার সঙ্গেই থাকা যাক, শেষ অবধি খিটিমিটি বাধা অবধারিত কিনা। নাকি অজ্ঞদেরই কপাল অতিরিক্ত খারাপ? বেশিরভাগ লোকেরাই কি তাহলে এই রকম হাতটান আর নিজের কোলে ঝোল টানার স্বভাব? মনে হয়, মানুষজন সম্পর্কে কিঞ্চিৎ জ্ঞান হয়ে ভালোই হয়েছে; তবে এখন মনে হয়, যতটা জেনেছি সেই ঢের। আমরা চুলোচুলি করি বা না করি, মুক্তি পেয়ে খোলা হাওয়া গায়ে লাগাতে চাই বা না চাই, যুদ্ধ চলছে এবং চলবে।

কাজেই এখানে যতদিন আছি, আমাদের উচিত সবচেয়ে শ্রেয়ভাবে থাকা। এখন আমি জ্ঞানের কথা বলছি, কিন্তু এও জানি, খুব বেশিদিন এখানে থাকলে আস্তে আস্তে হয়ে যাব বুড়িয়ে-যাওয়া শুকনো সিমের বোঁটা। অথচ আমি কত না চেয়েছিলাম একজন প্রকৃত সুকুমারী রমণী হয়ে উঠতে!

তোমার আনা।

শনিবার, ২২ জানুয়ারি, ১৯৪৪

আদরের কিটি,

আচ্ছা, তুমি বলতে পারো, লোকে সব সময়ে কেন নিজেদের আসল মনের ভাবটাকে ঢেকে রাখার জন্যে এত কোমর বেঁধে লাগে? অন্য লোক থাকলে যে রকম করা উচিত, তা না করে কেন আমি একেবারে অন্য রকমের ব্যবহার করি বলো তো?

কেন আমরা পরস্পরকে এত কম বিশ্বাস করি? আমি জানি, নিশ্চয় তার কারণ আছে; কিন্তু তা সত্ত্বেও মাঝে মাঝে আমার দেখে শুনে মনে হয় এটা কী ভয়ঙ্কর যে, আমরা কখনই কাউকে বিশ্বাস করে ঠিক মনের কথা বলতে পারি না– সে যদি খুব আপনজন হয় তাহলেও।

সেদিন রাত্রে স্বপ্নটা দেখার পর থেকে আমার বয়স যেন অনেক বেড়ে গেছে। এখন আর আমি কারো 'মুখাপেক্ষী' নই। শুনে আশ্চর্য হবে, ফান ডানদের প্রতি আমার মনোভাবও ঠিক আগের মতো নেই। সবার সব যুক্তিতর্ক এবং আর যা কিছু সমস্তই আমি হঠাৎ অন্য এক দৃষ্টিতে দেখতে পাচ্ছি। আমার মনের পাল্লা একদিকে এখন আর আগে থেকে ততটা ভারী হয়ে থাকে না।

আমি এতটা বদলে গেলাম কেমন করে? তার কারণ, এটা আমার হঠাৎ মনে হল যে, মা-মণি অন্য রকমের হতেন, মা যাকে সত্যিকার বলে– সম্পর্কটা তাহলে একেবারে অন্য রকমের হত। এটা সত্যি যে, মিসেস ফান ডান মানুষটা আদৌ সুবিধের নন, কিন্তু তাহলেও অর্ধেক ঝগড়াঝাঁটি এড়ানো যেতে পারত– কথা কাটাকাটির সময় মা-মণি যদি একটু কম একগুঁয়ে হতেন।

মিসেস ফান ডানের একটা ভালো দিক এই যে, ওঁর সঙ্গে কথা বলা যায়। ওঁর মধ্যে স্বার্থপরতা, কঞ্জুষপনা আর লুকোচুরির ভাব থাকলেও ওঁকে নোয়ানো যায় সহজেই– অবশ্যই ওঁকে না চটিয়ে এবং আঁতে ঘা না দিয়ে। প্রতিবারেই যে এতে কাজ হবে তা নয়, তবে ধৈর্য ধরে করতে পারলে– ফিরে চেষ্টা করে দেখতে পারো কতটা এগোনো যায়।

আমাদের 'মানুষ হওয়া'র, পরকাল ঝরঝরে হওয়ার, খাওয়াদাওয়ার যা কিছু সমস্যা– এসব একেবারেই অন্যরূপ নিত যদি আমরা পুরোপুরি দিলখোলা আর অমায়িক হতাম এবং যদি পরের দোষ ধরার জন্যে সবসময় মুখিয়ে না থাকতাম।

তুমি ঠিক কী বলবে আমি জানি, কিটি; 'আনা, এ কী কথা শুনি আজ...? যে ওপরতলার লোকদের এত বাক্যযন্ত্রণা শুনেছে, যে মেয়ে এত বেশি অন্যায় অবিচার সয়েছে, সেই তোমার মুখ থেকেই কিনা...?'– হ্যাঁ, তবু আমারই কথা এসব।

আমি কেঁচে গণ্ডুষ করতে চাই, যেতে চাই এইসব কিছুর মূলে। লোকে বলে, 'সব সময় ছোটরা যা খারাপ দেখবে তাই শিখবে'। আমি তেমন হতে চাই না; আমি চাই গোটা জিনিসটা নিজে সযত্নে যাচাই করতে এবং কোন্‌টা ঠিক আর কোন্‌টা অতিরঞ্জিত তা খুঁজে বার করতে। যদি দেখি আমি যা ভেবেছিলাম, হায়, ওরা তা নয়– তাহলে মা-মণি আর বাপির সঙ্গে আমি একমত হব। তা না হলে, আমি গোড়ায় চেষ্টা করব ওঁদের ধারণাগুলো বদলাতে, যদি না পারি তাহলে আমি আমার মতামত আর সিদ্ধান্তে অবিচল থাকব। মিসেস ফান ডানের সঙ্গে আমাদের মতান্তরের প্রতিটি বিষয় নিয়ে খোলাখুলি আলোচনার প্রত্যেকটি সুযোগ আমি গ্রহণ করব এবং নিজেকে নিরপেক্ষ বলে জাহির করতে আমি ডরাব না– তাতে যদি আমাকে 'সবজান্তা' বলে খোঁটা দেওয়া হয় তো হোক। তার মানে এই নয় যে আমি আমাদের পরিবারের বিরুদ্ধে চলে যাব– আসলে আজ থেকে যেটা করব তা হল নির্মম গল্পগুজবে আর আমি নিজেকে ফাঁসাব না।

এ পর্যন্ত আমি নিজের মত থেকে এক চুল নড়তাম না! সব সময় ভাবতাম যত দোষ সব ঐ ফান ডানদের, কিন্তু আমরাও দোষের ভাগী ছিলাম। এ ব্যাপারে সন্দেহের নেই যে, বিতর্কিত বিষয়টাতে আমরাই ছিলাম সঠিক; কিন্তু যাদের বুদ্ধি বিবেচনা আছে (আমাদের আছে বলে তো আমরা মনেই করি!) অন্যদের সঙ্গে আচরণের ক্ষেত্রে তাদের জ্ঞান আরো

টনটনে হবে, লোকে এটাই প্রত্যাশা করে। আমি কিছুটা অন্তর্দৃষ্টি লাভ করেছি বলে এবং সময়ে সেটা সুষ্ঠুভাবে ব্যবহার করবার আশা রাখি।

তোমার আনা।

সোমবার, ২৪ জানুয়ারি, ১৯৪৪

আদরের কিটি,

আমার কী যেন ঘটেছে; কিংবা, সেটাকে একটা ঘটনা হিসেবেও আমি দেখাতে পারি না; শুধু বলতে পারি, ব্যাপারটাতে বেশ খানিকটা মাথার ছিট আছে। বাড়িতে বা ইস্কুলে যখনই কেউ যৌন সমস্যার বিষয়ে কিছু বলত, তাতে হয় থাকত একটা রহস্যের ভাব, নয় সেটা হত নির্ঘৃণ্য ধরনের।

প্রাসঙ্গিক কথাগুলো বলা হত ফিস্ ফিস্ করে, এবং কেউ বুঝতে না পারলে সে হত উপহাসের পাত্র। জিনিষটা আমার কাছে বিসদৃশ মনে হত। আমি ভাবতাম, 'এসব জিনিস নিয়ে কথা বলবার সময় লোকে কেন এত ঢাকঢাক গুড়গুড় করে? কেনই বা এত কান ঝালাপালা করে?' এসব পাল্টে দেব এমন দুরাশা আমার না থাকায় আমি যথাসম্ভব মুখে কলুপ এঁটে থাকতাম, কিংবা দু-এক সময় আমার মেয়েবন্ধুদের কাছ থেকে এটা-ওটা জেনে নিতাম। যখন বেশ কিছু জানা হয়ে গেল এবং মা-বাবাকেও তা বললাম, মা-মণি একদিন আমাকে ডাকলেন, 'আনা, তোমার ভালোর জন্যেই এটা বলছি– ছেলেছোকরাদের সামনে যেন এসব কথা বলো না; ওরা যদি কথাটা তোলে তাহলে তুমি হ্যাঁ-ও বলো না, না-ও বলো না।' তার উত্তরে কী বলেছিলাম আমার অবিকল মনে আছে। আমি বলেছিলাম, 'সে আর বলতে!' ব্যস্, এখানেই এর ইতি।

যখন গোড়ায় আমরা এখানে এলাম, বাপি প্রায়ই এমন সব জিনিস নিয়ে আমাকে বলতেন যেসব বিষয়ে বরং মা-মণির কাছ থেকে শুনতে পারলেই আমি বেশি খুশি হতাম; জানার যেটুকু বাকি ছিল, সেটুকু পুষিয়ে নিলাম কিছু বইপত্র থেকে আর কিছুটা লোকপ্রমুখাৎ। ইস্কুলের ছেলেদের মতন পেটার ফান ডানকে কিন্তু এ ব্যাপারে কখনই ততটা অসহ্য বলে মনে হয়নি– হয়ত গোড়ার দিকে দু-একবার ছাড়া। কখনই ও আমার মুখ খোলার চেষ্টা করেনি।

মিসেস ফান ডান আমাদের বলেছিলেন এসব প্রসঙ্গে তিনি বা তাঁর জ্ঞানত, তাঁর স্বামীও পেটারকে কোনদিনই কিছু বলেননি। বোঝাই যায়, পেটার কতটা কী জানে না জানে– সে সম্পর্কে তিনি কোনো খবরও রাখতেন না।

কাল মারগট, পেটার আর আমি যখন আলুর খোসা ছাড়াচ্ছিলাম, কথায় কথায় বোখার প্রসঙ্গ ওঠে। আমি প্রশ্ন করেছিলাম, 'আমরা এখনও জানি না বোখা ছেলে না মেয়ে-তাই না?'

পেটার তার উত্তরে বলেছিল, 'আলবৎ জানি, ও হচ্ছে হুলো।'

শুনে আমি হেসে উঠি। 'হুলোর পেটে বাচ্চা, অবাক কাণ্ড!'

পেটার আর মারগটও এই ছেলেমানুষী ভুলের ব্যাপারটা নিয়ে খুব হাসল। দেখ, দুই মাস আগে পেটার বলেছিল শীগগিরই বোখার বাচ্চা হবে, ওর পেটটা কি রকম বড় হয়ে উঠেছে। অবিশ্যি ওর পেট মোটা হওয়ার কারণ বোঝা গেল চুরি করে খাওয়া প্রচুর হাড়, কেননা বাচ্চা পাড়া দূরের কথা, পেটের মধ্যে বাচ্চাগুলোর চটপট বেড়ে ওঠারও কোনো লক্ষণ দেখা গেল না।

স্বপক্ষে যুক্তি না দেখিয়ে পেটারের উপায় নেই। বলল, 'না হে না, আমার সঙ্গে গিয়ে স্বচক্ষে দেখে আসতে পারো। একদিন ওর আশপাশে খেলা করছিলাম, তখন একদম স্পষ্ট দেখতে পাই ও হচ্ছে হুলো।'

শুনে আমার এমন কৌতূহল হল যে ওর সঙ্গে মালখানায় না গিয়ে পারলাম না। কিন্তু বোখা তখন দেখা দেওয়ার মেজাজে ছিল না, ফলে কোথাও তার টিকি দেখা গেল না। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর ঠাণ্ডা লাগতে থাকায় ফের ওপরতলায় চলে গেলাম। পরে বিকেলের দিকে পেটার যখন দ্বিতীয়বার নিচের তলায় যায় তখন তার পায়ের শব্দ পেলাম। মনে অনেক সাহস সঞ্চয় করে নিঃশব্দ বাড়িটাতে পা ফেলে ফেলে আমি নিচে মালখানায় চলে গেলাম। গিয়ে দেখি একটা প্যাকিং টেবিলে দাঁড়িয়ে বোখা পেটারের সঙ্গে খেলছে। ওজন নেবার জন্যে পেটার তখন তাকে সবে দাঁড়িপাল্লায় তুলেছে।

'এই যে, তুমি এটাকে দেখতে চাও?' বলে কোনো হাবিজাবি বাগ্‌বিস্তরের ভেতর না গিয়ে বেড়ালটাকে স্রেফ চিৎ করে পেড়ে ফেলে পেটার সূকৌশলে এক হাতে তার মাথা আর অন্য হাতে তার থাবা দুটো ঠেসে ধরল। তারপর শুরু হল পেটারের মাস্টারি– 'এই হলো পুরুষের লিঙ্গ, এই হল মাত্র গুটিকয় চুল আর ঐটা হল ও পাছা।' বেড়ালটা এবার এক কাতে উল্টে আবার তার সাদা লোমশ পায়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল।

আর কোনো ছেলে যদি আমাকে 'পুরুষের লিঙ্গ' প্রদর্শন করত, আমি তার দিকে কখনই ফিরে তাকাতাম না। কিন্তু পেটার কোনোরকম মানসিক বিকার না ঘটিয়ে এমন একটা কষ্টকর বিষয়ে খুব নির্বিকার ভাবে কথা বলে চলল। শেষ অবধি আমার আড়ষ্টতা ভেঙে দিয়ে আমাকেও ও বেশ স্বাভাবিক করে তুলল। আমরা বোখার সঙ্গে মজা করে খেললাম, নিজেরা বকর বকর করলাম আর তারপর প্রকান্ড গুদাম ঘরটার ভিতর দিয়ে পায়চারি করতে করতে দরজার দিকে গেলাম।

যেতে যেতে জিজ্ঞেস করি, 'সাধারণত যখন আমার কিছু জানতে ইচ্ছে হয়, আমি বইপত্র ঘেঁটে বার করি। তুমি করো না?'

'মাথা খারাপ? সোজা ওপরতলায় গিয়ে আমি জিজ্ঞেস করি। আমার বাবা আমার চেয়ে অনেক বেশি জানেন। ওসব বিষয়ে তাঁর অভিজ্ঞতা অনেক বেশি।'

ততক্ষণে আমরা সিঁড়ির কাছে চলে এসেছি। সুতরাং এর পর আমি মুখে কুলুপ দিলাম।

ব্রের রাবিট বলেছিলেন, 'সব কিছুরই হেরফের হতে পারে।' এটা ঠিক। কোনো মেয়ের সঙ্গে এসব জিনিস অতটা স্বাভাবিকভাবে বলা চলত না। ছেলেদের সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা করতে মা-মণি বারণ করেছিলেন বটে, কিন্তু এ ব্যাপারে আমার কোনোই সন্দেহ নেই যে মা-মণি ঠিক সে অর্থে বলেননি। কিন্তু শত হলেও এরপর সারাদিন আমি যেন কেমন একটা হয়ে গেলাম। আমাদের কথাবার্তার কথা মনে পড়ে কেমন যেন বেখাপ্পা লাগছিল। কিন্তু অন্তত একটা বিষয়ে আমার চোখ খুলে গিয়েছিল; সেটা এই যে, প্রকৃতই এমন কমবয়সী মানুষজন আছে– এমন কি তারা ছেলে হলেও– মেয়েদের সঙ্গে স্বচ্ছন্দে এসব বিষয়ে ভালো মনে কথা বলতে পারে।

আমি ভাবি পেটার সত্যিই ওর বাবা-মাকে খুব বেশি জিজ্ঞাসাবাদ করে কি না। কাল আমার সঙ্গে যেভাবে করেছিল সেইভাবে পেটার ওঁদের সাক্ষাতে অকপট আচরণ করে কি? হায়, আমি তা কী জানব!

তোমার আনা।

বৃহস্পতিবার, ২৭ জানয়ারি, ১৯৪৪

আদরের কিটি,

ইদানীং পারিবারিক কুলজি আর রাজবংশাবলী নিয়ে আমি খুব মজে গিয়েছি। এখন আমার ধারণা হয়েছে যে, একবার শুরু করে দিলে আরও গভীরভাবে ইতিহাসচর্চার দিকে মন যায় এবং তখন ক্রমাগত নতুন নতুন আর মজার মজার জিনিস চোখে পড়ে। লেখাপড়ার ব্যাপারে আমি অসাধারণ পরিশ্রমী এবং স্থানীয় বেতারে ইংরেজিতে যে প্রোগ্রাম হয় আমি তা শুনে বিলক্ষণ বুঝতে পারি, কিন্তু এসব সত্ত্বেও আমার কাছে ফিল্মস্টারদের যেসব ছবি আছে সেগুলো অনেক রবিবারেই সাজাই বাছাই করি এবং মনপ্রাণ ঢেলে দিয়ে দেখি– এখন সেই ছবির সংগ্রহটা বেশ বড়সড় হয়ে উঠেছে।

প্রতি সোমবারে মিস্টার ক্রালার যখন 'সিনেমা আর থিয়েটার' পত্রিকাটা আনেন– আমি খুশীতে ডগমগ হয়ে উঠি। এই বাড়িতে যাঁদের স্থূল জিনিসে টান কম, তাঁরা প্রায়ই এই সামান্য উপহারটিকে অর্থের অপব্যয় বলে মনে করেন; অবশ্য বছরখানেরক পরেও আমি যখন নির্ভূলভাবে বলে দিই কোন্ ফিল্মে কে আছে তখন তাঁরা অবাক হয়ে যান। ছুটির দিনগুলোতে এলি তাঁর ছেলেবন্ধুর সঙ্গে প্রতি সপ্তাহে সিনেমায় যান; যেই উনি আমাকে ছবির নাম বলেন, অমনি আমি এক নিঃশ্বাসে গড় গড় করে বলে চলি ছবির তারকাদের নাম আর সেই সঙ্গে ছবিটি সম্পর্কে চলচ্চিত্র-সমালোচকদের বক্তব্য। অল্প কিছুদিন আগে মা বলছিলেন যে, এরপর আমার আর কোনো সিনেমার যাওয়ার দরকার হবে না– কেননা ছবির প্লট, তারকাদের নাম আর সমালোচকদের মতামত সমস্তই আমার কণ্ঠস্থ।

কখনও যদি আমি নতুন কায়দায় চুল বাঁধি, অমনি সকলে চোখ কুঁচকে তাকায়। আমি জানি ঠিক কেউ জিজ্ঞেস করে বসবে সিনেমার কোন্ রূপসীর চুলের ঢং আমি নকল করেছি। ওটা আমি নিজের মাথা থেকে বের করেছি বললে পুরোপুরি কেউ বিশ্বাস করে না।

চুল বাঁধার ব্যাপার নিয়ে আরেকটু বলি– চুল বেঁধে আধঘন্টার বেশি সেটা থাকে না; লোকের বাক্যবাণে তিতিবিরক্ত হয়ে চটপট বাথরুমে চলে গিয়ে চুল খুলে ফেলে বেঁধে নিই আমার সেই আটপৌরে এলোখোঁপা।

তোমার আনা।

শুক্রবার, ২৮ জানুয়ারি, ১৯৪৪

আদরের কিটি,

আজ সকালে মনে মনে ভাবছিলাম, মাঝে মাঝে নিজেকে তোমার পুরনো খবরের জাবর-কাটা গরুর মত মনে হতে পারে যে শেষ অবধি সশব্দে হাই তুলে মনে মনে কামনা করে আনা যেন মাঝে-মধ্যে কিছুটা নতুন খবর দেয়।

দুঃখ এই যে, আমি জানি তোমার কাছে এ সবই খুব নিরস, তবে আমার দিকটাও তুমি একটু ভেবে দেখ– ভাবো একবার আমার কী হাল বুড়ো গরুদের নিয়ে, যাদের উপর্যুপরি খানাখন্দ থেকে উঠিয়ে আনতে হয়। খেতে বসে রাজনীতি বা উপাদেয় খাবারের প্রসঙ্গ না থাকলে, তখন মা-মণি কিংবা মিসেস ফান ডান তাঁদের ঝুলি থেকে তরুণ বয়সের পুরনো কোনো গল্প বের করেন, যে-গল্প শুনে শুনে আমাদের কান পচে গেছে। কিংবা ডুসেল ঘ্যানর ঘ্যানর করে বলতে থাকেন স্ত্রীর এলাহি পোশাক-আশাক, রেসের সুন্দর সব ঘোড়া, ফুটো

হওয়া দাঁড়নৌকো, চার বছর বয়সের সাঁতারু সব ছেলে, পেশীর ব্যথা আর ভয়তরাসে সব রুগীর গল্প। মোদ্দা ব্যাপার যেটা দাঁড়ায় তা এই– আমাদের আটজনের যে কেউ যদি মুখ খোলে, তাহলে বাকি সাতজনই তার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বাকি গল্পটা তার হয়ে বলে যেতে পারে। প্রত্যেকটা হাসির কথার নির্দিষ্ট বিষয়টা গোড়া থেকেই আমাদের জানা এবং যে বলে সে ছাড়া আর কেউ সেই রসিকতা শুনে হাসে না। দুই প্রাক্তন গিন্নী-মার হরেক গোয়ালা, মুদি আর কশাইদের এত বেশিবার আকাশে তোলা হয়েছে কিংবা কাদায় ফেলা হয়েছে যে শুনে শুনে আমাদের মানসপটে তাদের দাঁড়ি গজিয়ে গিয়েছে; এখানে কোনো টাটকা কিংবা আনকোরা বিষয়ে কথাবার্তা হওয়া সম্ভবই নয়।

এসব তবু সহ্য হত যদি বড়দের গল্প বলার ধরনটা অমন অকিঞ্চিৎকর না হত– কূপহুইস, হেংক্ বা মিপ্ ঐভাবেই আসরে বলতেন– একই জিনিস দশবার করে। তাতে জুড়ে দিতেন নিজেদের একটু-আধটু চুনট-বুনট। মাঝে মাঝে আমার প্রবল ইচ্ছে হত ওঁদের শুধরে দেবার, অতিকষ্টে নিজেকে সামলাতাম। ছোট ছেলেমেয়েরা যেমন আনা– কোনো ক্ষেত্রেই কদাচ বড়দের চেয়ে বেশি জানতে পারে না– তা বড়রা যত ভুলভ্রান্তিই করুক না কেন, যতই মনগড়া কথা বলে যাক না কেন।

কুপ্হুইস আর হেংক্-এর একটা প্রিয় বিষয় হল অজ্ঞাতবাসের আর গুপ্ত আন্দোলনের লোকদের কথা। ওঁরা বিলক্ষণ জানেন যে, আমাদের আত্মগোপনকারী লোকদের কথা জানবার প্রচণ্ড আগ্রহ এবং ধরা-পড়া লোকদের লাঞ্ছনায় যেমন আমরা দুঃখ পাই– তেমনি খুশী হই কেউ বন্দিদশা থেকে ছাড়া পেলে।

অজ্ঞাতবাসে যাওয়া বা 'আণ্ডার গ্রাউণ্ড' হওয়ার ব্যাপারটাতে আমরা এখন সেইভাবেই অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছি, যেমন আমরা অতীতে অভ্যস্ত ছিলাম বাপির শোবার ঘরের চটি গরম করার জন্যে ফায়ার প্লেসের সামনে রেখে দেওয়ার ব্যাপারে।

'স্বাধীন নেদারল্যাণ্ডের' মত বিস্তর সংস্থা আছে, যাদের কাজ 'অভিজ্ঞানপত্র' জাল করা, 'আণ্ডার গ্রাউণ্ডে'র লোকদের অর্থ যোগানো, লোকজনদের লুকিয়ে থাকার জায়গা দেখে দেওয়া এবং আত্মগোপনকারী তরুণদের জন্যে কাজের ব্যবস্থা করা; দেখে আশ্চর্য লাগে, এই লোকগুলো নিজেদের জীবন বিপন্ন করে অন্যদের সহায় হয়ে আর বাঁচাবার জন্যে নিঃস্বার্থভাবে কী পরিমাণ মহৎ কাজ করে চলেছে। আমাদের সাহায্যকারীরা এর একটি দৃষ্টান্ত? এ পর্যন্ত তাঁরা আমাদের বিপদ থেকে ত্রাণ করেছেন এবং আমরা আশাকরি তাঁরা আমাদের নিরাপদে ডাঙায় পৌঁছে দেবেন। নইলে, হন্যে হয়ে যাদের খুঁজছে সেই অন্য অনেকের মতোই ওঁদের কপালেও আছে একই দুর্গতি। আমরা ওঁদের গলগ্রহ হয়ে আছি সন্দেহ নেই। কিন্তু সে সম্বন্ধে একটা টু শব্দও তাঁদের কাছ থেকে কোনোদিন আমরা শুনিনি; আমরা যে ওঁদের এত মুশকিলে ফেলি, ওঁরা একজনও তা নিয়ে কখনও নালিশ করেন না।

এমন দিন যায় না যেদিন ওঁরা ওপরে উঠে আসেন না। এসে ওঁরা কথা বলেন পুরুষদের সঙ্গে ব্যবসাপত্র আর রাজনীতি, মায়েদের সঙ্গে খাবারদাবার আর যুদ্ধকালীন সংকট আর ছোটদের সঙ্গে খবরের কাগজ আর বইপত্র নিয়ে। মুখে ওঁদের যথাসম্ভব ফোটানো থাকে হাসিখুশি ভাব, জন্মদিনে আর ব্যাঙ্ক বন্ধের দিন আনেন ফুল আর উপহার, সাহায্যে কখনও বিমুখ নন এবং সবকিছু করেন প্রাণ দিয়ে। এ জিনিস জীবনে কখনও ভোলার নয়। অন্যেরা যেখানে লড়াইতে আর জার্মানদের বিরুদ্ধে বীরত্ব দেখায়, আমাদের সাহায্যকারীরা বীরত্ব দেখান তাঁদের সদাহাস্যময়তায় আর স্নেহভালবাসায়।

অবিশ্বাস্য সব গল্প বাজারে চলেছে, কিন্তু তাহলেও সচরাচর এসবের মূলে সত্য আছে। যেমন, কুপহুইস এ সপ্তাহে আমাদের বললেন যে, গেল্ডার ল্যাণ্ডে এগারোজন এগারোজন করে দুটো ফুটবল টিমের খেলায় এক পক্ষে ছিল পুরোপুরি 'আনডার গ্রাউণ্ডে'র লোক আর অন্য পক্ষে ছিল পুলিশ বাহিনীর লোক।

হিল্ভারসুমে নতুন রেশন কার্ড বিলি করা হচ্ছে। লুকিয়ে থাকা লোকরাও যাতে রেশন পেতে পারে তার জন্যে কর্মাচরীদের পক্ষ থেকে এলাকার ঐসব লোকদের জানানো হয়েছে তারা যেন একটা বিশেষ সময়ে এসে আলাদা একটা ছোট টেবিল থেকে উপযুক্ত দলিলপত্র নিয়ে যায়। তাহলেও এ ধরনের দুঃসাহসী কলাকৌশলের কথা যাতে জার্মানদের কানে না যায় তার জন্যে ওদের সতর্ক হতে হবে।

তোমার আনা।

বৃহস্পতিবার, ৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৪

আদরের কিটি,

বহিরাক্রমণের ব্যাপারে দিন দিন দেশের মধ্যে উত্তেজনা দারুণ বাড়ছে। এ নিয়ে যে সাজো-সাজো রব উঠেছে, তুমি এখানে থাকলে তার আঁচ হয়ত তোমার গায়েও এসে লাগত; অন্যদিকে, এ নিয়ে আমরা যে হৈচৈ জুড়ে দিয়েছি– কে জানে, হয়ত নিতান্তই অকারণে– তাই দেখে তুমি আমাদের উপহাস করতে।

কাগজগুলোতে এখন শুধু বহিরাক্রমণ ছাড়া কথা নেই; তাতে বলা হচ্ছে, 'হল্যাণ্ডে যদি ইংরেজদের সৈন্য নামে, তাহলে দেশটির প্রতিরক্ষায় জার্মানরা সর্বশক্তি নিয়োগ করবে; যদি দরকার হয়, দেশ বানের পানিতে ভাসিয়ে দেবে।' ফলে, লোকজনদের আত্মারাম খাঁচাছাড়া হওয়ার যোগাড়।

লেখার সঙ্গে কয়েকটা ম্যাপ ছাপিয়ে দেখানো হয়েছে হল্যাণ্ডের কোন্ কোন্ অংশ পানির তলায় চলে যাবে। এটা আমস্টার্ডামের বিস্তীর্ণ অঞ্চলের ক্ষেত্রেও প্রয়োজ্য বলে, প্রথম কথা হল, রাস্তায় এক মিটার পানি দাঁড়ালে আমরা তখন কী করব? এ বিষয়ে দেখা যাচ্ছে নানা মুনির নানা মত।

'যেহেতু আদৌ হেঁটে বা সাইকেলে যাওয়া চলবে না, সুতরাং পানি ঠেলে ঠেলে আমাদের যেতে হবে।'

'একেবারেই না, বরং চেষ্টা করে সাঁতরাতে হবে আমরা সবাই স্নানের পোশাক আর টুপি পরে যথাসম্ভব পানির ভেতর দিয়ে ডুবে ডুবে যাব যাতে আমরা যে ইহুদী সেটা লোকে ধরে না ফেলে।'

'কী যা-তা বকছ, ইঁদুরে কুটুস করে পায়ে কামড়ালে দেখব মেয়েরা কত সাঁতার কাটে!' (বক্তা স্বভাবতই একজন পুরুষমানুষ– দেখা যাবে, চিৎকার করে কে পাড়া মাথায় করে!)

'যে যতই বলো, বাড়ি থেকে যে আমরা বেরোবো সে গুড়ে বালি। এখনই যা নড়বড় করছে তাতে বান এলে গুদামঘরটা নির্ঘাত ধ্বসে পড়বে।'

'শুনুন, শুনুন। রসিকতা রাখুন, আমরা চেষ্টা করব একটা নৌকো যোগাড় করতে।'

'কী দরকার? তার চেয়ে আমি বলি কি, চিলেকোঠা থেকে আমরা প্রত্যেকে নেব একটা করে কাঠের পাকিং বাক্স আর হাল বাইবার জন্যে একটা করে সুপের বড় হাতা!'

'আমি রন্‌পায় করে হেঁটে যাব; ওতে কম বয়সে আমি ছিলাম ওস্তাদ।'

'হেংক্ ফান সান্টেনের তার দরকার হবে না, ওঁর বউকে উনি পিঠে নেবেন, তাহলেই ভদ্রমহিলার রন্‌পায় চড়া হবে।

এ থেকেই ধরনটা তুমি মোটের ওপর আঁচ করতে পারবে। তাই না, কিটি?

এই সব গালগল্প শুনতে মজার হলেও হয়ত আদতে ব্যাপারটা উল্টো। বহিরাক্রমণ প্রসঙ্গে দ্বিতীয় একটা প্রশ্ন না উঠেই পারে না– 'জার্মানরা আমস্টার্ডাম ছেড়ে চলে গেলে আমরা তখন কী করব?'

'আমরাও শহর থেকে চলে যাব এবং যে যতটা পারি বেশভুষা পাল্টে ফেলব।'

'উঁহু, যাবে না। যাই ঘটুক, থেকে যাবে! সেক্ষেত্রে একমাত্র কাজ হবে দাঁতে দাঁত দিয়ে এখানেই থেকে যাওয়া। নইলে জার্মানরা ঝেঁটিয়ে সবাইকে খোদ জার্মানিতে চালনা করবে, যেখানে তারা সবাই মারবে। ওদের অসাধ্য কিছু নেই!"

'যা বলেছ, ঠিক তাই। এটাই সবচেয়ে নিরাপদ ঠাঁই, সুতরাং আমরা এখানেই থাকব। আমরা চেষ্টা করব যাতে মিস্টার কুপ্‌হুইস সপরিবারে চলে এসে এখানেই আমাদের সঙ্গে থাকেন। এক বস্তা কাঠের গুঁড়ো যোগাড় করে আনতে পারলে আমরা মেঝেতেই শুতে পারি। মিপ্ আর কুপহুইসকে বলা যাক এখনই ওঁরা এখানে কম্বল আনতে শুরু করে দিন।'

'আমাদের ষাট পাউণ্ড ভুট্টার ওপর বাড়তি কিছু আনিয়ে নিতে হবে। হেংক্‌কে বলা যাক আরও মটরশুঁটি আর বিন্ যোগাড় করতে; আমাদের এখন ঘরে আছে ষাট পাউণ্ডের মতো বিন্ আর দশ পাউণ্ডের মতো মটরশুঁটি। মনে থাকে যেন আমাদের হাতে আছে পঞ্চাশ টিন সবৃজি।'

'মা-মণি, অন্যান্য খাবার আমাদের কতটা কী আছে, একটু হিসেব করে দেখবে?'

'মাছ দশ টিন, দুধ চল্লিশ টিন, পাউডার-দুধ দশ কেজি, বনস্পতি তিন বোতল, জমানো মাখনের চারটি বয়াম, জমানো মাংস চার বয়াম, দুটো বেতে-মোড়া স্ট্রবেরির বোতল, দুই বোতল র‍্যাস্‌প্‌বেরি, কুড়ি বোতল টমেটো সস্, দশ পাউণ্ড ওট্‌মিল, আট পাউণ্ড চাল ; সবসুদ্ধ এই।

'ভাঁড়ারে যা আছে তা খুব খারাপ নয়। কিন্তু যদি বাইরের লোক আসে এবং সঞ্চিত খাবারের প্রতি সপ্তাহে হাত পড়ে, তাহলে এই দৃশ্যত বেশিটা আর তখন আসলে বেশি থাকবে না। বাড়িতে কয়লা আর জ্বালানি কাঠ, আর সেই সঙ্গে মোমবাতি, যা আছে যথেষ্ট। যদি আমরা সঙ্গে টাকাকড়ি নিয়ে যেতে চাই, তাহলে এসো আমরা সবাই আমাদের জামাকাপড়ের মধ্যে লুকিয়ে রাখা যায় এমন ছোট ছোট সব টাকার থলি বানিয়ে নিই।

'যদি হঠাৎ পালাতে হয় তাহলে সঙ্গে জরুরি কি কি জিনিস নেব তার একটা লিস্ট এখনি বানিয়ে ফেলতে হবে এবং রুকস্যাকগুলো প্যাক করে তৈরি রাখতে হবে।

পানি যদি অতটাই গড়ায় তাহলে আমরা দুজন লোককে খবরদারির জন্যে রাখব– একজন থাকবে সামনে এবং একজন থাকবে পেছনের চিলেকোঠায়। আমি বলি, এত খাবারদাবার যোগাড় করে হবেটা কি, যদি পানি, গ্যাস বা ইলেক্‌ট্রিসিটি আদৌ না থাকে?'

'তখন আমরা স্টোভে রাঁধব। পানি ফিল্টার করে ফুটিয়ে নেব। কিছু বেতে মোড়া বড় বড় বোতল পরিষ্কার করে নিয়ে তাতে পানি জমিয়ে রাখব।'

সারাদিন ঘ্যানর ঘ্যানর করে কেবল এইসব কথা। বহিরাক্রমণ আর শুধু বহিরাক্রমণ; পেটের জ্বালা, মৃত্যু, বোমা, আগুন নেভানো, স্লিপিং ব্যাগ, ইহুদীদের কুপন, বিষাক্ত গ্যাস ইত্যাদি ইত্যাদি– এই নিয়ে কুটচক্রচাল।

এর কোনোটাই ঠিক মন প্রফুল্ল করার জিনিস নয়। গুপ্ত-মহলবাসী ভদ্রমহোদয়েরা বেশ খোলাখুলি অমঙ্গলের সঙ্কেত দিচ্ছেন। হেংক্-এর সঙ্গে নিম্নোক্ত সংলাপের তার পরিচয় মিলবে–

গুপ্ত-মহল– 'আমাদের ভয়, জার্মানরা সরে গেলে ওরা শহর থেকে ঝেঁটিয়ে সবাইকে সঙ্গে নিয়ে যাবে।'

হেংক্– 'অসম্ভব, ওদের হাতে এত ট্রেনই নেই।'

গু-ম– 'ট্রেন কেন? আপনি কি ভাবছেন বেসামরিক লোকদের ওরা যানবাহনে করে নিয়ে যাবে? সে প্রশ্নই ওঠে না। ওরা ব্যবহার করবে যে যার 'পা-গাড়ি'।' (ডুসেলের মুখের বুলিই হল– চরণদাস বাবাজী।)

হেংক্– 'আমি ওর একবর্ণও বিশ্বাস করি না। তোমরা সবকিছুর শুধু অন্ধকার দিকটাই দেখ। বেসামরিক লোকদের ঝেঁটিয়ে নিয়ে গিয়ে ওরা করবেটা কী?'

গু-ম– 'জানেন না গোয়েবল্‌স্ বলেছে, আমরা যদি পিছিয়ে আসি তাহলে দখল করা সমস্ত দেশের দরজা দড়াম করে বন্ধ করে দিয়ে চলে আসব।'

হেংক্– 'ওরা তো বলার কিছু বাকি রাখেনি।'

গু-ম– 'আপনি কি মনে করেন জার্মানরা এসবের ঊর্ধ্বে কিংবা তারা খুব হৃদয়বান লোক? ওরা স্রেফ মনে করে– যদি আমাদের ডুবতে হয় তাহলে যারা মুঠোর মধ্যে আছে তাদের সবাইকে নিয়ে আমরা ডুবব।'

হেংক্– 'ওসব গিয়ে দরিয়ার লোকদের বলুন; আমি বিন্দুমাত্র বিশ্বাস করি না।'

গু-ম– 'এটাই সবসময় হয়ে থাকে; ঘাড়ে এসে পড়ার আগে কেউ বিপদ দেখতে পায় না।'

হেংক্– 'আপনারা তো নিশ্চয় করে কিছুই জানেন না; সবটাই আপনাদের শুধু অনুমান।'

গু-ম– 'আমরা হলাম সবাই পোড়-খাওয়া মানুষ; আগে জার্মানিতে, এখন এখানে। রুশদেশেই বা কী ঘটছে?'

হেংক্– 'ইহুদীদের কথা বাদ দিন। আমার মনে হয় রুশদেশে কী ঘটছে কেউই তার খবর রাখে না। প্রচারের জন্যে ইংরেজ আর রুশরা অনেক কিছু নিশ্চয়ই বাড়িয়ে বলছে। ঠিক জার্মানদেরই মতন।

গু-ম– 'বাজে কথা, ইংরেজরা বেতারে সবসময় সত্যি কথাই বলছে। অতিশয়োক্তি আছে এটা ধরে নিয়েও বলা যায় যে, সত্যি যা ঘটছে তা অতিশয় খারাপ। কেননা পোল্যাণ্ড আর রুশদেশে লক্ষ লক্ষ লোককে ওরা যে স্রেফ কোতল করেছে আর গ্যাস দিয়ে মেরেছে, তা তো আপনি অস্বীকার করতে পারেন না।'

এইসব কথোপকথনের দৃষ্টান্ত বাড়িয়ে তোমাকে কষ্ট দেব না। আমি নিজে খুব চুপচাপ থাকি এবং এইসব হৈ-হট্টগোলে মোটেই মাথা গলাই না। এখন আমি এমন পর্যায়ে পৌঁচেছি, যেখানে বাঁচি বা মরি এ নিয়ে আমার তেমন মাথাব্যথা নেই। আমি না থাকলেও দুনিয়া যেমন চলছে তেমনি চলবে। যা ঘটবার তা ঘটবে; বাধা দেবার চেষ্টা করে লাভ নেই।

আমি ভাগ্যে বিশ্বাস করি এবং শুধু কাজ করে যাই এই আশায় যে, পরিণামে সব কিছু ভালো হবে।

তোমার আনা।

শনিবার, ১২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৪

আদরের কিটি,

ঝকঝক করছে রোদ, আকাশ গাঢ় নীল, সুন্দর হাওয়া দিচ্ছে আর আমি কী আকুল হয়ে অপেক্ষা করছি– মনে মনে চাইছি– সবকিছু। কথা বলে মনের ভার হালকা করতে, খাঁচা ছেড়ে বেরিয়ে পড়তে, বন্ধুদের সঙ্গ পেতে, নিরিবিলিতে একা থাকতে। সেই সঙ্গে কী যে ইচ্ছে করছে... চিৎকার করে কাঁদতে! আমি জানি কাঁদলে বুকটা একটু হালকা হত; কিন্তু পারছি না। আমি অস্থির হয়ে কেবল এ-ঘর ও-ঘর করছি, বন্ধ জানালার ফাঁক-ফোকড় দিয়ে নিশ্বাস নিচ্ছি আর বুকের মধ্যে ধড়াস ধড়াস করছে, যেন বলছে; 'তুমি কি শেষ অবধি আমার মনোবাসনাগুলো চরিতার্থ করতে পারো না?' আমার বিশ্বাস, এ হল আমার মধ্যে নিহিত বসন্ত; আমি অনুভব করছি বসন্তের উন্মীলন; আমার সারা দেহ মনে তার সাড়া পাচ্ছি। সহজে পারছি না স্বাভাবিক হতে, সবকিছু কেমন যেন গুলিয়ে যাচ্ছে, জানি না কী পড়ব, কী লিখব, কী করব, শুধু জানি আমি ব্যাকুল হয়ে আছি।

তোমার আনা।

রবিবার, ১৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৪

আদরের কিটি,

শনিবারের পর আমি আর ঠিক আগের আমি নেই; ইতিমধ্যে অনেক কিছু ঘটে গেছে। কিভাবে কী হল বলছি। আমি আকুল ভাবে চাইছিলাম– এবং এখনও চাইছি– কিন্তু... এখন এমন কিছু ঘটেছে, যাতে সেই চাওয়ার তীব্রতা সামান্য, নেহাতই সামান্য,হ্রাস পেয়েছে।

আমার যে কী আনন্দ– অকপটেই তা স্বীকার করব– যখন রাত পোহাতেই আজ সকালে চোখে পড়ল পেটার সারাক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। সেটা মামুলি গোছের তাকানো নয়, আমি জানি না কী তার ধরন, আমি ঠিক বুঝিয়ে বলতে পারব না।

আমি ভাবতাম পেটার ভালবাসে মরগটকে, কিন্তু কাল হঠাৎ আমার কেমন যেন মনে হল সেটা ঠিক নয়। আমি বিশেষ ভাবে চেষ্টা করলাম তার দিকে খুব বেশি না তাকাতে, কেননা ওর দিকে চাইলেই ওর চোখও আমার দিকে ফেরে আর তখন– হ্যাঁ, তখন– আমার মধ্যে একটা মধুর অনুভূতি জেগে ওঠে, কিন্তু খুব ঘন ঘন সেটা যেন বোধ না করি।

আমি প্রাণপণে একা হতে চাই। বাপি আমার মধ্যেকার ভাবান্তর লক্ষ্য করেছেন, কিন্তু তাঁকে আমার সব কথা বলা সত্যিই সম্ভব নয়। 'আমাকে বিরক্ত করো না, নিজের মনে থাকতে দাও'– এই কথা সারাক্ষণ চিৎকার করে আমার বলতে ইচ্ছে করছে। কে জানে, হয়ত এমন দিন আসবে যখন আমি এত একা হয়ে পড়ব যতটা একা হতে আমি চাই না।

তোমার আনা।

সোমবার, ১৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৪

আদরের কিটি,

রবিবার আমি আর পিম ছাড়া বাকি সবাই 'জার্মান ওস্তাদের অমর সঙ্গীত' শোনবার জন্যে রেডিওর পাশে বসেছিল। ডুসেল অনবরত রেডিওর চাবিগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করছিলেন। তাতে পেটার এবং অন্যরাও জ্বালাতন বোধ করছিল। আধঘন্টা সহ্য করার পর পেটার

খানিকটা রেগেমেগে জিজ্ঞেস করে উনি চাবি নিয়ে নাড়াচাড়া বন্ধ করবেন কিনা। ডুসেল একেবারেই ওকে পাত্তা না দিয়ে জবাব দেন, 'এটাকে আমি ঠিকঠাক করছি।' পেটার রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে ওঁকে যা-তা বলে। মিস্টার ভান ডান ওর পক্ষ নিলে ডুসেলকে ঘাট মানতে হয়। এই হয়েছিল ব্যাপার।

কারণটা এমনিতে খুব একটা গুরুতর ছিল না, কিন্তু পেটারকে দেখে মনে হল এ নিয়ে ও খুব বিচলিত। যাই হোক, ছাদের ঘরে আমি যখন আলমারিতে বই খুঁজছি, পেটার আমার কাছে এসে পুরো ব্যাপারটা বলতে শুরু করল। আমি কিছুই জানতাম না, কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই পেটার যখন দেখল সে একজন মনোযোগী শ্রোতা পেয়েছে তখন সে বেশ গড় গড় করে বলে চলল।

বলল, 'আর দেখ, আমি সহজে কিছু বলি না। কেননা আমি বিলক্ষণ জানি, বলতে গিয়ে ফল হবে এই যে, আমার কথা আটকে যাবে। আমি তো-তো করতে থাকব, লজ্জায় লাল হব এবং যেটা মনে আছে সেটা ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে বলতে গিয়ে কথা খুঁজে না পেয়ে মাঝপথে চুপ করে যাব। কাল ঠিক তাই হয়েছিল, আমি সম্পূর্ণ অন্য কথা বলতে চেয়েছিলাম, কিন্তু একবার শুরু করে দিয়ে কেমন যেন সব তালগোল পাকিয়ে গেল– জঘন্য ব্যাপার। আমার একটা বিশ্রী অভ্যেস ছিল; আমার মনে হয় আজও সেটা থাকলে ভালো হত। আগে কারো ওপর রেগে গেলে তর্কাতর্কির ভেতর না গিয়ে সোজা তাকে ঘুষি মেরে বসতাম। আমি বিলক্ষণ বুঝতে পারি, এই পদ্ধতিতে আমি কিছু করতে পারব না। আমি তোমাকে তারিফ করি সেই কারণেই। কথা খুঁজে পাচ্ছ না, এমন কখনও তোমার হয় না, মানুষকে তুমি বলো ঠিক যে কথাটা তুমি বলতে চাও। কোনো কথা কখনও তোমার বলতে বাধে না।'

আমি বললাম, 'তুমি খুব ভুল করছ। আমার মনে থাকে এক কিন্তু বলবার সময় সাধারণত একেবারে ভিন্ন ভাবে বলি। তাছাড়া আমি একটু বেশি বকবক করি এবং বড় বেশি সময় নিই, সেটাও কম খারাপ নয়।'

শেষ বাক্যটাতে এসে মনে মনে আমি না হেসে পারলাম না। কিন্তু আমার তখন ইচ্ছে, পেটার তার নিজের কথা বলে চলুক; তাই কোনো উচ্চবাচ্য না করে মেঝেতে একটা কুশনের ওপর পুঁটুলি পাকিয়ে বসে ওর দিকে উৎকর্ণ হয়ে চেয়ে রইলাম। এ বাড়িতে আরেকজন আছে যে আমার মতন একই রকম ক্ষেপে আগুন হয়। আমি দেখলাম মনের সুখে ডুসেলের আদ্যশ্রাদ্ধ করতে পেরে পেটারের ভালোই হয়েছে। আমার দিক থেকে কাউকে লাগানো-ভজানোর ভয় ওর নেই। সেদিক থেকে আমিও বেজায় খুশি, কেননা আমাদের দুজনের মধ্যে যে একটা সত্যিকার সহমর্মিতা গড়ে উঠেছে এটা অনুভব করতে পারছি। আমার মনে পড়ে, একদিন আমার মেয়েবন্ধুদের সঙ্গে ঠিক এমনই একটা সম্পর্ক ছিল।

তোমার আনা।

বুধবার, ১৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৪

আদরের কিটি,

আজ মারগটের জন্মদিন। সাড়ে বারোটায় পেটার এল উপহারের জিনিসগুলো দেখতে এবং কথা বলতে বলতে থেকে গেল যতক্ষণ থাকলে চলত তার চেয়েও বেশি– যেটা তার স্বভাববিরুদ্ধ। বিকেলের দিকে আমি গেলাম কিছুটা কফি আনতে এবং তারপর আলু আনতে। কেননা বছরের এই একটা দিন আমি চেয়েছিলাম আদর দিয়ে ওকে একটু মাথায়

চড়াতে। আমি গেলাম পেটারের ঘরের ভেতর দিয়ে; সঙ্গে সঙ্গে পেটার তার সমস্ত কাগজপত্র সিঁড়ি থেকে সরিয়ে নিল। ওকে আমি জিজ্ঞেস করলাম ছাদের ঘরের কজা দেওয়া দরজাটা বন্ধ করে দেব কিনা। বলল, 'বন্ধ করে দাও। যখন আসবে, দরজায় টোকা দিও, আমি খুলে দেব।'

ওকে ধন্যবাদ দিয়ে ওপরে গেলাম। বড় জালাটার মধ্যে কম করে দশ মিনিট ধরে সবচেয়ে ছোট আলুগুলো ছুঁড়লাম। ততক্ষণে আমার কোমর দরে গেছে এবং ঠাণ্ডাও লেগেছে। স্বভাবতই ডাকাডাকি না করে আমি নিজেই টানা দরজাটা খুলেছি। এ সত্ত্বেও পেটার সঙ্গে সঙ্গে নিজের থেকেই আমার কাছে এসে আমার হাত থেকে প্যান্টা নিল।

বললাম, 'অনেক খুঁজে পেত স্কুদে আলু বলতে বেছে এইগুলো পেয়েছি।'

'বড় জালাটা দেখেছিলে?'

'কোনোটাই দেখতে বাকি রাখিনি।'

বলতে বলতে সিঁড়ির গোড়ায় এসে আমি দাঁড়িয়েছি। পেটার তখনও হাতের প্যান্টা তন্ন তন্ন করে দেখছে। পেটার বলল, 'ব্যস্ রে, সেরা আলুগুলোই তো বেছে এনেছ।' তারপর ওর হাত থেকে প্যান্টা ফেরত নেবার সময় বলল, 'বাহাদুর মেয়ে!' সেই সময় ওর চাহনিতে ফুটে উঠেছিল এমন একটা শান্ত স্নিগ্ধ ভাব যে, তাতে আমার ভেতরটা মধুর আবেশে ভরে উঠল। আমি বস্তুতই দেখতে পেলাম পেটার আমার মন পেতে চাইছে এবং যেহেতু সে দীর্ঘ প্রশস্তিবাচনে অপারগ সেইজন্যে সে চোখ দিয়ে কথা বলছিল। আমি অতি সুন্দরভাবে বুঝতে পারছিলাম ও কী বলতে চাইছে এবং সেজন্যে নিজেকে ধন্য মনে করছিলাম। আজও সেইসব কথা আর তার সেই চাহনি স্মরণ করে মন আনন্দে ভরে ওঠে।

নিচে নামতেই মা-মণি বললেন আমাকে আরও কিছুটা আলু আনতে হবে, রাতের খাবারের জন্যে। আমি তো ওপরে যাওয়ার জন্যে তক্ষুনি এক পায়ে রাজী।

পেটারের ঘরে ঢুকে ওকে ফের বিরক্ত করার জন্যে ক্ষমা চেয়ে নিলাম। যখন আমি সিঁড়িতে পা দিয়েছি, পেটার উঠে পড়ে দরজা আর দেয়ালের মাঝখানে দাঁড়িয়ে শক্ত হাতে আমার বাজু ধরে জোর করে আমাকে আটকাতে চাইল।

বলল, 'আমি যাচ্ছি।' উত্তরে আমি বললাম তা দরকার নেই, কেননা এবারে আমাকে তত ছোট ছোট আলু বাছতে হবে না। বুঝতে পেরে পেটার আমার হাত ছেড়ে দিল। আলু নিয়ে নামার সময় ও এসে টানা দরজাটা খুলে আবার আমার হাত থেকে প্যান্টা নিল। দোরগোড়ায় এসে আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'কী করছ?' পেটার জবাব দিল, 'ফরাসী'। ওর অনুশীলনগুলো একটু দেখতে পারি কিনা জেনে নিলাম। তারপর হাত ধুয়ে এসে ওর সামনাসামনি ডিভানটাতে গিয়ে বসলাম।

ফরাসী ভাষার কয়েকটা জিনিস গোড়ায় ওকে বুঝিয়ে দিলাম। তারপরই আমাদের কথা শুরু হয়ে গেল। পেটার বলল ওর ইচ্ছে, পরে ওলন্দাজ-অধিকৃত পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে চলে গিয়ে কোনো বাগিচায় বসবাস করবে। পারিবারিক জীবন, কালোবাজার– এইসব প্রসঙ্গের পর ও বলল– নিজেকে ওর একেবারেই অপদার্থ মনে হয়। আমি ওকে বললাম ওর মধ্যে নিশ্চয়ই হীনমন্যতার জট আছে। ইহুদীদের প্রসঙ্গ ও তুলল। বলল ও যদি খ্রীস্টান হত তাহলে ওর পক্ষে অনেক কিছু সহজ হয়ে যেত এবং যদি যুদ্ধের পরে হতে পারে। ও শুদ্ধীকরণ চায় কিনা জিজ্ঞেস করলাম। কিন্তু তাও সে চায় না। বলল, যুদ্ধ মিটে গেলে কে আর জানছে সে ইহুদী?

এতে আমি একটু মনঃক্ষুণ্ণই হলাম এটা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে সবসময় ওর স্বভাবে একটু মিথ্যের ছোঁয়া থাকে। বাপি সম্পর্কে, লোকচরিত্রের প্রসঙ্গে এবং আরও যাবতীয় বিষয়ে বাদবাকি কথাবার্তা বেশ খোশমেজাজে হল। কিন্তু কী কথা হয়েছিল এখন আর ঠিক মনে নেই। আমি যখন উঠলাম ঘড়িতে যখন সাড়ে চারটে বেজে গেছে।

সন্ধ্যেবেলায় পেটার অন্য একটা কথা বলেছিল। আমার কাছে সেটা ভালোই লেগেছিল। একবার ওকে আমি এক চিত্রতারকার ছবি দিয়েছিলাম; ছবিটা গত দেড় বছর ধরে ওর ঘরে টাঙানো রয়েছে। ছবিটা নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে পেটার বলল ওটা ওর খুব প্রিয়। আমি ওকে পরে কখনও আর কিছু ছবি দেব বলায় পেটার জবাব দিল, 'না। ওটা যেমন আছে থাক। রোজই আমি ছবিগুলো চেয়ে চেয়ে দেখি; এখন ওরা হয়ে পড়েছে আমার হলায়গলায় বন্ধু।'

এখন আমি আরও ভালো করে বুঝতে পারি, পেটার কেন সব সময় মুশ্চির সঙ্গে লেপ্‌টে থাকে। ও খানিকটা স্নেহের কাঙাল তো বটেই। বলতে ভুলে গিয়েছিলাম পেটারের অন্য একটা বক্তব্যের কথা। ও বলেছিল, নিচের ত্রুটির কথা মনে হলেই যা ঘাবড়ে যাই, নইলে ভয় কাকে বলে আমি জানি না। কিন্তু সে দোষও আমি কাটিয়ে উঠছি।'

পেটারের সাংঘাতিক হীনমন্যতা। যেমন, পেটার সর্বক্ষণ মনে করে সে হল মাথামোটা আর আমরা খুব চতুর। ওর ফরাসী চর্চায় আমি সাহায্য করলে হাজার বার আমাকে ও ধন্যবাদ দেয়। একদিন আমি ঘুরে দাঁড়িয়ে ওকে বলব– 'থামো তো, ইংরেজি আর ভুগোলে তুমি আমার চেয়ে অনেক ভালো।'

তোমার আনা।

শুক্রবার, ১৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৪

আদরের কিটি,

যখনই আমি ওপর তলায় যাই, আশায় আশায় থাকি ওর হয়ত দেখা পাব। কেননা আমার জীবনে এখন একটা উদ্দেশ্য এসেছে, এখন কিছু একটা প্রত্যাশা করতে পারি, সবকিছুই আমার কাছে আজ রমণীয় হয়ে উঠেছে।

অন্তত আমার অনুভবের উৎস তো সর্বদাই হাজির; আমার কোন ভয় নেই, কেননা মারগটকে বাদ দিলে আমি তো অপ্রতিদ্বন্দ্বী। ভেবো না আমি প্রেমে পড়েছি; কেননা প্রেমে আমি পড়িনি। কিন্তু আমাদের মধ্যে একটা কোনো সুন্দর সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে, যা আমাদের দেবে বল ভরসা আর বন্ধুত্ব– আমি এটা সবসময় অনুভব করি। একটা কোনো ছুতো পেলেই এখন আমি ওপরে ওর কাছে চলে যাই। আগে একটা সময় ছিল যখন পেটার কী করে কথা শুরু করবে জানত না। এখন আর তা নয়! বরং তার উল্টো। যাবার সময় আমার এক পা যখন ঘরের বাইরে– তখনও পেটারের কথা শেষ হতে চায় না।

মা-মণি আমার আচরণে তেমন খুশি নন; সবসময়ে বলেন, আমাকে নিয়ে ঝামেলা হবে এবং আমি যেন পেটারকে না জ্বালাই। আশ্চর্য, উনি কি এটা বোঝেন না যে আমার ঘটে কিছুটা বুদ্ধি আছে? পেটারের ছোট ঘরটাতে যখনই যাই মা-মণি আমার দিকে এমন আড়চোখে তাকান। সেখানে নিচে নেমে এলেই জিজ্ঞেস করেন এতক্ষণ কোথায় ছিলাম। আমার গা রী রী করে। খুব জঘন্য লাগে।

তোমার আনা।

শনিবার, ১৯ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৪

আদরের কিটি,

আবার সেই শনিবার এবং তাতেই সব স্পষ্ট হয়ে যায়।

সকালটা ছিল চুপচাপ। ওপর তলায় গিয়ে আমি কিছুটা বাড়ির কাজে সাহায্য করেছি; কিন্তু 'ওর' সঙ্গে দু-একটা ঠুন্‌কো কথা ছাড়া হয়নি। আড়াইটে নাগাদ সবাই যখন শুতে কিংবা পড়তে যে যার ঘরে চলে গেছে, আমি কম্বল আর যা কিছু সব নিয়ে টেবিলে বসে লেখাপড়া করতে খাস কামরায় চলে গেলাম। কিছুক্ষণ পরেই আমি একেবারে ভেঙে পড়লাম, কাঁধের ওপর মাথা এলিয়ে দিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলাম। দুই চোখ বেয়ে পানি গড়িয়ে পড়তে লাগল; তখন আমার কী বিশ্রী মনের অবস্থা কী বলব। ইস! 'ও' যদি একবার এসে আমার দুঃখ ভুলিয়ে দেয়। চারটে নাগাদ আবার আমি ওপরে গেলাম। আবার তার দেখা পাব, মনে এই আশা নিয়ে গেলাম খানকতক আলু আনতে। যখন আমি গোসলের ঘরে চুল ঠিক করছি, ঠিক তখনি সে মালখানায় বেখোর খোঁজে নিচে নেমে গেল।

হঠাৎ আবার চোখ ফেটে পানি চলে আসার উপক্রম হয়। সঙ্গে সঙ্গে আমি শৌচাগারে ছুটে যাই। যেতে যেতে তাড়াতাড়ি একটা পকেট-আয়না টেনে নিই। তারপর সেখানেই পুরো জামাকাপড়সুদ্ধ বসে পড়ি আর আমার লাল আঁচলে চোখের পানি পড়ে কালো কালো দাগে ভরে যায়। আমার এত মন খারাপ লাগছিল বলার নয়।

আমার মনের মধ্যে তখন এই রকম হচ্ছিল। ইস্‌, এভাবে আমি কখনই পেটারের কাছে যেতে পারি না। বলা যায় না, ও হয়ত আমাকে আদৌ পছন্দ করে না এবং মনের কথা বলার মত কাউকেই ওর দরকার নেই। হয়ত আমার কথা ও নেহাত ওপরসা ভাবে। আমাকে হয়ত আবারও সেই সাথীহারা একা হয়ে যেতে হবে, পেটার থাকবে না। হয়ত কিছুদিনের মধ্যেই আমার না থাকবে আশ্বাস না কোনো স্বস্তি; হয়ত এরপর হাপিত্যেশ করারও কিছু থাকবে না। ইস্‌, আমি যদি ওর কাঁধে আমার মাথা রাখতে পারতাম, নিজেকে যদি এত নিঃসঙ্গ, এত পরিত্যক্ত মনে না হত! ও আমার কথা আদৌ চিন্তা করে কিনা এবং অন্যদের দিকেও ঠিক একই ভাবে তাকায় কিনা, কে জানে! ও আমাকে বিশেষ ভাবে দেখে, এটা হয়ত ছিল আমারই মন গড়া। ও পেটার, শুধু যদি আমি তোমার চক্ষুকর্ণের গোচর হতাম! যা ভয় করছি তাই যদি সত্যি হয়, তাহলে তা হবে আমার সহ্যের বাইরে।

যাই হোক, অবিরল অশ্রুধারার মধ্যেও একটু বাদে মনে হল যে আবার নতুন আশ্বাস আর প্রত্যাশা ফিরে এসেছে।

তোমার আনা।

বুধবার, ২৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৪

আদরের কিটি,

বাইরে ভারি সুন্দর আবহাওয়া। কাল থেকে মনে আমার বেশ স্ফূর্তির ভাব। প্রায় রোজ সকালেই ছাদের ঘরে চলে যাই যেখানে পেটার কাজ করে। জোরে জোরে নিশ্বাস নিয়ে নিচের দমবন্ধ ভাব দূর করি। মেঝেতে একটা জায়গা আছে, সেখান থেকে মুখ তুলে তাকিয়ে নীল আকাশ দেখি। নিষ্পত্র একটা চেস্টনাট গাছ, তার ডালে ডালে রূপোর মতন জ্বলজ্বল করে বৃষ্টির ছোট ছোট ফোঁটা। হাওয়ায় ভেসে বেড়ানো সী-গাল আর অন্যান্য পাখি।

একটা মোটা কড়িকাঠে মাথা ঠেকিয়ে পেটার দাঁড়িয়ে। আমি বসলাম। খোলা হাওয়ায় আমরা নিঃশ্বাস নিচ্ছি। বাইরে আমাদের দৃষ্টি প্রসারিত। দুজনেই বুঝছি, কথা বললেই এই মোহজাল ছিঁড়ে যাবে। অনেকক্ষণ আমাদের এইভাবে কেটে গেল। পেটারকে যখন কাঠ চেলা করতে মট্‌কায় যেতে হল, তখন আমার উপলব্ধি হল মানুষটা খুব চমৎকার। পেটার মই বেয়ে ওপরে উঠে গেল; ওর দেখাদেখি আমিও উঠলাম।

মিনিট পনেরো ধরে ও কাঠ চেলা করল। এ পর্যন্ত আমরা কেউ একটাও কথা বলিনি। আমি ঠায় দাঁড়িয়ে ওকে দেখছি! দেখেই বোঝা যায় ও কতটা জোয়ান সেটা সর্বশক্তিতে দেখানোর চেষ্টা করছে।

কিন্তু সেই সঙ্গে আমি চেয়ে দেখছি খোলা জানলার বাইরে আমস্টার্ডামের বিস্তীর্ণ অঞ্চল, ছাদের পর ছাদ আর দূর দিগন্তে, তার রঙ এমনই ফিকে নীল যে বোঝাই দায়, কোথায় তার শেষ আর কোথায় শুরু। আমি মনে মনে বললাম, 'যতদিন এর অস্তিত্ব আছে আর আমি বেঁচে থেকে দেখব এই রৌদ্রালোক, নির্মেঘ আকাশ, এ যতক্ষণ আছে আমি অসুখী হতে পারি না।'

যারা সন্ত্রস্ত, যারা নিঃসঙ্গ অথবা যারা অসুখী, তাদের পক্ষে সবচেয়ে প্রশস্ত হল বাইরের কোথাও চলে যাওয়া, এমন জায়গায় যেখানে জ্যোতির্লোক, নিসর্গ আর ঈশ্বরের সঙ্গে তারা একা হতে পারবে। কারণ, একমাত্র তখনই কেউ অনুভব করে সবকিছু যথোচিত আছে; এবং প্রকৃতির শুদ্ধ সৌন্দর্যের মাঝখানে মানুষ খুশি হোক, ঈশ্বর তাই চান। এ যতদিন আছে, এবং এ জিনিস নিশ্চয় চিরদিই থাকবে; আমি জানি, যখন যে অবস্থাই আসুক, প্রত্যেকটি, সন্তাপে সব সময়ই সান্ত্বনা মিলবে। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, সব কষ্টের উপশম ঘটায় প্রকৃতি।

আমি এমন একজনের সঙ্গে এই পরম সুখানুভূতি ভাগ করে নিতে চাই, এ ব্যাপারে যার জ্ঞানবোধগুলো আমারই মতন। মন বলছে, হয়ত সেটা ঘটতে খুব বেশি দেরি হবে না।

তোমার আনা।

একটা ভাবনা

এখানে এত কিছু পাই না, তার পরিমাণ এত বেশি এবং আজ এতদিন ধরে; তোমার মতোই আমি বঞ্চিত। বাইরের জিনিসপত্রের কথা তুলছি না, সেদিক থেকে বরং আমাদের দেখবার লোক আছে; আসলে আমি বলছি ভেতরের জিনিসের কথা। তোমার মতন, আমি চাই স্বাধীনতা আর খোলা হাওয়া, কিন্তু এখন আমার ধারণা, বহু কিছু আছে যাতে আমাদের অভাব পুষিয়ে যায়। আজ সকালে জানালার ধারে বসে বসে এটা হঠাৎ আমার উপলব্ধি হল। আমি বলছি ভেতরের ক্ষতিপূরণের কথা।

যখন আমি বাইরে তাকিয়ে সরাসরি নিসর্গ আর ঈশ্বরের গহনে চোখ রাখলাম, তখন আমি সুখ পেলাম, সত্যিকার সুখ। আর দেখ পেটার, যতক্ষণ আমি এখানে সেই সুখ পাই– প্রকৃতি, সুস্থ সবলতা এবং আরও অনেক কিছুর আনন্দ, সর্বক্ষণই তা পাওয়া যায়– সমস্ত সময়ই সেই সুখ মনের মধ্যে ফিরিয়ে আনা যেতে পারে।

ধনদৌলত পুরোটাই খোয়া যেতে পারে, কিন্তু তোমার আপন হৃদয়ে সেই সুখ শুধুমাত্র অবগুণ্ঠিত হতে পারে; যতদিন তুমি বেঁচে থাকবে ততদিন আবারও তা তোমাকে সুখ এনে দেবে। যতদিন তুমি অকুতোভয়ে জ্যোতির্লোকে দৃষ্টি ফেরাতে পারবে, ততদিন তুমি জানছ অন্তরে তুমি শুদ্ধ এবং চাইলেই সুখ পাবে।

রবিবার, ২৭ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৪

প্রিয়তম কিটি,

সেই কোন্ ভোর থেকে অনেক রাত অবধি পেটারের কথা ভাবা ছাড়া আমি প্রায় আর কিছুই করি না। ঘুমোবার সময় আমার চোখের পটে থাকে ওর ছবি, ওকে নিয়ে আমার স্বপ্ন এবং যখন চোখ খুলি তখনও ও আমার দিকে তাকিয়ে।

আমার খুব মনে হয়, বাইরে যেমনই দেখাক, প্রকৃতপক্ষে পেটার আর আমার মধ্যে খুব একটা তফাত নেই। কেন বলছি– আমাদের দুজনেরই মা থেকেও নেই। ওর মা-র হালকা স্বভাব, ফস্টিনষ্টি করতে ভালবাসেন, ছেলের মনে কী হচ্ছে তা নিয়ে ওঁর বিশেষ মাথাব্যথা নেই। আমার মা আমার সম্পর্কে চিন্তা করেন, কিন্তু তাঁর মধ্যে সংবেদনশীলতা এবং মাতৃসুলভ বৃত্তির অভাব। পেটার আর আমি, আমরা দুজনেই আমাদের ভেতরকার অনুভূতিগুলোর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ি, এখনও আমরা অনিশ্চয়তার মধ্যে আছি, রুক্ষ ব্যবহার পেলে মনে খুব লাগে। কেউ যদি তেমন করে, আমার মনে হয় 'যেদিকে দুচোখ যায় চলে যাই'। কিন্তু সেটা সম্ভব নয় বলে, আমি আমার মনের ভাব গোপন করে গটগটিয়ে চলি, গলাবাজি করি আর মেজাজ দেখাই– যাতে প্রত্যেকে ঝেঁটিয়ে দূর করে দিতে চায়।

পেটার এর ঠিক উল্টো। ও ঘরে ঢুকে খিল এঁটে দেয়, কথা প্রায় বলে না বললেই হয়, চুপচাপ বসে সুখস্বপ্ন দেখে এবং তার মতো করে নিজেকে ও আড়াল করে রাখে।

কিন্তু কখন কিভাবে আমরা শেষ পর্যন্ত পরস্পরের কাছে পৌঁছব? আমি ঠিক জানি না, আমার সহজ বুদ্ধি আর কতদিন এই উৎকণ্ঠাকে সামাল দিয়ে চলবে।

তোমার আনা।

সোমবার, ২৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৪

প্রিয়তম কিটি,

কি দিনে কি রাত্রে– এটা একটা দুঃস্বপ্ন হয়ে উঠছে। প্রায় সারাক্ষণই ওকে দেখি অথচ ওর কাছে যেতে পারি না। আমাকে দেখে কেউ যাতে বুঝতে না পারে, তার জন্যে যখন আমি আসলে মুষড়ে পড়ি তখনও নিজেকে আমার হাসিখুশি দেখাতে হবে।

পেটার ভেসেল আর পেটার ফান ডান মিলে এখন পেটারে একাকার হয়ে গেছে। পরমপ্রিয় আর সজ্জন এই পেটার; ওর জন্যে আমার কী যে আকুলিবিকুলি কী বলব।

মা-মণি ক্লান্তিকর, বাপির মিষ্টি স্বভাব এবং সেইজন্যেই আরও ক্লান্তিকর। মারগট সবচেয়ে বেশি ক্লান্তিকর, কারণ ও চায় আমি হাসিখুশি ভাব নিয়ে থাকি। আমি বলি আমাকে আমার মতো থাকতে দাও।

চিলেকোটায় পেটার আমার কাছে এল না। তার বদলে মটকায় উঠে গিয়ে ছুতোরের কিছু কাজ করল। একবার করে আওয়াজ হয় চটাস্ আর খটাস্, অমনি আমার বুকের মধ্যে যে ধড়াস্ করে ওঠে। আর আমি ততই বিমর্ষ হয়ে পড়ি। দূরে ঘন্টা বাজছে 'শুদ্ধ দেহ, শুদ্ধ আত্মার' সুরে (পুরোনো ঘড়িওয়ালা মিনারে ঘন্টা বাজে গানের সুরে)। আমি ভাবপ্রবণ হয়ে পড়ছি– আমি তা জানি; আমি মন-ভাঙা আর ভোঁতা হয়ে পড়ছি– তাও জানি। কে আছ, আমাকে বাঁচাও!

তোমার আনা।

বুধবার, ১ মার্চ, ১৯৪৪

আদরের কিটি,

আমার নিজের ব্যাপারগুলো এখন আড়ালে *ঠেলে* দিয়েছে– এক চুরির ঘটনা। চোর চোর করে আমি ক্রমশ লোকের কানের পোকা বের করে ফেলছি। না করে উপায় কি, চোররা যেকালে পায়ের ধুলো দিয়ে কোলেন অ্যাণ্ড কোম্পানিকে ধন্য করতে এতটা আহ্লাদ বোধ করে। ১৯৪৩-র জুলাইয়ের চেয়ে এই চুরির জট অনেক বেশি।

মিস্টার ফান ডান যখন সাড়ে সাতটায় রোজকার মতো ক্রালারের অফিসে যান, তখন দেখতে পান মাঝখানে কাঁচের দরজা আর অফিস ঘরের দরজা খোলা। সে কি কথা। ফান ডান এগিয়ে গিয়ে যখন দেখলেন ছোট্ট এঁদো ঘরটারও দরজা খোলা এবং সদর দপ্তরের জিনিসপত্র সব ছড়ানো ছিটানো, তখন তাঁর চক্ষু ছানাবড়া। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মনে হল, 'নিশ্চয় চোর ঢুকেছিল।' নিঃসন্দেহ হওয়ার জন্যে সামনের দরজাটা দেখতে তিনি সটান নিচের তলায় চলে গেলেন। ইয়েলের তালাটা নেড়েচেড়ে দেখলেন বন্ধ আছে, তখন উনি ঠাওরালেন, 'অর্থাৎ সন্ধ্যেবেলায় পেটার আর এলির ঢিলেমির জন্যেই এই কাণ্ড। ক্রালারের কামরায় কিছুক্ষণ থেকে, সুইচ টিপে আলো নিভিয়ে দিয়ে ফান ডান ওপরে উঠে আসেন– খোলা দরজা আর এলোমেলো অফিস ঘরের ব্যাপারটাকে তিনি আর তেমন আমল দেননি।

আজ সাতসকালে পেটার এসে আমাদের দরজায় কড়া নাড়ল। বলল, সামনের দরজাটা হাট করে খোলা। খবরটা খুব সুবিধের নয়। সে এও বলল যে, আলমারিতে রাখা প্রোজেক্টের আর ক্রালারের নতুন পোর্টফোলিওটা পাওয়া যাচ্ছে না। ফান ডান আগের দিন সন্ধেবেলায় তাঁর অভিজ্ঞতার কথা বললেন। শুনে তো আমাদের মাথায় হাত।

আসলে ঘটেছিল নিশ্চয় এই ব্যাপার যে, চোরের কাছে ছিল চাপকল, নইলে তালাটা একেবারে অক্ষত থাকে কেমন করে! চোর নিশ্চয় বাড়িতে সেঁধিয়েছিল অনেক আগে এবং তারপর দরজাটা বন্ধ করে দিয়েছিল। ঠিক সেই সময় হঠাৎ মিস্টার ফান ডান এসে যাওয়ায় তাড়াতাড়ি সে লুকিয়ে পড়ে। তারপর ফান ডান চলে যেতেই সে মালপত্র নিয়ে তাড়াতাড়িতে দরজা বন্ধ না করেই সরে পড়ে। এ বাড়ির চাবি কার কাছে থাকা সম্ভব? চোর এল অথচ মালখানায় গেল না। কেন? মালখানায় যারা কাজ করে তাদের মধ্যে কেউ নয় তো? ফান ডানের উপস্থিতি সে নিশ্চয়ই টের পেয়েছে এবং হয়ত দেখেও ফেলেছে। লোকটা আমাদের ধরিয়ে দেবে না তো?

এসব ভাবলেই গা শিউরে ওঠে। কেননা বলা তো যায় না, ঐ একই চোখ হয়ত এ বাড়িতে ফের হানা দেওয়ার মতলব করতে পারে। কিংবা কে জানে, এ বাড়িতে একজনকে ঘুরে বেড়াতে দেখে হয়ত তার একেবারে আক্কেল গুড়ুম?

তোমার আনা।

বৃহস্পতিবার, ২ মার্চ, ১৯৪৪

আদরের কিটি,

মারগট আর আমি, আমরা দুজনেই আজ ছাদের ঘরে উঠেছিলাম। আমি ধারণা করেছিলাম, দুজনে একসঙ্গে গেলে দুজনেরই ভালো লাগবে। সেটা ঘটেনি; তবু বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই মারগটের সঙ্গে আমার অনুভূতির মিল হয়।

বাসন ধোয়ার সময় মা-মণি আর মিসেস ফান ডানকে এলি বলেছিল যে, মাঝে মাঝেই তার খুব মন খারাপ লাগে। ওঁরা কি দাওয়াই বাৎলালেন শুনবে? মা-মণি কী উপদেশ দিলেন, জানো? এলির উচিত তাবৎ লাঞ্ছিত-নিপীড়িত মানুষের কথা ভাবা! কেউ যখন এমনিতেই মনমরা হয়ে আছে, তখন তাকে দুঃখের কথা ভাবতে বলে কী লাভ? আমি তাও বলেছিলাম, কিন্তু তার জবাবে আমাকে বলা হল, 'এসব কথার মধ্যে তুমি নাক গলাতে এসো না।'

বুড়োধাড়িরা যেমনি আহাম্মক তেমনি বোকা, তাই না? পেটার, মারগট, এলি আর আমি– যেন আমাদের জ্ঞানগম্যিগুলো ওঁদের মতো নয়; যেন একমাত্র মায়ের কিংবা অতিশয় ভালো কোনো বন্ধুর ভালবাসাই আমাদের সহায় হতে পারে। এখানকার এই মায়েরা আমাদের আদৌ বোঝে না। হয়ত মা-মণির তুলনায় মিসেস ফান ডান তবু একটু বোঝেন। ইস্, এলি বেচারাকে আমি কিছু বলতে পারলে বড় ভালো হত; ওকে আমি বলতাম আমার অভিজ্ঞতালব্ধ কথা, তাতে ওর মন ভালো হত। কিন্তু বাপি এসে মাঝপড়া হয়ে আমাকে সরিয়ে দিলেন।

বোকা আর বলেছে কাকে! আমাদের নিজস্ব মতো থাকতে ওঁরা দেবেন না। লোকে আমাকে মুখে কুলুপ আঁটতে বলতে পারে, কিন্তু তাতে তো আর আমার নিজের মতো থাকা ঠেকানো যাবে না। বয়স কম হলেও তাদের মনের কথা অবাধে বলতে দেওয়া উচিত।

একমাত্র বিপুল ভালবাসা আর অনুরাগ এলি, মারগট, পেটার আর আমার পক্ষে হিতকর হতে পারে; আমরা কেউ তা পাচ্ছি না। আমাদের মনের ভাব কেউ বুঝতে পারে না– বিশেষ ভাবে, এখানকার যারা গবেট, 'সবজান্তা'র দল, তারা তো নয়ই, কেননা, এখানে কেউ স্বপ্নেও ভাবতে পারে না যে, তাদের চেয়ে আমরা ঢের বেশি স্পর্শকাতর এবং চিন্তার দিক দিয়ে অনেক বেশি এগিয়ে।

মা-মণি ইদানীং আবার গজগজ করছেন– আমি আজকাল মিসেস ফান ডানের সঙ্গেই কথাবার্তা বেশি বলছি বলে উনি ঈর্ষা করছেন সেটা বোঝাই যায়।

আজ সন্ধ্যেবেলায় পেটারকে কোনোক্রমে পাকড়াও করতে পেরেছিলাম; আবার কমপক্ষে তিন কোয়ার্টার সময় দুজনে বকর বকর করেছি। ও সবচেয়ে বেশি ঝামেলায় পড়েছিল নিজের সম্বন্ধে বলতে গিয়ে; অনেকখানি সময় লেগেছিল ওকে দিয়ে কথা বের করতে। রাজনীতি, সিগারেট, এবং যাবতীয় জিনিস নিয়ে প্রায়ই ওর মা-বাবার মধ্যে যে খিটিমিটি হয়, এটা পেটার আমাকে বলেছিল। ও বেজায় মুখচোরা।

এরপর আমার মা-বাবা সম্পর্কে আমি ওকে বলেছিলাম। পেটার বাপির স্বপক্ষে বলল; ওর মতে, আমার বাপি একজন 'দারুণ লোক'। এরপর 'ওপর তলা' আর 'নিচের তলা' নিয়ে আবার আমাদের কথা হল; ওর মা-বাবাকে আমাদের যে সবসময় পছন্দ হয় না, এটা শুনে ও হাঁ হয়ে গেল। আমি বললাম, 'পেটার, তুমি জানো আমি সবসময় যা সত্যি তাই বলি; ওঁদের মধ্যে যেসব দোষ আমরা দেখতে পাই, কেন তোমাকে তা বলতে পারব না।' অন্যান্য কথার পিঠে আবার বললাম, 'তোমাকে সাহায্য করতে পেলে আমি যে কী খুশি হই, পেটার। পারি না করতে? তুমি খুবই ঝামেলার মধ্যে পড়েছ, অবশ্য মুখ ফুটে তুমি বলো না, তার মানে এ নয় যে– তুমি কিছু গায়ে মাখো না।'

'তোমার সাহায্য পেতে আমি সবসময়ই উৎসুক।'

'আমার মনে হয়, বাপির কাছে গেলে আরও ভালো ফল হবে। উনি সবকিছু সামলে দেবেন, এটা তোমাকে বলে দিচ্ছি। ওঁকে তুমি স্বচ্ছন্দে সব বলতে পারবে।'

'সত্যি, উনি একেবারেই বন্ধুর মতো।'

'বাপিকে তোমার খুব ভালো লাগে, তাই না?' পেটার মাথা নেড়ে সায় দেয়। 'তোমাকেও বাপির ভালো লাগে।'

পেটার তাড়াতাড়ি মুখ তোলে। মুখে ওর সলজ্জ আভা। আমার কথায় ওকে খুশী হতে দেখে কী ভালো যে লাগল।

পেটার জিজ্ঞেস করল, 'তুমি তাই মনে করো?'

আমি বললাম, 'করি বৈকি। মাঝে মাঝে টুকরো-টাকরা কথা থেকে সহজেই তা ধরে ফেলা যায়।'

পেটার সোনার ছেলে। ঠিক বাপিরই মতন!

তোমার আনা।

শুক্রবার, ৩ মার্চ, ১৯৪৪

আদরের কিটি,

আজ সন্ধেয় মোমবাতির (স্যাবাথের প্রাক্ সন্ধ্যায় ইহুদীদের বাড়িতে মোমবাতি জ্বালানো হয়) দিকে তাকিয়ে থেকে মন জুড়িয়ে গেল এবং আনন্দ হল। মোমবাতিতে যেন ভর করে আছেন ওমা এবং এই ওমাই আমাকে আশ্রয় দেন আর রক্ষা করেন, আমাকে তিনিই সবসময় পুনরায় সুখী করেন। কিন্তু...তিনি ছাড়া আছেন আরও একজন যাঁর হাতে আমার সমস্ত ভাব-অনুভবের চাবিকাঠি এবং সেই একজন...পেটার। আজ যখন আলু আনতে ওপরে গিয়ে প্যান হাতে তখন ও সিঁড়ির ধাপে দাঁড়িয়ে। আমাকে দেখেই সে বলে উঠল, 'দুপুরে খাওয়ার পর এতক্ষণ ছিলে কোথায়?' আমি গিয়ে সিঁড়ির ধাপে বসে পড়লাম, তারপর শুরু হল দুজনের কথা। সোয়া পাঁচটায় (এক ঘণ্টা দেরিতে) মেঝের ওপর বসানো আলুগুলো শেষ পর্যন্ত তাদের গন্তব্যস্থলে পৌঁছুল।

পেটার তার মা-বাবা সম্পর্কে একটি কথাও আর বলেনি; আমরা শুধু বই আর পুরনো প্রসঙ্গ নিয়ে কথা বলে গেলাম। ছেলেটার চোখে এমন একটা গদগদ ভাব; আমি প্রায় ওর প্রেমে পড়ে গিয়েছি, এমনি একটা অবস্থা। পরে সন্ধ্যেবেলায় ও সেই প্রসঙ্গ তুলল। আলুর খোসা ছাড়ানোর পর্ব শেষ করে আমি ওর ঘরে গিয়ে বললাম, আমার খুব গরম লাগছে।

আমি বললাম, 'মারগট আর আমাকে দেখলেই তুমি তাপমাত্রার হদিস পেয়ে যাবে। ঠাণ্ডা থাকলে দেখবে আমাদের মুখগুলো সাদা আর গরম থাকলে লাল।'

ও জিজ্ঞেস করল, 'প্রেমজ্বর?'

'প্রেমে পড়তে যাব কেন?' আমার উত্তরটা হল আকাট রকমের।

ও বলল 'কেন নয়?' তারপর আমাদের খেতে চলে যেতে হল।

এ প্রশ্নটার ভেতর দিয়ে পেটার কি কিছু বুঝিয়ে দিতে চেয়েছিল? শেষপর্যন্ত আজ আমি ওকে মুখ ফুটে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে, কাল আমি ওর বিরক্ত হওয়ার মতো কিছু বলেছি কিনা। শুনে ও শুধু বলল, 'ঠিক বলেছ, ভালো বলেছ!'

এটা কতটা লজ্জায় পড়ে বলা, আমার পক্ষে তা বিচার করা সম্ভব নয়।

কিটি, কেউ যখন প্রেমে পড়ে আর সারাক্ষণ তার প্রেমিকের কথা বলে, আমার হয়েছে সেই অবস্থা। পেটারের মতো ছেলে হয় না। কবে আমি ওকে আমার মনের কথা বলতে পারব? তখনই, যখন জানব আমিও ওর মনের মানুষ— সে তো বটেই। তবে আমি কারো

সাহায্যের থোরাই পরোয়া করি, ও সেটা বিলক্ষণ জানে। আর ও ভালবাসে চুপচাপ থাকতে; ফলে, ও আমাকে কতটা পছন্দ করে আমি জানি না। সে যাই হোক, আমরা কতকটা পরস্পরকে জানতে পারছি। আমরা যদি সাহস করে পরস্পরের কাছে আরও খানিকটা নিজেদের মেলে ধরতাম তো ভালো হত। হয়ত সেই লগ্ন অপ্রত্যাশিতভাবে আগেই এসে যাবে। দিনে বার দুই বোঝাপড়ার ভাব নিয়ে আমার দিকে ও তাকায়, চার চোখের মিলন হয় আর আমরা দুজনেই আনন্দে ডগমগ হই।

ওর খুশী হওয়ার প্রসঙ্গে মুখে আমার খই ফোটে এবং সেই সঙ্গে আমি এটা নিশ্চিতভাবে জানি যে, পেটারও আমার সম্বন্ধে সেটাই ভাবে।

তোমার আনা।

শনিবার, ৪ মার্চ, ১৯৪৪

আদরের কিটি,

মাসের পর মাস কেটে যাওয়ার পর এই প্রথম শনিবার। সেদিনটা একটুও একঘেয়ে, বিরক্তিকর এবং বিরস লাগেনি। এর কারণ পেটার। আজ সকালে আমি ছাদের ঘরে গিয়েছিলাম অ্যাপ্রন মেলে দিতে। বাপি বললেন ইচ্ছে হলে আমি যেন থেকে যাই এবং কিছুটা ফরাসীতে কথাবার্তা বলি। আমি থাকতে রাজী হলাম। গোড়ায় আমরা ফরাসীতে কথা বললাম এবং পেটারকে কিছুটা ব্যাখ্যা করে বোঝালাম; তারপর কিছুটা ইংরেজির চর্চা হল। বাপি চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে ডিকন্স থেকে পড়ে শোনালেন; পেটারের খুব কাছাকাছি বাপির চেয়ারে আমি বসেছিলাম বলে আনন্দে আমার সে যেন এক তুরীয় অবস্থা।

এগারোটায় আমি নিচে নামি। পরে সাড়ে এগারোটায় আবার ওপরে উঠে দেখি সিঁড়িতে ও আগে এসে আমার জন্যে দাঁড়িয়ে আছে। পৌনে একটা পর্যন্ত আমরা বকর বকর করলাম। খাওয়ার পর আমি যদি ঘর ছেড়ে চলে যাই, ও করে কি, সুযোগ পেলেই এবং যদি কেউ শুনতে না পায়, তাহলে বলে ঃ 'আসি, আনা! শীগগিরই দেখা হবে।'

ওঃ, আমার যে কী আনন্দ! ও কি আমার প্রেমে পড়বে! আমি অবাক হয়ে ভাবি। যাই বলো, চমৎকার মানুষটা। আর দেখ, কেউ জানে না, আমাদের কী প্রাণ মাতানো কথা হয়!

আমি যে ওর কাছে যাই, কথা বলি– মিসেস ফান ডান কোনো আপত্তি করেন না। তবে আজ আমাকে চটাবার জন্যে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'তোমরা দুটিতে যে একা ওপরে থাকো, তোমাদের বিশ্বাস করা যায় তো?'

আমি আপত্তি করে বললাম, 'নিশ্চয়। আপনি কিন্তু আমার আত্মসম্মানে ঘা দিচ্ছেন!'

সকাল থেকে রাত পর্যন্ত আমি পেটারের পথ চেয়ে বসে থাকি।

তোমার আনা।

সোমবার, ৬ মার্চ, ১৯৪৪

আদরের কিটি,

পেটারের মুখ দেখে বলতে পারি ও সমানে আমারই মতন চিন্তা করে। মিসেস ফান ডান কাল সন্ধ্যেবেলায় যখন মুখ ঝামটা দিয়ে বললেন, 'ভাবুক মশাইকে, দেখ।' আমার খুব রাগ হয়েছিল। পেটারের মুখ লজ্জায় লাল হয়ে উঠেছিল। আমি আরেকটু হলেই যা-তা বলে ফেলতাম

এই লোকগুলো মুখ বুজে থাকলেই তো পারে!

ও কী অসম্ভব একা, অথচ কিছু করবারও ওর ক্ষমতা নেই– দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এ জিনিস দেখা যে কী সাংঘাতিক, তুমি ধারণা করতে পারবে না। ওর জায়গায় নিজেকে রেখে আমি ওর অবস্থাটা আঁচ করতে পারি, ঝগড়ায় আর ভালবাসায় মাঝে মাঝে ওর যে কী অসহায় অবস্থা হয় আমি বেশ ঠাহর করতে পারি। বেচারা পেটার, ভালবাসা ওর একান্তভাবে দরকার।

যখন ও বলেছিল ওর কোনো বন্ধু চাই না, ওর কথাগুলো আমার কানে এত রূঢ় হয়ে বেজেছিল। ইস্, কী করে ও এমন ভুল বুঝল! ও যে জেনে বুঝে বলেছে আমার তা বিশ্বাস হয় না।

পেটার ওর নিঃসঙ্গতা, ওর লোক-দেখানো উদাসিনতা আর ওর বয়স্ক হাবভাব আঁকড়ে থাকে; কিন্তু ওটা ওর অভিনয় ছাড়া কিছু নয়, যাতে ওর আসল ভাব প্রকাশ হয়ে না পড়ে। বেচারা পেটার, আর কতদিন সে তার এই ভূমিকা চালিয়ে যেতে পারবে? এই অতিমানবিক প্রয়াস পরিনামে নিশ্চয়ই এক প্রচণ্ড বিস্ফোরণ হয়ে দেখা দেবে?

ইস্, পেটার, শুধু যদি আমার সাধ্য থাকত তোমাকে সাহায্য করার, শুধু যদি আমাকে তুমি দিতে। আমরা দুজনে মিলে তাড়িয়ে দিতে পারতাম তোমার একাকিত্ব এবং আমারও!

আমার মনে অনেক কিছু হয়, কিন্তু বেশি বলি না। ওকে দেখতে পেলে আমার সুখ হয় এবং যখন কাছে থাকি তখন যদি আকাশে রোদ হাসে। কাল আমি দারুণ উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলাম; যখন আমি মাথা ঘষছি, তখন পেটার আমাদের ঠিক পাশের ঘরেই বসে রয়েছে আমি জানতাম। আমি নিজেকে ধরে রাখতে পারিনি; ভেতরে ভেতরে নিজেকে আমার যত শান্ত সৌম্য বলে বোধ হয়, বাইরে ততই আমার দাপাদাপি বাড়ে।

কে প্রথম দেখতে পাবে, কে ভেদ করবে এই বর্ম? ভাগ্যিস, ফান ডানদের মেয়ে নয় ছেলে– যদি আমার বিপরীত বর্গের কেউ কপালে জুটে না যেত, তাহলে আমায় এই পাওয়া কখনই এত কষ্টসাধ্য, এত সুন্দর, এত ভালো জিনিস হতে পারত না।

তোমার আনা।

পুনশ্চ ঃ তুমি জানো, তোমার কাছে আমি কিছু লুকাই না। সুতরাং তোমাকে আমার বলা দরকার, আবার কখন ওর দেখা পাব সেই আশায় আমি বেঁচে থাকি। পেটারও যে সারাক্ষণ আমার জন্যে অপেক্ষা করে আছে– এটা জানতে আমার খুব সাধ যায়। যদি ওর দিক থেকে কুণ্ঠিত হয়ে এগোনোর সামান্য ভাব চোখে পড়ে, তখুনি আমি রোমাঞ্চিত হই। আমার বিশ্বাস, আমারই মতন পেটারের মধ্যেও অনেক কথা হাঁকুপাঁকু করে; ওর অপটু ভাবটাই আকৃষ্ট করে, ও সেটা ছাই জানে।

তোমার আনা।

মঙ্গলবার, ৭ মার্চ, ১৯৪৪

আদরের কিটি,

আমার ১৯৪২ সালের জীবনের কথা এখন ভাবলে সবটাই অলীক বলে মনে হয়। চার দেয়ালের মধ্যে জ্ঞানচক্ষু ফোটা এই আনা আর সেদিনকার সুখস্বর্গে থাকা আনা– এই দুয়ের মধ্যে বিস্তর ফারাক। সত্যি, সে ছিল এক স্বর্গীয় জীবন। যার মোড়ে মোড়ে ছেলে বন্ধু, যার প্রায় জন-বিশেক সুহৃদ আর চেনাজানা সমবয়সী, যে প্রায় প্রত্যেক শিক্ষকেরই প্রিয় পাত্র,

যে মা-মণি আর বাপির আদরে মাথা-খাওয়া মেয়ে, যার অফুরন্ত টফি-লজেঞ্চুস, হাত-খরচের পর্যাপ্ত টাকা– তার আর কী চাই?

তুমি নিশ্চয় ভেবে অবাক হবে কিভাবে আমি এতগুলো লোককে পটিয়েছিলাম। পেটার বলে 'আকর্ষণীয় শক্তি'– কথাটা ঠিক নয় আমার চোখা উত্তর, আমার সরস মন্তব্য, আমার হাসি-হাসি মুখ এবং আমার সপ্রশ্ন চাহনি সব শিক্ষকেরই মনে ধরত। থাকার মধ্যে আমার ছিল প্রচণ্ড ধিঙ্গিপনা, মক্ষীরানীমার্কা ভাব আর মজা করার ক্ষমতা। সুনজরে পড়ার কারণ ছিল এই যে, আমি দু-একটা ব্যাপারে আর সবাইকে টেক্কা দিতাম। আমি ছিলাম পরিশ্রমী, সৎ এবং অকপট। পরের দেখে নকল করার কথা আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারতাম না। আমার টফি-লজেঞ্চুস আমি মুক্ত হস্তে একে ওকে দিতাম এবং আমার মধ্যে কোনো গুমর ছিল না।

সবাই মিলে এভাবে মাথায় তোলায় আমার কি পায়াভারী হওয়ার ভয় ছিল না? এটা ভালো হয়েছে যে,এই রমরমা যখন তুঙ্গে, ঠিক তখনই হঠাৎ আমাকে বাস্তবের মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়তে হল। বাহবা কুড়োবার দিন যে শেষ, এটা বুঝতেই অন্তত একটা বছর গড়িয়ে গেল।

ইস্কুলে আমি কেমন ছিলাম? লোকের চোখে আমি ছিলাম এমন একজন যার মাথা থেকে বেরোয় নিত্যনতুন রঙ্গরস, যে সব সময় 'গড়ের রাজা', কক্ষনো যার মেজাজ খারাপ হয় না, যে কখনই ছিঁচকাঁদুনে নয়। সুতরাং সবাই চাইত সাইকেলে রাস্তায় আমার সঙ্গী হতে এবং আমি তাদের মনোযোগ আকর্ষণ করতাম।

আজ যখন পেছনে চাই মনে হয় সেদিনের আনা আমুদে ছিল বটে, কিন্তু বড়ই হালকা স্বভাবের– আজকের আনার সঙ্গে তার কোনই মিল নেই। পেটার আমার সম্পর্কে ঠিক কথাই বলেছিল– 'তোমাকে যখনই দেখেছি, দুটি কি তারও বেশি ছেলে এবং রাজ্যের মেয়ে তোমাকে সব সময় ঘিরে রয়েছে। সব সময়ই তুমি হো হো করে হাসছ এবং যা কিছু ব্যাপার সবই তোমাকে ঘিরে!'

আজ কোথায় সে মেয়ে? ঘাবড়িও না হে, কেমন করে হো হো করে হাসতে হয়, কথার পিঠে কিভাবে কথা বলতে হয়– কিছুই আমি ভুলিনি। মানুষের খুঁত কাড়তে তখনকার চেয়েও হয়ত এখন আমি আরও ভালো পারি; এখনও মক্ষিরানী সাজতে পারি... যদি ইচ্ছে করি। তার মানে এই নয় যে একটা সন্ধ্যে, কয়েকটা দিন, কিংবা এমন কি একটি সপ্তাহের জন্যেও আমি ফিরে পেতে চাই তেমন একটা জীবন– বাইরে থেকে যা খুব ভারমুক্ত আর মজাদার বলে মনে হয়। কিন্তু সপ্তাহটিও শেষ হবে আর আমিও একেবারে নেতিয়ে পড়ব; তখন যদি এমন কোনো জিনিস নিয়ে কেউ কিছু বলতে শুরু করে যার মানে হয়, তাহলে আমি কৃতজ্ঞচিত্তে তা কানে তুলব। আমি চেলাচামুণ্ডা চাই না; আমি চাই বন্ধু, চাই গুণগ্রাহী– যারা কাউকে ভালবাসবে তার খোসামুদে হাসির জন্যে নয়, তার কৃত কাজ এবং তার চরিত্রের জন্যে।

চারপাশে বন্ধুর ভিড় অনেক পাতলা হয়ে আসবে আমি তা বিলক্ষণ জানি। কিন্তু তাতে কি আসে যায় যদি গুটিকয় সাচ্চা বন্ধু থাকে?

তবু সবকিছু সত্ত্বেও ১৯৪২ সালে মনে আমার ষোলআনা সুখ ছিল না; প্রায়ই নিজেকে পরিত্যক্ত বলে মনে হত; কিন্তু সারা দিনমান পায়ের ওপর থাকতে হত বলে ও নিয়ে বড় একটা ভাবতাম না এবং যতটা পারি হেসে খেলে কাটিয়ে দিতাম। যে শূন্যতা বোধ করতাম, রঙ্গরসিকতা দিয়ে আমি সজ্ঞানে বা অজ্ঞানে তা উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করতাম। জীবন সম্পর্কে

এবং আমাকে কী করতে হবে সে বিষয়ে এখন আমি গালে হাত দিয়ে ভাবি। আমার জীবনের একটি পর্ব বরাবরের মতো শেষ হয়ে গেছে। ইস্কুল-জীবনের গায়ে ফুঁ দিয়ে বেড়ানো দিনগুলো বিদায় নিয়েছে, আর কখনই ফিরবে না।

এখন আর আমি মনে মনে তার জন্যে হতাশ হই না; আমি সে স্তর পেরিয়ে এসেছি; আমার গুরুতর দিকটা সর্বক্ষণ বজায় থাকে বলে শুধুমাত্র নিজের আমোদ-আহ্লাদ নিয়ে মজে থাকতে পারি না।

যেন একটা জোরালো আতস কাঁচ দিয়ে নববর্ষ পর্যন্ত আমি আমার জীবনটা দেখি। নিজেদের বাড়িতে হাসি আনন্দে ভরা দিন, তারপর ১৯৪২ সালে এখানে চলে আসা, হঠাৎ কোথা থেকে কোথায়, চুলোচুলি, মন কষাকষি। ব্যাপারটা আমার মাথায় ঢোকেনি, আমি কেমন যেন থ' হয়ে গিয়েছিলাম, নিজেকে কিছুটা খাড়া রাখার জন্যে ছ্যাঁটা হওয়াকেই একমাত্র পন্থা হিসেবে নিয়েছিলাম।

১৯৪৩-এর প্রথমার্ধ— মাঝে মাঝে কান্নায় ভেঙে পড়া, নিঃসঙ্গতা, আস্তে আস্তে নিজের সমস্ত দোষত্রুটি আমার চোখে ধরা পড়তে লাগল; কোনাটাই ছোটখাটো নয়, তখন যেন আরও বড় বলে মনে হল। দিনের বেলায় ইচ্ছাকৃতভাবে আমার ধারণাবহির্ভূত যাবতীয় বিষয়ে আমি কথা বলতাম, চেষ্টা করতাম পিম্‌কে টানতে; কিন্তু পারতাম না। আমাকে একা ঘাড়ে নিতে হত নিজেকে বদলানোর কঠিন কাজ, ঠেকাতে হত নিত্যকার সেই সব গালমন্দ, যা বুকের ওপর জগদ্দল পাথরের মতো চেপে বসত; ফলে, হতাশার মধ্যে আমি একেবারে ডুবে গিয়েছিলাম।

বছরের শেষার্ধে অবস্থার সামান্য উন্নতি হল; আমি পরিণত হলাম তরুণীতে এবং আমাকে অনেক বেশি সাবালিকা বলে ধরে নেওয়া হল। আমি চিন্তা করতে এবং গল্প লিখতে শুরু করে দিলাম; ক্রমশ এই সিদ্ধান্তে পৌঁছুলাম যে, আমাকে বরাবরের বলের মত যথেচ্ছ ছোঁড়ার অধিকার আর অন্যদের নেই। আমি আমার আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী নিজেকে বদলাতে চাইলাম। যখন এটা বুঝলাম যে, এমন কি বাপির কাছেও আমার মনের সব কথা খুলে বলা যাবে না— তখন সেই একটা জিনিসে আমার খুব খারাপ লেগেছিল। এরপর নিজেকে ছাড়া আর কাউকে আমি বিশ্বাস করতে চাইনি।

নববর্ষের সূচনায় দ্বিতীয় বড় রকমের বদল, আমার স্বপ্ন...। এবং সেই সঙ্গে ধরা পড়ল আমার তীব্র বাসনা, কোনো মেয়েবন্ধুর জন্যে নয়, ছেলেবন্ধুর জন্যে। আমি আবিষ্কার করলাম আমার অন্তর্নিহিত সুখ আর সেইসঙ্গে বাহার চালি দিয়ে গড়া আমার আত্মরক্ষার বর্ম। যথাসময়ে আমার অস্থিরতার অবসান হল এবং যা কিছু সুন্দর, যা কিছু শুভ— তার জন্যে আমার সীমাহীন কামনা আমি অবিষ্কার করলাম।

আর সন্ধ্যে হলে বিছানায় শুয়ে শুয়ে এই বলে আমি যখন আমার প্রার্থনা শেষ করি, 'যা কিছু ভালো, যা কিছু প্রিয়, যা কিছু সন্দুর— সেই সবকিছুর জন্যে, হে ঈশ্বর, আমার কৃতজ্ঞতা জেনো', তখন আমি আনন্দে ভরে উঠি। তারপর অজ্ঞাতবাসে যাওয়ার 'সুফল', আমার শরীর স্বাস্থ্য নিয়ে ভাবতে বসি, আমার সমস্ত সত্তা দিয়ে ভাবি পেটারের 'মধুরতা'র কথা; ভাবি সেই জিনিস— যা এখনও অপরিণত এবং ভাসা-ভাসা হয়ে আছে, দুজনের কেউই যাকে সাহস করে আমরা ধরতে ছুঁতে পারি না, যা কোনো একদিন আসবে; প্রেম, ভবিষ্যৎ, সুখশান্তি আর ভূলোকস্থিত সৌন্দর্যের কথা; ভূলোক, নিসর্গ, সৌন্দর্য আর যা অপরূপ, যা রমণীয়, সব কিছু।

যাবতীয় দুঃখ কষ্ট কিছুই তখন আমার মনে স্থান পায় না; বরং আজও যে সৌন্দর্য রয়ে গেছে তাই নিয়ে আমি ভাবি। যে-সব বিষয়ে মা-মণির সঙ্গে আমার সম্পূর্ণ অমিল, এটা হল তার একটি। কেউ বিমর্ষ বোধ করলে মা-মনি তাকে উপদেশ দেন– 'দুনিয়ার যাবতীয় দুঃখকষ্টের কথা মনে করো এবং তোমাকে যে তার ভাগ নিতে হচ্ছে না তার জন্যে ধন্যবাদ দাও।' আমার উপদেশ– 'বাইরে বেরোও, মাঠে যাও, উপভোগ করো প্রকৃতি আর রোদ্দুর, ঘরের বাইরে গিয়ে আবার ফিরিয়ে আনো যে সুখ তোমার আপনাতে আর ঈশ্বরে। নিজের চারপাশে যতটা সৌন্দর্য এখনও আছে তার চিন্তা করো। তুমি সুখী হও।'

মা-মণির ধারণা ঠিক বলে আমার মনে হয় না, কারণ নিজে দুর্দশায় পড়লে সেক্ষেত্রে তোমার কী আচরণ হবে? তখন তো তুমি একেবারেই ডুবেছ। অন্যদিকে, আমি দেখেছি– নিসর্গে, রোদের আলোয়, স্বাধীনতায়, নিজের সবসময় কিছু সৌন্দর্য থেকেই যায়; এসব তোমার সহায়সম্বল হতে পারে। চোখ চেয়ে এইসব দেখ, তাহলেই তুমি আবার খুঁজে পাবে তোমার আপনাকে, আর ঈশ্বরকে এবং তখন তুমি আবার ফিরে পাবে তোমার মানসিক স্থৈর্য।

যে নিজে সুখী, সে অন্যদেরও সুখী করবে। যার সাহস আর বিশ্বাস আছে সে কখনও দুঃখকষ্টে মারা পড়বে না।

তোমার আনা।

রবিবার, ১২ মার্চ, ১৯৪৪

আদরের কিটি,

ইদানীং যেন স্থির হয়ে বসতে পারছি না। তড়বড় করে সিঁড়ি ভেঙে কেবল উঠছি আর নামছি। পেটারের সঙ্গে কথা বলতে খুব ভাল লাগে, তবে ওকে পাছে জ্বালাতন করি আমার সারাক্ষণ সেই ভয়। ওর মা-বাবা আর ওর নিজের সম্বন্ধে পুরনো কথা একটুখানি বলেছে। পুরো অর্ধেকও নয়; বুঝতে পারি না কেন সব সময় আরও কথা শোনবার জন্যে আমি মরে যাই। আগে ও আমাকে অসহ্য বলে মনে করত; ওর সম্বন্ধে আমিও ওকে একই কথা বলেছিলাম। এখন আমি আমার মত বদলেছি; পেটারও কি বদলেছে তার মত?

আমার মনে হয় বদলেছে; তার মানে অবশ্যই এ নয় যে, আমরা হলায়-গলায় বন্ধু হয়ে উঠব, যদিও আমার দিক থেকে তাতে এখানে দিনগুলো ঢের সহনীয় হবে। কিন্তু তবু ও নিয়ে নিজেকে আমি বিচলিত হতে দেব না– ওর সঙ্গে আমার ঘন ঘন দেখা হয় এবং আমার অসম্ভব কষ্ট হয়, শুধু সেই কারণেই এ নিয়ে, কিটি, তোমার মন খারাপ করাতে আমি চাই না।'

শনিবার দুপুরের পর গুচ্ছের খারাপ খবর শুনে এমন আনচান লাগছিল যে, আমি গিয়ে সটান শুয়ে পড়েছিলাম। শুধু মনটাকেও ফাঁকা করে দেবার জন্যে আমি চাইছিলাম ঘুমিয়ে পড়তে। চারটে অবধি ঘুমিয়ে তারপর বসবার ঘরে যেতে হল। মা-মণি এত কিছু জিজ্ঞেস করছেন যার উত্তর দেওয়া শক্ত, বাপির কাছে আমার লম্বা ঘুমের ব্যাখ্যা হিসেবে আমাকে একটা অজুহাত খাড়া করতে হল। আমি কারণ দেখালাম 'মাথাব্যথা'; কথাটা মিথ্যে নয়, যেহেতু ব্যথা ছিল...তবে সেটা ভেতরকার।

সাধারণ লোকে, সাধারণ মেয়েরা, আমার মতো কুড়ির নিচে যাদের বয়স, তারা ভাববে আত্ম-দুঃখকাতরতায় আমি খানিকটা ভেঙে পড়েছি। হ্যাঁ, সেটা ঘটেছে, কিন্তু আমার হৃদয়

মেলে ধরব আমি তোমার কাছে; দিনের বাদবাকি সময়টাতে আমি যথাসম্ভব চ্যাটা ফুর্তিবাজ এবং ডাকাবুকো হয়ে পড়ি– যাতে কেউ প্রশ্ন করতে বা পেছনে কাঠি দিতে না পারে।

মারগট মেয়েটা মিষ্টি, ও চায় আমি ওকে বিশ্বাস করি, কিন্তু তবু ওকে আমার সব কথা বলা সম্ভব নয়। সুন্দর ভালো মেয়ে সে, খুবই প্রিয়জন– কিন্তু গভীর আলোচনায় যেতে গেলে যে নিস্পৃহ ভাবের দরকার, সেটা তার নেই। মারগট আমার কথায় গুরুত্ব দেয়, যতটা দরকার তার চেয়েও বেশি; পরে অনেকক্ষণ ধরে সে তার অদ্ভুত ছোট বোনটির কথা ভাবে। আমার প্রত্যেকটি কথায় তন্ন তন্ন করে ও আমাকে দেখে আর ভাবতে থাকে, 'এটা কি ওর নেহাত পরিহাস, না কি সত্যিই ওর মনের কথা?' আমার ধারণা, এটা হয় আমরা সারাদিন একসঙ্গে থাকি বলে; কাউকে যদি আমি সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাস করতাম, তাহলে আমি কখনই চাইতাম না তেমন লোক সর্বক্ষণ আমার সঙ্গে ঘুরঘুর করুক। কবে আমি শেষ পর্যন্ত আমার চিন্তার জট খুলে ফেলব, কবে নিজের মধ্যে আবার আমি শান্তি খুঁজে পাব?

তোমার আনা।

মঙ্গলবার, ১৪ মার্চ, ১৯৪৪

আদরের কিটি,

আমরা আজ কী খাব সেটা শুনতে তোমার হয়ত মজা লাগবে, কিন্তু আমার আদৌ নয়। নিচের তলায় ঝি এসে ঘর ঝাঁট দিচ্ছে। এই মুহূর্তে আমি বসে আছি ফান ডানদের টেবিলে। একটা রুমালে ভালো সেন্ট (এখানে আসার আগে কেনা) ঢেলে নিয়ে মুখের ওপর দিয়ে নাকের কাছে ধরে রেখেছি। এ থেকে তুমি বিশেষ কিছু অনুধাবন করতে পারবে না। সুতরাং 'গোড়া থেকে শুরু করা যাক'।

যেসব লোকের কাছ থেকে আমরা খাবার জিনিসের কুপন সংগ্রহ করতাম, তারা ধরা পড়ে গেছে। এখন আমাদের হাতে আছে মাত্র পাঁচটি রেশন কার্ড; বাড়তি কোনো কুপন নেই, চর্বি নেই। মিপ্ আর কুপহুইস দুজনেই অসুস্থ; এলির বাজার করবার মতো সময় নেই। ফলে খুব বিষণ্ন, মন-মরা আবহাওয়া; খাবারও তদ্রূপ। কাল থেকে চর্বি, মাখন বা মারগারিন এক ছিটেও থাকবে না। প্রাতরাশে আলুভাজা (রুটি বাঁচাতে) আর জুটবে না, তার বদলে খেতে হবে ডালিয়া; যেহেতু মিসেস ফান ডানের ধারণা আমরা না খেয়ে আছি, সেইজন্যে লুকিয়ে-চুরিয়ে কিনে আনা হয়েছে মাখন-না-তোলা দুধ। পিপের মধ্যে সংরক্ষিত বাঁধাকপি কুচনো– এই হল আজ আমাদের রাতের খাবার। আগে থেকে ঠেকানোর জন্যেই রুমালের প্রতিষেধক ব্যবস্থা। এক বছরের বাসী বাঁধাকপি যে কী গন্ধ ছাড়ে ভাবা যায় না। নষ্ট আলুবখরা, সংরক্ষণের কড়া ওষুধ আর পচা ডিম– এই সব মিলিয়ে মিশিয়ে ঘরের মধ্যে ভুরভুর কচ্ছে কটু গন্ধ। উহ্, ঐ গন্ধওয়ালা জিনিসটা খেতে হবে ভাবলেই তো আমার পেট থেকে সবকিছু উঠে আসতে চাইছে। এর ওপর, আলুগুলোকে অদ্ভুত সব রোগে ধরেছে। দুই ঝুড়ির মধ্যে পুরো এক ঝুড়ি উনুনের আগুনে ফেলে দিতে হয়েছে। কোনটার কী রোগ হয়েছে দেখা, সেও হয়েছে একটা মজার ব্যাপার। শেষটায় দেখা গেল, ক্যানসার আর বসন্ত থেকে হাম পর্যন্ত, কিচ্ছু বাকি নেই। যুদ্ধের চতুর্থ বছরে অজ্ঞাতবাসে থাকা, না গো না, হাসির কথা নয়। এই জঘন্য ব্যাপারটা কেন যে শেষ হয় না।

সত্যি কথা বলতে গেলে, খাওয়ার ব্যাপারটা আমি কেয়ারই করতাম না। যদি অন্যান্য দিক দিয়ে এ জায়গাটা আরেকটু সুখকর হত। সেখানেই তো গণ্ডগোল; থোড়-বড়ি-খাড়া

আর খাড়া-বড়ি-থোড় করে এইভাবে বেঁচে থাকার ফলে আমাদের সবাই মেজাজ ক্রমশ তিরিক্ষে হয়ে যাচ্ছে।

বর্তমান অবস্থায় পাঁচজন প্রাপ্তবয়স্কের মনোভাব এখন এই–

মিসেস ফান ডান– 'রান্নাঘরের রানী হওয়ার মোহ অনেকদিন আগেই কেটে গেছে। কাঁহাতক চুপচাপ বসে থাকা যায়। সুতরাং আবার আমি রান্নার কাজে ফিরে গিয়েছি। তবু না বলে পারছি না যে, বিনা তেল-ঘিতে রান্না করা কিছুতেই সম্ভব নয়; আর এইসব জঘন্য গন্ধ নাকে গিয়ে আমার শরীর খারাপ করে। এত খাটি, কিন্তু তার বদলে আমার কপালে জোটে অকৃতজ্ঞতা আর কটু কথা। সবসময় আমিই এ বাড়ির কুলাঙ্গার, যত দোষ নন্দ ঘোষ। তাছাড়া আমার মতে, লড়াই খানিকটা যথা পূর্বং তথা পরং। তাও শেষমেষ জার্মানরাই জিতবে। আমার ভয় হচ্ছে, আমাদের না খেয়ে থাকতে হবে। যখন আমার মেজাজ খারাপ হয়, একধার থেকে সবাইকে আমি বকি।'

মিস্টার ফান ডান– 'ধোঁয়া টেনে যাব, ধোঁয়া টেনে যাব, ধোঁয়া টেনে যাব, তারপর খাওয়া, রাজনৈতিক হালচাল, আর কের্লির মেজাজটা তত খারপ নয়। কের্লি বড় আদরের বউ।'

কিন্তু ধূমপানের জিনিস কিছু না জুটলে, তখন সবই বেঠিক, এবং তখন শোনা যাবে– 'আমি দিন দিন কাহিল হয়ে পড়ছি, আমরা তেমন ভালোভাবে থাকতে পারছি না। মাংস ছাড়া আমার চলবে না। আমার স্ত্রী কের্লি আহাম্মকের একশেষ।' এরপর শুরু হয়ে যাবে দুজনের তুমুল ঝগড়া।

মিসেস ফ্রাঙ্ক– 'খাওয়াটা অতি জরুরি নয়, যার প্রচণ্ড ক্ষিধে পেয়েছে, এই সময় এক টুকরো বাইরের রুটি পেলে খাসা হয়। আমি ফান ডানের বউ হলে ওর ঐ সারাক্ষণ ভস্ ভস্ করে ধোঁয়া বের করা অনেককাল আগেই বন্ধ করে দিতাম। নিজেকে একটু চাঙ্গা করার জন্যে আমার কিন্তু এখন একটা সিগারেট বিশেষ দরকার। ইংরেজরা দাগাগুচ্ছের ভুল করা সত্ত্বেও লড়াই এগোচ্ছে। আমার দরকার, বসে একটু কথাবার্তা বলা; আমি যে পোল্যাণ্ডে নেই, তার জন্যে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ।'

মিস্টার ফ্রাঙ্ক– 'সব ঠিক আছে। আমার কিছু চাই না। ঘাবড়ানোর কোন কারণ নেই; আমাদের হাতে যথেষ্ট সময়। আমার ভাগের আলু পেলেই আমার মুখ বন্ধ হবে। আমার রেশন থেকে কিছুটা এলির জন্যে সরিয়ে রাখো। রাজনৈতিক অবস্থা খুবই সম্ভাবনাময়। আমি হলাম একান্তভাবে আশাবাদী।'

মিস্টার ডুসেল– 'আমাকে আজকের কাজ হাতে নিতে হবে, সব কাজ ঘড়ি ধরে শেষ করতে হবে। রাজনৈতিক অবস্থার দরুন, আমাদের ধরা পড়া অসম্ভব।'

'আমি, আমি, আমি...!'

তোমার আনা।

বুধবার, ১৫ মার্চ, ১৯৪৪

আদরের কিটি,

বাপ্ রে বাপ্, বুক-চাপা দৃশ্যগুলো থেকে মুহূর্তের জন্যে ছাড়ান পেয়েছি। আজ শুধু কানে এসেছে– 'এই বা ঐ যদি ঘটে, তাহলে আমাদের মুশকিলে পড়তে হবে...যদি ইনি বা উনি অসুখে পড়েন, তাহলে আমরা একদম একা পড়ে যাব; এবং তখন যদি... ।' সংক্ষেপে এই।

বাকি কথাগুলো কী আশা করি তুমি জানো– অন্তত এটা আমি ধরে নিতে পারি, 'গুপ্ত মহলবাসী'দের এতদিনে তুমি এত ভালোভাবে জেনেছ যে, তাদের কথাবার্তার ধারাটা তুমি আঁচ করে নিতে পারবে।

এক যদি– যদির কারণ হল, মিস্টার ক্রালারকে মাটি খোঁড়ার জন্যে তলব করা হয়েছে। এলির প্রচণ্ড সর্দি, কাল বোধ হয় এলিকে বাড়িতেই থাকতে হবে। মিপ্ এখনও ফ্লু থেকে সম্পূর্ণ সেরে ওঠেনি; কুপহুইসের পাকস্থলী থেকে এমন রক্তস্রাব হয় যে, উনি অজ্ঞান হয়ে যান। শুনে এত মন খারাপ লাগল।

মালখানায় যারা কাজ করে, কাল তাদের ছুটি; এলিকে আসতে হবে না। কাজেই কাল আর দরজার তালা খোলা হবে না; ইঁদুরের মতো নিঃশব্দে আমাদের চলাফেরা করতে হবে, যাতে পাড়াপড়শিরা না টের পায়। হেংক্ একটায় আসছেন পরিত্যক্ত মানুষগুলোকে দেখতে– তাঁর যেন চিড়িয়াখানা-পালকের ভূমিকা। আজ বিকেলে কত যুগ পরে তিনি এই প্রথম আমাদের কিছুটা বাইরের দুনিয়ার কথা বললেন। আমরা আটটি প্রাণী যেভাবে তাঁকে ঘিরে ধরেছিলাম যদি তুমি দেখতে; ছবিতে যেরকম ঠান্‌দিদি গল্প বলেন সেই রকম। কৃতজ্ঞ শ্রোতাদের কাছে অবশ্য তাঁর ডজনে উনিশটাই ছিল খাবার-দাবারের কথা, এবং তারপর মিপের ডাক্তার, আর আমাদের সবরকম প্রশ্নের উত্তর। উনি বললেন, 'ডাক্তার? ডাক্তারের কথা আর বলবেন না। আজ সকালে ডাক্তারকে ফোন করতে ওঁর অ্যাসিস্টেন্ট এসে ধরলেন। ফ্লুর জন্যে কী ওষুধ খাব জিজ্ঞেস করলাম। আমাকে বলা হল সকাল আটটা থেকে নটার মধ্যে গিয়ে আমি যেন ব্যবস্থাপত্র নিয়ে আসি। যদি একটু বাড়াবাড়ি রকমের ফ্লু হয়, তাহলে ডাক্তার নিজে এসে ফোন ধরে বলেন, জিভ বের করুন তো, বলুন আ-আ-আ, ঠিক আছে। আমি শুনেই বুঝতে পারছি আপনার গলাটা টাটিয়ে উঠেছে। আমি ওষুধ লিখে দিচ্ছি দোকান থেকে আনিয়ে নেবেন। আচ্ছা, আসি। ব্যস্, হয়ে গেল।' মজার প্র্যাকটিস তো, টেলিফোনেই কাজ ফতে।

আমি কিন্তু ডাক্তারদের নিন্দেমন্দ করতে চাই না; যত যাই হোক, তার তো দুটোর বেশি হাত নেই এবং আজকের দিনে ডাক্তার কয়টা যে এত রুগীকে সামাল দেবে। তবু হেংক্-এর মুখে টেলিফোন-ভাষ্যের পুনরাবৃত্তি শুনে আমরা না হেসে পারিনি।

এখনকার দিনে ডাক্তারের বসার ঘরে ছবি আমি মনে মনে কল্পনা করে নিতে পারি। এখন আর কেউ তালিকাভুক্ত রুগিদের দিকে তাকায় না; যাদের ছোটখাটো অসুখ, তাদের দঙ্গলের দিকে তাকায় আর ভাবে– 'ওহে, তুমি ওখানে কী করছ, দয়া করে পেছন গিয়ে দাঁড়াও; জরুরি কেসগুলো আগে দেখা হবে।'

তোমার আনা।

বৃহস্পতিবার, ১৬ মার্চ, ১৯৪৪

আদরের কিটি,

আজকের আবহাওয়াটা কী সুন্দর, আমার বর্ণনার ভাষা নেই; ছাদের ঘরে আমি এলাম বলে।

পেটারের চেয়ে কেন আমি বেশি ছটফটে, এখন সেটা বুঝি। পেটারের নিজের ঘর আছে সেখানে কাজ করা, স্বপ্ন দেখা, ভাবনা-চিন্তা করা, ঘুমুনো– সবই সে করতে পারে। আমাকে ঝাঁটা খেয়ে একবার এ-কোণ একবার ও-কোণ করতে হয়। আমার ডবল-বেড ঘরে আমি থাকি না বললেই হয়, অথচ থাকতে ভীষণ ইচ্ছে করে। সেই কারণেই আমি বার বার

পালিয়ে চিলেকেঠোয় চলে যাই। সেখানে এবং তোমার কাছে, আমি কিছুক্ষণের জন্যে, খুবই কিছুক্ষণের জন্যে, নিজেকে ফিরে পাই। তবু আমি নিজেকে নিয়ে বুক চাপড়াতে চাই না, বরং উল্টো বুকের পাটা দেখাতে চাই। ভালো হয়েছে, অন্যেরা আমার মনের ভেতরে কী হয় বলতে পারে না– শুধু জানে, দিনকে দিন আমি মা-মণি সম্পর্কে নিস্পৃহ হয়ে পড়ছি, বাপির প্রতি আমার আর আগের মতো টান নেই এবং মারগটকে আমি কোনো কথাই আর বলি না। আমি এখন একেবারে চাপা। সবচেয়ে বড় কথা আমি আমার বাইরের গাম্ভীর্য বজায় রাখব, লোকে যাতে কিছুতেই না জানে যে, আমার মধ্যে নিরন্তর লড়াই চলেছে। কামনা-বাসনার সঙ্গে সহজ বাস্তববোধের লড়াই। পরেরটা এ যাবৎ জিতে এসেছে; তবু এই দুইয়ের মধ্যে আগেরটা কি কখন প্রবলতর হয়ে দেখা দেবে? দেখা দেবে বলে মাঝে মাঝে আমার ভয় হয় এবং কখনও কখনও আমি তারই জন্যে ব্যাকুল হই।

পেটারকে না বলে থাকা, এটা যে কী সাংঘাতিক কঠিন কাজ কী বলব! তবে আমি জানি, আমাকে প্রথম ওরই বলতে হবে। আমি কত কী যে বলতে আর করতে চাই! এর সবটাই আমার স্বপ্নে দেখা; যখন দেখি আরও একটা দিন চলে গেল, অথচ কিছুই ঘটল না তখন সহ্য করা শক্ত হয়। হ্যাঁ কিটি, আনা মেয়েটার মাথায় ছিট আছে। কিন্তু এক মতিচ্ছন্ন সময়ে বাস করছি এবং যে পরিবেশে, তার তো আরো মাথার ঠিক নেই।

তবু ভালো যে, আমার ভাবনা আর অনুভূতিগুলো আমি অন্তত লিখে রেখে দিতে পারি, সেটা না হলে তো আমার একেবারে দম বন্ধ হয়ে যেত। আমার জানতে ইচ্ছে করে এসব ব্যাপারে পেটারের কী মনে হয়। আমার খুব আশা আছে, একদিন এ নিয়ে ওর সঙ্গে কথা বলতে পারব। পেটার নিশ্চয়ই আমার সম্পর্কে কিছু এটা আঁচ করেছে, কেননা এতদিন সে যাকে জেনেছে সে হল বাইরের আনা– তাকে ওর পক্ষে ভালবাসা নিশ্চয়ই সম্ভব নয়।

যে শান্তিপ্রিয় এবং যে নিরিবিলিতে থাকা পছন্দ করে, তার পক্ষে আমার মতন হৈ-হল্লাবাজ মেয়েকে ভালো লাগা কি সম্ভব? সেই কি হবে প্রথম এবং অদ্বিতীয়, যে আমার বজ্রকঠিন বর্ম ভেদ করতে পারবে? এটা করতে তার কি দীর্ঘ সময় লাগবে? একটা পুরনো কথা চালু আছে না– প্রায়ই ভালবাসা আসে করুণা থেকে, কিংবা ভালবাসার হাত ধরে চলে করুণা? আমার বেলায়ও সেটা কি খাটে? কেননা প্রায়ই যেমন নিজের জন্যে, তেমনই ওর জন্যেও আমার দুঃখ হয়।

কী বলে শুরু করব, সত্যি বলছি, আমি ঠিক জানি না। আমি তো তাও ভালো, পেটারের তো মুখ দিয়ে কথাই সরে না– ও কি পারবে মুখ ফুটে বলতে? একমাত্র যদি লিখে ওকে জানাতে পারতাম, তাহলে অন্তত এটা জানি যে, ও আমার মনের কথা ধরতে পারবে, কারণ যা বলতে চাই সেটা ভাষায় প্রকাশ করা কী সাংঘাতিক কঠিন যে!

তোমার আনা।

শুক্রবার, ১৭ মার্চ, ১৯৪৪

আদরের কিটি,

'গুপ্ত মহল' হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছে। আদালতের হুকুমে ক্রালারের মাটি খোঁড়ার সাজা রদ হয়েছে। এলি ওর নাকটাকে বুঝিয়েছে সুজিয়েছে এবং খুব কড়কে দিয়েছে সে যেন এলিকে আজ ঝুটঝামেলায় না ফেলে। কাজেই আবার সব ঠিকঠাক হয়ে গেছে। ব্যতিক্রম বলতে শুধু এই যে, মা-বাবাকে নিয়ে আমি আর মারগট একটু নাকাল হয়ে পড়ছি। আমাকে ভুল

বুঝো না– তুমি জানো, ঠিক এই মুহূর্তে মা-মণির সঙ্গে আমি ঠিক মানিয়ে চলতে পারছি না। বাপিকে আমি আগের মতোই ভালবাসি এবং বাপি আর মা-মণি দুজনকেই ভালবাসে মারগট– কিন্তু যখন তুমি আর কচি খুকিটি নও, তখন তুমি চাইবে কিছু কিছু জিনিসে নিজের বিচার খাটাতে, কখনও কখনও চাইবে স্বাধীনভাবে চলতে।

ওপরে গেলে আমার কাছ থেকে জানতে চাওয়া হয় আমি সেখানে কী করতে যাচ্ছি, খেতে বসে লবণ নিতে পারব না, সন্ধ্যেবেলা রোজ সোয়া আটটা বাজলে অমনি মা-মণি জিজ্ঞেস করবেন এবার আমি জামাকাপড় ছাড়তে শুরু করব কিনা; আমি কোনো বই পড়লে সেটা উল্টেপাল্টে দেখে নেওয়া হবে। এটা স্বীকার করব যে, খুব একটা কড়াকড়ি করা হয় না; প্রায় সবকিছুই আমি পড়তে পারি। এ সত্ত্বেও সারাদিন ধরে যেভাবে ফোড়ন কাটা হয় আর জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় তাতে আমরা দুজনেই তিতিবিরক্ত।

অন্য একটা ব্যাপার, বিশেষত আমার ক্ষেত্রে, ওঁরা পছন্দ করছেন না। এখন আর গুচ্ছের চুমো দিতে আমার ভালো লাগে না এবং সখের ডাকনামগুলো ভীষণ বানানো-বানানো মনে হয়। মোদ্দা কথা, কিছুদিন ওঁদের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতে চাই। কাল সন্ধ্যেবেলা মারগট বলছিল, 'একবার জোরে নিঃশ্বাস পড়লে হয়, মাথায় হাত দিলে হয়– অমনই যেভাবে ওঁরা হাঁ-হাঁ করে উঠবেন মাথা ধরেছে কিনা কিংবা শরীর খারাপ হয়েছে কিনা– তাতে আমার মেজাজ খিঁচিয়ে যায়।'

নিজেদের বাড়িতে আগে আমাদের পারস্পরিক বিশ্বাস আর সম্প্রীতি ছিল, হঠাৎ যখন হুঁশ হল যেসব প্রায় উঠে গেছে– আমরা দুজনেই তাতে প্রচণ্ড ধাক্কা খেলাম। এর একটা বড় কারণ, এখানে আমরা হলাম 'কুচো'। তার মানে বাইরের বিচারে আমাদের মনে করা হয় ছেলেমানুষ; সেক্ষেত্রে সমবয়সী অন্য মেয়েদের চেয়ে আমাদের মন অনেক পরিণত।

যদিও আমার বয়স মোটে চোদ্দ, আমি দস্তুরমত জানি আমি কী চাই, আমি জানি কে ঠিক আর কে বেঠিক, আমার নিজস্ব মতামত আছে, আমার নিজের ভাবনাচিন্তা আর ন্যায়নীতি। বয়ঃসন্ধিতে এটা পাগলামির মতো শোনালেও আমি বলব– আমার অনুভূতিটা শিশুসুলভ নয়; বরং একজন ব্যক্তির; অন্যদের থেকে নিজেকে আমি রীতিমত পৃথক করে ভাবি। আমি জানি মা-মনির চেয়ে আমি নানা জিনিস ঢের ভালোভাবে আলোচনা করতে এবং যুক্তি দিয়ে বোঝাতে পারি, আমি জানি আগে থেকে আমার মন সিঁটিয়ে থাকে না, আমি অতটা তিলকে তাল করি না, আমি অনেক বেশি যথার্থ এবং চৌকস। সেইজন্যে– শুনে তুমি হাসতে পারো– বহু দিক দিয়ে মা-মণির চেয়ে নিজেকে আমি বড় মনে করি। কাউকে যদি ভালবাসতে হয়, সর্বাগ্রে তার সম্বন্ধে আমার চাই অনুরাগ আর শ্রদ্ধা। সব ঠিক হয়ে যেত যদি পেটারকে পেতাম, কেন না অনেক দিক দিয়ে আমি তার অনুরাগী। এত ভালো, এত সুদর্শন ছেলে।

তোমার আনা।

রবিবার, ১৯ মার্চ, ১৯৪৪

আদরের কিটি,

কাল আমার খুব সুদিন গেছে। আমি ঠিকই করে রেখেছিলাম পেটারের সঙ্গে খোলাখুলি কথা বলব। ও-বেলা খাওয়ার সময় ওকে ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করলাম, 'আজ সন্ধ্যেবেলা তোমার শর্টহ্যাণ্ড আছে?' ও বলল, 'না।' 'আমি তাহলে পরে আসব, এই একটু গল্প করতে।'

পেটার রাজী। থালাবাসন ধোয়া হয়ে গেলে আমি ওর মা-বাবার ঘরে ঢুকে জানলায় খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে চারপাশের অবস্থাটা দেখে নিলাম। তারাপর দেরি না করে পেটারের কাছে চলে গেলাম। খোলা জানলার বামদিকে পেটার দাঁড়িয়ে আছে দেখে আমি জানালার ডানদিকে দাঁড়িয়ে কথা শুরু করলাম। দেখলাম কড়া আলোর বদলে আধো-অন্ধকারে খোলা জানালার পাশে দাঁড়িয়ে অনেক সহজে কথা বলা যায়। আমার ধারণা, পেটারও সেই রকম অনুভব করেছিল।

দুজনে দুজনকে আমরা এত কিছু বলেছিলাম, এত অজস্র কথা, তার পুনরাবৃত্তি অসম্ভব; কিন্তু মন ভরে গিয়েছিল। 'গুপ্ত মহলে' জীবনের সে এক পরম রমণীয় সন্ধ্যা। আমাদের মধ্যে কী কথা হয়েছিল, সংক্ষেপে তোমাকে বলব। প্রথমে তুলেছিলাম ঝগড়াঝাঁটির কথা এবং বলেছিলাম কেন এখন আমি সেটা অন্য চোখে দেখি; তারপর বলেছিলাম বাপ-মাদের সঙ্গে আমাদের পার্থক্যের কথা।

মা-মণি আর বাপি, মারগট আর আমার প্রসঙ্গে ওকে বলেছিলাম।

একটা সময়ে ও জিজ্ঞেস করেছিল, 'আমার ধারণা, তোমরা প্রত্যেকে প্রত্যেককে একটি করে শুভরাত্রির চুমো খাও, তাই না?'

'একটি করে বলো কী, এক ডজন করে। তোমরা চুমো খাও না?'

'না, কাউকে আমি কখনও চুমো খাইনি বললেই হয়।'

'তোমার জন্মদিনেও নয়?'

'হ্যাঁ, তখন খেয়েছি।'

আমরা দুজনের কেউই আমাদের মা-বাবার কাছে আমাদের গোপন কথা বলি না; ওর মা-বাবার কাছে মন খুললে ওঁরা খুশিই হন, কিন্তু ওর কি রকম ইচ্ছে করে না– আমরা এই সব নিয়ে কথা বললাম। আমি কি রকম বিছানায় শুয়ে কেঁদে ভাসাই আর পেটার কি রকম মটকায় উঠে গিয়ে ঈশ্বরের নামে কসম খায়। মারগট আর আমি এই কিছুদিন হল পরস্পরকে ভালো করে জানছি, কিন্তু তাও আমরা কেউ কাউকে সব কথা কি রকম বলতে পারি না, তার কারণ আমরা সর্বক্ষণ একসঙ্গে থাকি। কল্পনীয় সব বিষয়েই দেখি– আমি ঠিক যা ভেবেছিলাম পেটার অবিকল তাই।

এরপর ১৯৪২ সাল নিয়ে কথা হল। আমরা তখন কত আলাদা ধরনের ছিলাম। আমরা যে সেই লোক, এখন আর তা মনেই হয় না। গোড়ায় আমরা দুজনে কেউ কাউকে মোটেই দেখতে পারতাম না। পেটার ভাবত আমি বড় বেশি কথা বলি এবং অবাধ্য; আর আমি দুদিনেই বুঝে গেলাম ওকে দেবার মতন আমার সময় নেই। তখন বুঝিনি কেন ও আমার সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করে না; কিন্তু এখন আমি খুশি। পেটার কতটা আমাদের সকলের কাছ থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছিল সেটারও সে উল্লেখ করল। আমি বললাম আমার হৈ-হল্লা আর ওর চুপ করে থাকার মধ্যে খুব একটা ফারাক ছিল না। আমি শান্ত চুপচাপ ভাবও পছন্দ করি এবং আমার ডায়রি ছাড়া আর কিছুই আমার একার নয়। পেটার খুব খুশি যে আমার মা-বাবার সন্তানেরাও এখানে আছে এবং পেটার এখানে থাকায় আমি খুশি। এখন বুঝেছি কেন ও কথা কম বলে এবং মা-বাবার সঙ্গে ওর কী সম্পর্ক। ওকে সাহায্য করতে পারলে আমার খুবই ভালো লাগবে। এইসব ছিল আমাদের কথার প্রসঙ্গ।

পেটার বলল, 'সব সময়ই তুমি আমাকে সাহায্য করো।' অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'কি রকম?' 'তোমার হাসিখুশি ভাব দিয়ে।' ওর এই কথাটা আমার সবচেয়ে মিষ্টি লেগেছে।

কী ভালো, কী ভালো! ও নিশ্চয় এতদিনে আমাকে বন্ধুর মতন ভালবাসতে পারছে; আমার পক্ষে আপাতত তাই যথেষ্ট। আমি যে কত কৃতজ্ঞ, কত সুখী কী বলব। তুমি যেন কিছু মনে করো না, কিটি– আজ আমি যেখানে যে কথা বসাচ্ছি তাতে লেখার ঠিক মান বজায় থাকছে না।

আমার মাথায় যখন যা এসেছে আমি ঠিক সেইটুকুই কলমের মুখে ধরে দিয়েছি। আমি এখন অনুভব করছি, পেটার আর আমি, আমার একটি রহস্যের অংশীদার। হাসিতে ফেটে-পড়া চোখে ও যদি চোরা চাহনিতে আমার দিকে তাকায় তাহলে সেটা হবে আমার বুকের মধ্যে খানিকটা দ্যুতি চলে যাওয়ার মতন। আমি আশা করি, এ জিনিস এই ভাবেই থেকে যাবে এবং মিলিতভাবে আমাদের দুজনের জীবনে এমন অসামান্য লগ্ন অনেক, অনেকবার দেখা দেবে।

তোমার আনা।

সোমবার, ২০ মার্চ, ১৯৪৪

আদরের কিটি,

আজ সকালে পেটার জিজ্ঞেস করেছিল আরেকদিন সন্ধ্যাবেলা আমি ওর কাছে যাব কিনা; বলেছিলাম আমি গেলে ওর কাজে কোনো ব্যাঘাত হবে কি না। বলেছিল, একজনের জায়গা হলে দুজনেরও ঠাঁই হবে। আমি বললাম, রোজ সন্ধ্যেয় আসতে পারব না, কেননা নিচের তলার ওঁরা সেটা পছন্দ করবেন না। পেটারের কথা হল, ও নিয়ে আমি যেন মাথা না ঘামাই। তখন আমি বললাম একটা শনিবার দেখে আমি স্বচ্ছন্দে সন্ধ্যেবেলা আসতে পারি; আমি ওকে বিশেষভাবে বলে দিলাম আকাশে চাঁদ থাকলে ও যেন আগে থেকে আমাকে হুঁশিয়ার করে দেয়। পেটার বলল, 'আমরা তখন নিচে চলে গিয়ে সেখান থেকে চাঁদ দেখব।'

ইতিমধ্যে আমার সুখে একটা ছোট কাঁটা বিঁধেছে। আমি বহুদিন ভেবেছি মারগটেরও পেটারকে খুব ভালো লাগে। ওকে সে কতটা ভালবাসে জানি না, তবে আমার মনে হয় তেমন কিছু নয়। পেটার আর আমি যখনই একত্র হই, ওর বুকে নিশ্চয় খুব বাজে। এর মধ্যে হাস্যকর ব্যাপার হল এই যে, ও সেটা প্রায়ই চেপে রাখে।

আমি হলে, এটা ঠিক, হিংসেয় মরে যেতাম, কিন্তু মারগট শুধু বলে আমার ওকে করুণা করার কোনো প্রয়োজন নেই।

আরও বললাম, 'মাঝে থেকে তুমি বাদ পড়ে গেলে, এটা ভেবে খুব খারাপ লাগছে।' খানিকটা তিক্ততার সঙ্গে মারগট বলল, 'ওতে আমি অভ্যস্ত।'

এখনও এই কথা পেটারকে বলতে আমার সাহস হয় না, হয়ত পরে বলব। তবে তার আগে বিস্তর জিনিস নিয়ে দুজনে কথা বলতে হবে।

কাল সন্ধ্যেবেলা মা-মনি উচিত মতই আমাকে কিছুটা ভেঁটেছেন; ওঁর প্রতি উদাসীনতা দেখাতে দিয়ে আমার অতটা বাড়াবাড়ি করা ঠিক নয়। আমাকে আবার ভাঙা ভাব জোড়া লাগাবার চেষ্টা করতে হবে এবং যখন যা মনে হবে ফট করে তা বলা চলবে না।

এমন কি পিমও ইদানীং আর আগের মতো নেই। আমি কচি খুকি নই– আমার প্রতি উনি ব্যবহার করছেন সেইমত। ফলে, ওঁর মধ্যে একটা ছাড়া-ছাড়া ভাব। কোথাকার পানি কোথায় গড়ায় দেখা যাক।

অনেক হয়েছে, আজ এখানেই ইতি টানি। আমার মধ্যে কানায় কানায় ভরে আছে

পেটার। ওর দিকে চেয়ে থাকা ছাড়া আর কিছুই করতে পারছি না।

মারগট কত ভালো, নিচে তার সাক্ষ্যপ্রমাণ; চিঠিটা আজকেই পেয়েছি–

২০ মার্চ, ১৯৪৪

আনা, কাল যখন বলেছিলাম তোকে ঈর্ষা করি না, তা শতকরা পঞ্চাশ ভাগ ছিল সত্যিকার মনের কথা। ব্যাপারটা এই রকম– তুই বা পেটার, কাউকেই আমি ঈর্ষা করি না। আমি এমন কাউকে এখনও পাইনি, আপাতত পাওয়ার কোনো সম্ভাবনাও নেই, যার কাছে আমি আমার ভাবনা আর আবেগ-অনুভূতিগুলো মেলে ধরতে পারি– সেইটুকুই যা আমার দুঃখ। কিন্তু তার জন্যে তোর প্রতি আমার কোনো ক্ষোভ নেই। অন্যেরা যা না চাইতেই পায়, এখানে তেমন কত কিছু থেকেই তো আমরা বঞ্চিত হচ্ছি।

অন্যদিকে, আমি জানি আমার সঙ্গে পেটারের ভাব কখনই অতদূর এগুতো না; কারণ, আমার কেন যেন মনে হয়, কারো সঙ্গে অনেক কিছু নিয়ে আলোচনা করতে চাইলে আমি আশা করব সে আমার খুব কাছের মানুষ হবে। আমি যেন টের পাই যে, আমি অনেক না বললেও সে যেন আমাকে পরিপূর্ণভাবে বুঝতে পারে। কিন্তু তার জন্যে, তাকে হতে হবে এমন একজন, আমি বুঝব, যে বুদ্ধিবৃত্তিতে আমার চেয়ে বড়; পেটারের বেলায় সেটা খাটে না। কিন্তু তোর আর পেটারের সম্পর্কে সেটা খাপ খায় বলে আমি মনে করি।

এমন নয় যে, আমার প্রাপ্য জিনিস থেকে আমাকে তুই বঞ্চিত করেছিস; আমার কথা ভেবে নিজেকে তুই একটুও ভর্ৎসনা করিস নে। তুই আর পেটার– তোদের বন্ধুত্বে লাভবানই হবি।

আমার উত্তর

আদরের মারগট,

তোর চিঠি আমার অসম্ভব মিষ্টি লেগেছে, কিন্তু এখনও এ ব্যাপারে আমি ঠিক স্বস্তি পাচ্ছি না, কখনও পাব বলে মনেও হয় না।

পেটার আর আমার মধ্যে তোর মনে তুই যে ভরসা পেয়েছিস, সে প্রশ্ন আপাতত ওঠে না, তবে খটখটে দিনের আলোর চেয়ে খোলা জানালার ধারে আলো-আঁধারিতে পরস্পরকে অনেক বেশি কথা বলা যায়। তাছাড়া ঢাক পিটিয়ে বলার চেয়ে কানে কানে ফিসফিস করে বলা অনেক সহজ। আমার বিশ্বাস, পেটার সম্পর্কে তুই এক রকম ভ্রাতৃস্নেহ বোধ করতে শুরু করেছিস এবং আমি যতটা পারি ততটাই তুই ওকে সানন্দে সাহায্য করতে চাইবি। হয়ত এক সময়ে তোর পক্ষে সেটা সম্ভব হবে, যদিও এ ধরনের ভরসার কথা আমরা ভাবছি না। সেটা আসতে হবে দু'পক্ষ থেকেই। আমার বিশ্বাস, বাপি আর আমার মধ্যে সেই কারণেই কখনও সেটা ঘটেনি। এ নিয়ে আমাদের কথাবার্তা এখানেই শেষ হোক; এর পরও যদি তোর কিছু বলার থাকে, দয়া করে আমাকে লিখে জানাস; কারণ, আমি ঢের ভালো পারি মনের কথা লিখে বলতে।

তুই জানিস না আমি তোর কতটা অনুরাগী; আমি কেবল চাই তোর আর বাপির যে সদ্‌গুণ, তার কিছুটা আমার মধ্যে যেন বর্তায়; কারণ, সেদিক থেকে তোর আর বাপির মধ্যে এখন আমি খুব একটা তফাত খুঁজে পাই না।

তোমার আনা।

বুধবার, ২২ মার্চ, ১৯৪৪

আদরের কিটি,

কাল সন্ধ্যেয় মারগটের কাছ থেকে এই চিঠিটা পেয়েছি–

"আদরের আনা,

কাল তোর চিঠি পেয়ে এই ভেবে আমার মনটা খচখচ করতে লাগল যে, পেটারের সঙ্গে দেখা করতে গেলে তোর বিবেক বোধহয় খোঁচায়; কিন্তু সত্যি বলছি, এটা হওয়ার কোনো কারণ নেই। মনেপ্রাণে বুঝি, কারো সঙ্গে পারস্পরিক বিশ্বাস ভাগ করে নেওয়ার পূর্ণ অধিকার আমার আছে, কিন্তু আজও পেটারকে সে আসনে বসানো আমার বরদাস্ত হবে না।

যাই হোক, তোর কথামত আমিও অনুভব করি, পেটার খানিকটা ভাইয়ের মত, তবে–ছোট ভাই; আমরা পরস্পরকে জানান দিয়েছি, তাতে সাড়া মিললে ভাইবোনের স্নেহের সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে, হয়ত সেটা দুদিন পরে হবে– কিংবা কখনই হবে না; অবশ্য এখনও সে পর্যায়ে যে পৌঁছায়নি, তাতে সন্দেহ নেই। সুতরাং, আমার জন্যে দুঃখ বোধ করার সত্যিই কোনো কারণ নেই। এখন তুই যা পেয়েছিস, সেই সুখ-দুখ যতখানি পারিস ভোগ কর।" ইতিমধ্যে এ জায়গাটা ক্রমেই আরও মনোমুগ্ধকর হয়ে উঠছে। আমার বিশ্বাস কিটি, 'গুপ্ত মহলে' আমরা হয়ত প্রকৃত মহৎ ভালবাসা পেতে পারি। ঘাবড়িও না, ওকে আমি বিয়ে করবার কথা ভাবছি না। বড় হলে ও কেমন হবে জানি না; এও জানি না, আমরা কখনও বিয়ে করবার মতো পরস্পরকে যথেষ্ট ভালোবাসতে পারব কিনা। আমি এখন জানি যে, পেটার আমাকে ভালবাসে,– কিন্তু কী করে, সেটা নিজেই এখনও আমি জানি না।

ও কি চায় একজন প্রাণের বন্ধু, নাকি ওর কাছে আমার আকর্ষণ একজন মেয়ে কিংবা একজন বোন হিসেবে– এখনও আমি তা আবিষ্কার করে উঠতে পারিনি।

ও যখন বলেছিল যে, ওর মা-বাবার ঝগড়ায় আমি সবসময় ওর সহায় হয়েছি– তখন আমি দারুণ খুশি হয়েছিলাম; ওর বন্ধুত্বে আস্থাবান হওয়ার ব্যাপারে তাতে এক ধাপ এগোনো গিয়েছিল। কাল ওকে আমি প্রশ্ন করেছিলাম, এখানে যদি এক ডজন আনা থাকত এবং তারা যদি সবসময় ওর কাছে যেতে থাকত– তাহলে ও কী করত? পেটার তার উত্তরে বলেছিল, 'তারা সবাই যদি তোমার মতো হত, তাহলে নিশ্চয়ই সেটা মন্দ হত না।' আমি গেলে ও অসম্ভব খাতির যত্ন করে এবং আমার ধারণা আমাকে দেখলে সত্যিই ও খুশি হয়। এর মধ্যে ফরাসী নিয়ে খুব নিষ্ঠার সঙ্গে ও খাটছে– এমন কি বিছানায় শোয়ার পরেও সোয়া দশটা পর্যন্ত পেটার তার পড়াশুনো চালিয়ে যায়। যখন আমি শনিবার সন্ধ্যেটা স্মরণ করি, প্রত্যেকটা কথা এবং আগাগোড়া সব যখন আমার মনের মধ্যে ভেসে ওঠে, তখন এই প্রথম অনুভব করি আমার মনে কোনো খেদ নেই; অর্থাৎ সাধারণত যা হয়, সেই মত একটুও না বদলে, আমি যা বলেছিলাম সেই একই কথা আবারও বলব।

পেটার যখন হাসে, যখন সামনের দিকে তাকায়– ওকে এত ভালো দেখায়। ছেলেটা এত মিষ্টি, এত ভালো। আমার মনে হয়, আমার ব্যাপারে যেটা ওকে সবচেয়ে অবাক করেছিল, সেটা হল– যখন ও দেখল, বাইরে থেকে আনাকে যতটা হালকা, ঘোর সাংসারিক বলে মনে হয় আসলে তো তা নয়; আনা বরং পেটারের মতোই স্বপ্ন-দেখা লোক এবং তারও আছে হাজার সমস্যা।

তোমার আনা।

আমার উত্তর

আদরের মারগট,

আমার মনে হয়, এখন আমাদের পক্ষে সবচেয়ে ভালো কাজ হল– কী হয়, অপেক্ষা করে দেখা। আগের মতো চলবে, না আমরা অন্য রকম হব– সে বিষয়ে পেটার আর আমার নিশ্চিত সিদ্ধান্তে আসতে খুব দেরি হবে না। কী পরিণতি হবে আমি নিজেই জানি না; যা নাকের সামনে, তার বাইরে চেয়ে দেখার ব্যাপারে আমি মাথা ঘামাই না। তবে আমি নিশ্চয়ই একটা জিনিস করব– পেটার আর আমি যদি বন্ধু হব সাব্যস্ত করি, তাহলে ওকে বলব তুই ওরও খুব অনুরক্ত; আর যদি প্রয়োজন হয় তাহলে তুই ওকে সাহায্য করতে সব সময়েই রাজী। শেষেরটা তোর অভিপ্রেত না হতে পারে কিন্তু এখন আমি সেটা গ্রাহ্য করছি না; তোর সম্পর্কে পেটারের মনোভাব কী আমি জানি না; তবে সেটা তখন ওকে আমি জিজ্ঞেস করে নেব।

খারাপ নয়, এ বিষয়ে আমি নিশ্চিন্ত– বরং উল্টোটা। আমরা ছাদের ঘরে বা যেখানেই থাকি, সবসময় তুই আমাদের স্বাগত জানবি। সত্যি বলছি, তুই এলে আমাদের কোনো ব্যাঘাত হবে না– কেননা আমাদের মধ্যে একটা মৌন বোঝাপড়া আছে যে, সন্ধ্যেটা অন্ধকার থাকলে তবেই আমরা কথাবার্তা বলব।

মনোবল বজায় রেখো। যেমন আমি রাখি। অবশ্য সব সময় সেটা সহজ নয়। তুমি যা ভাবছ তার আগেই হয়ত তোমার কপাল খুলে যাবে।

তোমার আনা।

বৃহস্পতিবার, ২৩ মার্চ, ১৯৪৪

আদরের কিটি,

সব জিনিস কমবেশি আবার এখন স্বাভাবিক। যারা আমাদের কুপন যোগাত, ভাগ্য ভালো, আবার তারা জেলের বাইরে এসেছে।

মিপ্ কাল ফিরেছেন। এলি অনেক ভালো, তবে কাশি এখনও যায়নি। কুপহুইসকে এখনও বেশ কিছুদিন বাড়িতে থাকতে হবে।

কাল কাছাকাছি একটা জায়গায় প্লেন ভেঙে পড়েছে; ভেতরে যারা ছিল প্যারাসুট নিয়ে সময়মত লাফিয়ে পড়তে পেরেছে। বিমানযন্ত্রটা একটা ইস্কুলবাড়ির ওপর ভেঙে পড়ে, কিন্তু সে সময়ে ইস্কুলে বাচ্চারা ছিল না। এর ফলে, ছোটখাটো অগ্নিকাণ্ড হয় এবং তাতে দুজন লোক পুড়ে মরে। বৈমানিকরা নেমে আসবার সময় জার্মানরা সাংঘাতিকভাবে গুলিগোলা ছোঁড়ে। আমস্টার্ডামের যে সব লোক এটা দেখে, তারা ওদের এই কাপুরুষোচিত আচরণ দেখে রাগে আর বিরক্তিতে প্রায় ফেটে পড়ে। আমরা– আমি মেয়েদের কথা বলছি– আঁতকে উঠেছিলাম, গুলিগোলা আমার দুচক্ষের বিষ।

বেলাশেষে খাওয়ার পর আজকাল প্রায়ই আমি ওপরে যাই; গায়ে লাগাই ফুরফুরে সান্ধ্য হাওয়া। পেটারের পাশে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে বসে থাকতে বেশ লাগে। আমি ওর ঘরে চলে গেলে ফান ডান আর ডুসেল খুব ক্ষীণ কণ্ঠে টিপ্পনি কাটেন; ওঁরা নাম দেন 'আনার দোসরা মোকাম' অথবা বলেন, 'ভদ্রঘরের ছেলেদের কি আধো-অন্ধকার ঘরে কমবয়সী মেয়েদের বসতে বলা উচিত?' এই ধরনের তথাকথিত সরস আক্রমণের

জবাবে পেটার অসাধারণ বাক্‌পটুত্ব দেখায়। সেদিক থেকে মা-মণিও কিছুটা ছোঁকছোঁক করেন। পারলে জিজ্ঞেসই করে বসেন আমরা নিজেদের মধ্যে কী বলাবলি করি– পারেন না, কেননা মনে মনে ভয় পান পাছে থোঁতা মুখ ভোঁতা হয়। পেটার বলে, এটা বড়দের নিছক হিংসের ব্যাপার– কেননা আমাদের বয়স কম এবং ওদের গাত্রদাহ আমরা বিশেষ কেয়ার করি না। মাঝে মাঝে পেটার নিচে এসে আমাকে নিয়ে যায় এবং সমস্ত রকম সাবধানতা সত্ত্বেও লজ্জায় লাল হয়ে ওঠে, তার মুখ দিয়ে কথা সরে না। ভাগ্যিস, আমি লজ্জায় লাল হই না, ওটা নিশ্চয় একটা খুব বিচ্ছিরি অনুভূতি। বাপি সব সময় যে বলেন আমি শুচিবায়ুগ্রস্ত এবং অভিমানী, সেটা কিন্তু ঠিক নয়। আমি শুধুই অভিমানী। আমাকে কেউ বড় একটা বলেনি যে, আমাকে দেখতে ভালো। কেবল ইস্কুলে একটি ছেলে আমাকে বলেছিল হাসলে আমাকে সুন্দর দেখায়। কাল পেটারের কাছ থেকে একটা অকৃত্রিম প্রশংসা পেয়েছি। শুধু মজা করার জন্যে বলব মোটামুটিভাবে আমাদের কি রকম কী কথা হয়েছিল–

পেটার আমাকে প্রায় দেখলেই বলে, 'আনা, একটু হাসো।' ব্যাপারটা অদ্ভুত ঠেকায় ওকে অমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'কেন বলো তো, সব সময় আমি হাসব?'

'কারণ, আমার ভালো লাগে; হাসলে তোমার গালে টোল পড়ে; কেমন করে হয় বল তো?'

'ওটা আমার জন্ম থেকে। আমার চিবুকেও একটা আছে। ওটাই আমার একমাত্র সৌন্দর্য।'

'মোটেই না, ওটা সত্যি নয়।'

'হ্যাঁ, বলছি শোন। আমি ভালভাবেই জানি আমি সুন্দরী নই; কখনও ছিলাম না, কখনও হবোও না।'

'আমি মানছি না। আমি মনে করি তুমি সুন্দরী।'

'সেটা সত্যি নয়।'

'আমি যদি বলি, তাহলে নিশ্চিতভাবে ধরে নিতে পার, সেটা তাই।'

তখন স্বভাবতই আমি তার সম্পর্কেও একই কথা বললাম।

এই হঠাৎ বন্ধুত্ব নিয়ে চারদিক থেকে নানা কথা আমার কানে আসছে। ওঁদের মন্তব্যগুলো এত ফিকে যে, মা-বাবাদের এইসব বকবকানি আমরা তেমন গায়ে মাখি না। মা-বাবার দল দুটো কি নিজেদের যৌবনের কথা ভুলে গিয়েছে? মনে তো হয় তাই; অন্তত দেখতে পাই, আমরা হাসিঠাট্টা করলে ওঁরা মুখ গম্ভীর করেন আর আমরা গুরুগম্ভীর কিছু বললে ওঁরা হেসে উড়িয়ে দেন।

তোমার আনা।

সোমবার, ২৭ মার্চ, ১৯৪৪

আদরের কিটি,

আমাদের লুকিয়ে থাকার ইতিহাসের বেশ একটা বড় অধ্যায় বস্তুত রাজনীতির প্রসঙ্গ নিয়ে হওয়া উচিত; কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে রাজনীতির প্রতি আমার তেমন টান না থাকায়, আমি তার মধ্যে যাইনি। সুতরাং আজ আমি একটিবারের জন্যে আমার পুরো চিঠিটাই রাজনীতি দিয়ে ভরে দেব। এই বিষয়টা নিয়ে যে নানা মুনির নানা মত, তা না বললেও চলে; এ রকম সংকটপূর্ণ সময়ে এটা আলোচনার এমন কি একটা মুখরোচক বিষয় হওয়াও খুবই

যুক্তিসঙ্গত; কিন্তু এ নিয়ে এত রকমের ঝগড়াঝাঁটি থাকাটা স্রেফ বোকামি। ওরা অন্ধকারে ঢিল ছুঁড়ুক, হাসাহাসি করুক, গালাগালি দিক এবং গজগজ করুক; যতক্ষণ নিজের ল্যাজ নিজে পোড়াচ্ছে এবং ঝগড়া করছে না, ততক্ষণ তারা যা খুশি তাই করুক– কেননা সাধারণত পরিণতিগুলো হয় অপ্রীতিকর।

বাইরে থেকে লোকে এমন অনেক খবর নিয়ে আসে যা সত্যি নয়। অবশ্য আজ পর্যন্ত আমাদের রেডিও সেট কখনও মিথ্যে কথা বলেনি। হেংক্, মিপ্, কুপহুইস, এলি আর ক্রালার– এরা সবাই তাদের রাজনৈতিক মনমেজাজের চড়া-মন্দার পরিচয় দিয়েছে; সবচেয়ে কম হেংক্।

'গুপ্ত মহলে'র রাজনৈতিক সাড়া সবসময়ই প্রায় এক। উপকূলে সৈন্য নামানো, হাওয়াই হামলা, নেতাদের বক্তৃতা ইত্যাদি নিয়ে যখন কথার ঝড় ওঠে, সমানে তখন 'অসম্ভব', 'অসম্ভব' বলে কত যে চিৎকার হয় তার ঠিক থাকে না; কিংবা শোনা যায় 'ঈশ্বরের ইচ্ছায়, ওরা যদি এখন শুরু করে, তবে আরও কতদিন ধরে চলবে?' 'চলছে দারুণ, একের নম্বর, বহুৎ খুব।' আশাবাদী আর নৈরাশ্যবাদী এবং সবার ওপরে সেই সব বাস্তববাদী, যারা অক্লান্ত উৎসাহে নিজেদের মতামত দিয়ে যায় এবং অন্যসব কিছুর মতোই, এ ব্যাপারেও তারা প্রত্যেকে নিজেকে অভ্রান্ত মনে করে। ব্রিটিশের ওপর অচলা ভক্তি দেখে ভদ্রমহিলাদের কেউ তাঁর কর্তার ওপর বেজার হন এবং ভদ্রলোকদের কেউ নিজের প্রিয় স্বজাতি সম্পর্কে কটুকাটব্য করার দরুন তাঁর ঘরনীকে ঠোকেন।

এ ব্যাপারে ওদের উৎসাহে যেন কখনও ভাঁটা পড়তে দেখা যায় না। আমি একটা জিনিস আবিষ্কার করেছি– ফল প্রচণ্ড; কারো গায়ে পিন ফোটালে যেমন আশা করা যায় তড়াক করে লাফাবে, এও ঠিক তাই। আমার কায়দা হল এই– মুখপাত করো রাজনীতি দিয়ে। একটি প্রশ্ন, একটি কথা, একটি বাক্য– ব্যস্, সঙ্গে সঙ্গে বোমা ফাটবে।

যেন জার্মান ভের্‌মাখ্‌ট্-এর সংবাদ বুলেটিন আর ইংরেজদের বি.বি.সি.-ও যথেষ্ট নয়, তার ওপর এমন ওঁরা জুটিয়েছেন 'বিশেষ হাওয়াই হামলার ঘোষণা।' এক কথায়, রাজসিক; কিন্তু অন্য দিক থেকে আবার হতাশাব্যঞ্জকও বটে। ব্রিটিশ এখন জার্মানদের মিথ্যের কারবারের মতন সমান উৎসাহে হাওয়াই হামলাকে একটা বিরতিহীন কাজ-কারবারে পরিণত করেছে। সুতরাং রাত পোহাতেই রেডিও শুরু হয়ে যায় এবং সারাদিন ধরে শুনতে শুনতে শেষ হয় রাত নটা, দশটা এবং প্রায়ই এগারোটা নাগাদ।

বড়দের বলিহারি ধৈর্য; কিন্তু সেই সঙ্গে এটাও বোঝায় যে, তাদের মস্তিষ্কের ধারণ ক্ষমতা বেশ কম; এর ব্যতিক্রম অবশ্যই আছে– আমি কারো আঁতে ঘা দিতে চাই না। দিনে একটা কি দুটো সংবাদ বুলেটিনই যথেষ্ট। কিন্তু বোকা ধাড়িগুলো, থুড়ি– আমার যা বলার ছিল বলে দিয়েছি।

আর্‌বাইটার-প্রোগ্রাম, রেডিও 'ওরান্‌জে', ফ্রাঙ্ক ফিলিপ্‌স্ কিংবা মহামান্য রানী ভিল্‌হেল্‌মিনা– প্রত্যেকে পালা করে আসে এবং তাদের কথা বরাবর একাগ্রচিত্তে শোনা হয়। যে সময়টা বা ঘুমোনো থাকে না, ওরা সারাক্ষণ রেডিওর চারপাশে গোল হয়ে বসে খাওয়া, ঘুমোনো আর রাজনীতি নিয়ে বকর বকর করে।

ইস্! এত বিরক্তিকর লাগে। এর মধ্যে পড়ে ম্যাদামারা হওয়ার হাত থেকে নিজেকে বাঁচানোই শক্ত হয়। রাজনীতি মা-বাবাদের এর চেয়ে বেশি কী আর ক্ষতি করবে।

আমি এখানে একটি উজ্জ্বল ব্যতিক্রমের কথা উল্লেখ করব– আমাদের সবার প্রিয়

উইন্‌স্টন চার্চিলের বক্তৃতার সত্যি জবাব নেই।

রবিবার রাত নটা। টেবিলে রাখা টি-পটের গায়ে ঢাকা, অতিথিরা ঢুকছে। বাঁয়ে রেডিওর ঠিক পাশে ডুসেল। রেডিওর সামনাসামনি ফান ডান, তাঁর পাশে পেটার। মিস্টার ফান ডানের পাশে মা-মণি, পেছনে মিসেস ফান ডান। পিম বসেছেন টেবিলে, তাঁর পাশে মারগট আর আমি। আমাদের বসার ধরনটা দেখছি আমি খুব পরিষ্কার ভাবে ফোটাতে পারিনি। ভদ্রলোকেরা পাইপের ধোঁয়া ছাড়ছেন, কষ্ট করে শোনবার চেষ্টা করতে গিয়ে পেটারের চোখ দুটো ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইছে। মা-মণির পরনে গাঢ় রঙের একটা লম্বা ঢিলেঢালা পিরান। মিসেস ফান ডান প্লেনের শব্দে কাঁপছেন; বক্তার তোয়াক্কা না করে প্লেনগুলো এসেনের দিকে পরমানন্দে ছুটে চলেছে। বাপি চায়ে চুমুক দিচ্ছেন। মারগট আর আমি, আমরা দু-বোন একঠাঁই হয়ে বসে; আমাদের দুজনেরই কোল জুড়ে মুশ্চি ঘুমোচ্ছে। মারগটের মাথায় চুল-কোঁকড়ানোর কল আঁটা; আমি যে রাত্রিবাস পরে আছি সেটা যেমনি ছোট, তেমনি আঁটো এবং তেমনি খাটো।

সব মিলিয়ে বরাবরের মতোই খুব ঘনিষ্ঠতার, আরামের আর শান্তির ছবি; এ সত্ত্বেও পরিণামের কথা ভেবে আমি বিভীষিকা দেখছি। বক্তৃতা শেষ হওয়া পর্যন্ত তারা, আর অপেক্ষা করতে পারছে না, মেঝের ওপর পা ঠুকছে; কতক্ষণে তারা গজালি করতে থাকবে, সেই চিন্তাতেই তারা অধীর। তর্কের বিষয়গুলো যতক্ষণ না তাদের বিসম্বাদে আর ঝগড়ায় টেনে নিয়ে যায়, ততক্ষণ তারা ব্যাজর-ব্যাজর করে এ-ওকে সমানে তাতাতে থাকবে।

তোমার আনা।

মঙ্গলবার, ২৮ মার্চ, ১৯৪৪

প্রিয়তম কিটি,

রাজনীতি নিয়ে আরও একগাদা লিখে ফেলতে পারতাম, কিন্তু আজ অন্য নানা বিষয়ে অনেক কিছু তোমাকে আমার বলার আছে। প্রথমত, মা-মণি আমাকে অত ঘন ঘন ওপর তলায় যেতে একরকম বারণই করে দিয়েছেন, কারণ তাঁর মতে মিসেস ফান ডানের তাতে চোখ টাটায়। দ্বিতীয়ত, পেটার মারগটকে বলেছে আমরা ওপর তলায় থাকব, সে যেন আসে; জানি না, এটা মৌখিক ভদ্রতা– না সে মন থেকেই বলেছে। তৃতীয়ত, আমি গিয়ে বাপিকে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে, মিসেস ফান ডানের হিংসুটেপনা আমি গায়ে মাখব কিনা। তার দরকার আছে বলে উনি মনে করেন না। এখন কী করা যায়? মা-মণি চটিতং; বোধ হয় ওঁর চোখও টাটাচ্ছে। ইদানীং আমরা মেলামেশা করলে বাপি কিছু মনে করেন না এবং আমাদের মধ্যে এত যে ভাব, সেটা খুব ভালো বলে ওঁর ধারণা। মারগটও পেটারের ভক্ত; তবে ওর ভাবটা হল, দুইয়ে নিবিড় আর তিনে ভিড়।

মা-মণির ধারণা, পেটার আমার প্রেমে পড়েছে; সেটা হলে, সত্যি বলতে, আমি খুশিই হতাম। তাহলে শোধবোধ হয়ে যেত এবং আমরা পরস্পরকে সত্যিই চিনতে পারতাম। মা-মণি এও বলেন যে, পেটার আমার দিকে তাকিয়ে থাকে। এখন, আমি মনে করি সেটা সত্যি, কিন্তু ও যদি আমার টোল-খাওয়া গালের দিকে তাকায় এবং আমরা মাঝে মাঝে পরস্পরের দিক আড়চোখে চাই, তবে আমার কি করার আছে? করার কিছু আছে কি?

আমি আছি ভারি মুশকিল অবস্থায়। মা-মণি আমার বিরুদ্ধে, আমিও মা-মণির বিরুদ্ধে। বাপি চোখ বুজে থাকেন, যাতে আমাদের নিঃশব্দ লড়াই দেখতে না হয়। মা-মণির মন ভার

হয়ে থাকে, কারণ আমাকে উনি প্রকৃতই ভালবাসেন; আমার কিন্তু একটুও মন খারাপ হয় না। কারণ আমি মনে করি না মা-মনি বোঝেন। আর পেটার– আমি পেটারকে ছেড়ে দিতে চাই না, ও আমার বড় আদরের। আমি ওকে অসম্ভব পছন্দ করি; ক্রমে আমাদের মধ্যে একটা সুন্দর সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারবে; কেন যে বুড়োগুলো সারাক্ষণ নাক গলায়? ভাগ্যি ভালো, আমার মনের ভাব আমি লুকোতে পারি; আমি পেটার বলতে পাগল, কিন্তু অতি চমৎকার ভাবে আমি সেটা লোকচক্ষের আড়াল করে রাখি। ও কি কোনোদিন কিছু বলবে? স্বপ্নে, যেমন পেটেলের গালে গাল রেখেছিলাম, সেই রকম কখনও কি আমার গালে পেটারের গাল রাখার অনুভূতি পাব? ও পেটার ও পেটেল– তোমরা এক, তোমরা অভিন্ন! ওরা আমাদের বোঝে না; দুজনে মুখোমুখি বসে, কোনো কথা না বলে আমরা সুখ পাই– এটা কি কোনোদিনই ওদের মাথায় ঢুকবে না? ওরা বোঝে না কিসের তাড়নায় আমরা এভাবে একাঁঠাই হয়েছি। ইস্, কবে যে এইসব মুশকিলের আসান হবে? এবং মুশকিলের আসান হওয়াই ভালো, তাহলে পরিণতিটা হবে আরও সুন্দর। পেটার যখন হাতের ওপর মাথা রেখে চোখ বুজে শুয়ে থাকে, ও তখনও শিশুটি; বোখার সঙ্গে খেলা করার সময় ও স্নেহময়; ও যখন আলু বা ভারী কিছু বয়ে নিয়ে যায়, পেটার তখন বলবান; ও গিয়ে যখন গোলাগুলি চলতে দেখে, অথবা অন্ধকারে চোর ধরতে যায়, তখন ও সাহসী; আর ও যখন অসম্ভব এলোমেলো আর কাছাখোলা, তখন ওকে আদর করতে ইচ্ছে করে।

আমার অনেক ভালো লাগে আমি ওকে তালিম দেওয়ার চেয়ে ও যখন আমাকে কিছু ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দেয়। প্রায় সব কিছুতেই ও আমার ওপরে হলে, আমি খুশি হই।

দুই মা-কে আমাদের কিসের পরোয়া? তবে এও ঠিক– পেটার যদি, ইস্, শুধু একটু মুখ ফুটে বলত।

তোমার আনা।

বুধবার, ২৯ মার্চ, ১৯৪৪

আদরের কিটি,

লণ্ডন থেকে ওলন্দাজ সংবাদ পরিক্রমায় একজন এমপি বল্‌কেস্টাইন কথা প্রসঙ্গে বললেন, যুদ্ধের পর সমস্ত ডায়রি আর চিঠির একটা সংগ্রহ হওয়া উচিত। তার ফলে তক্ষুণি ওরা সবাই আমার ডায়রির জন্যে আমাকে ছেঁকে ধরল। একবার ভেবে দেখ 'গুপ্ত মহল' নিয়ে রোমাঞ্চকাহিনী যদি ছাপাই কী মজাদার ব্যাপার হবে। বইয়ের নাম (এই ডায়রির গোড়ার নামকরণ ছিল 'হেট আখ্‌টেয়ারহুইস'; ইংরেজিতে এর কোন সঠিক প্রতিশব্দ নেই। সবচেয়ে কাছাকাছি হল 'দি সিক্রেট অফ আনেক্স'– গুপ্ত মহল) দেখেই লোকে ধরে নেবে এটা একটা গোয়েন্দা-গল্প।

কিন্তু, ঠাট্টা নয়, যুদ্ধের দশ বছর পর আমাদের ইহুদিদের যদি বলতে হয় আমরা এখানে কী ভাবে থেকেছি, কী খেয়েছি, কী নিয়ে কথাবার্তা বলেছি, তাহলে তখন, সেসব হাস্যকর শোনাবে। তোমাকে আমি অনেক কিছুই বলি বটে, তবু যত যাই হোক, তুমি আমাদের জীবনের কণামাত্র জানো।

হাওয়াই হামলার সময় মহিলারা যে কী ভয় পেতেন। যেমন, রবিবারে যা হল; ৩৫০টা ব্রিটিশ প্লেন এসে ঈমুইডেনের ওপর পাঁচ লক্ষ কিলো ওজনের বোমা ফেলে গেল; বাড়িগুলো তখন একগুচ্ছ তৃণের মতো তির তির করে কাঁপছিল; কে জানে কত মহামারীর প্রাদুর্ভাব

ঘটেছে এখন। তুমি এ সবের কোনোই খবর রাখো না। তোমাকে সবকিছু সবিস্তারে জানাতে হলে আমাকে এখন সারাটা দিন বসে, লিখে যেতে হবে। তরিতরকারি আর অন্য যাবতীয় জিনিসের জন্যে লোকজনদের লাইনে গিয়ে দাঁড়াতে হচ্ছে, ডাক্তাররা রুগী দেখতে যেতে পারছে না, কারণ রাস্তায় রেখে যেই পেছন ফিরবে সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি হাওয়া হয়ে যাবে; চুরি-চামারি এত বেড়ে গেছে যে, তুমি অবাক হয়ে ভাববে, ওলন্দাজদের ঘাড়ে কী এমন ভূত চাপল যে, রাতারাতি তারা চোর হয়ে গেল। পুঁচকে পুঁচকে ছেলে, বয়স কারো আট– কারো এগারো, লোকজনদের বাড়িঘরের জানালা ভেঙে ঢুকে যা পাচ্ছে তাই হাতিয়ে নিয়ে চলে যাচ্ছে। পাঁচ মিনিট কেউ বাড়ি ছেড়ে যেতে পারে না; তুমি গেলে তোমার জিনিসপত্রও চলে যাবে। খোয়া যাওয়া জিনিসপত্র, টাইপরাইটার, পারসোর গাল্‌চে, ইলেকট্রিক ঘড়ি ইত্যাদি ফেরত পেলে পুরস্কার দেওয়া হবে– এই মর্মে রোজ কাগজে বিজ্ঞপ্তি বেরোচ্ছে। রাস্তার ইলেকট্রিক ঘড়িগুলো লোপাট, পাবলিক টেলিফোনগুলো টান মেরে তারসুদ্ধ তুলে নিয়ে গেছে। লোকজনদের মনোবল ভালো থাকা সম্ভব নয়– সাপ্তাহিক যা রেশন, তাতে কফির অনুকল্প ছাড়া আর কিছুই দুদিনের বেশি যায় না। সৈন্য নামানোর ব্যাপার তো সেই কবে থেকে শুনে আসছি; এদিকে লোকজনদের জার্মানিতে ঠেলে পাঠানো হচ্ছে। ছেলেপুলেরা হয় অসুখে পড়ছে, নয় পুষ্টিহীনতায় ভুগছে; প্রত্যেকেরই জামাকাপড় আর জুতোর জীর্ণ দশা। কালোবাজারে জুতোর একটা নতুন সোলের দাম সাড়ে সাত ফ্লোরিন; তার ওপর, মুচিরা কেউ জুতো সারাইয়ের কাজ হাতে নেবে না আর যদি নেয়ও, মাসের পর মাস অপেক্ষা করতে হবে– তার মধ্যে অনেক সময় জুতো জোড়াই গায়েব হয়ে যাবে।

এর মধ্যে একটা ভালো জিনিস এই যে, খাবারদাবার যত নিকৃষ্ট এবং দমনপীড়ন যত জোরালো হচ্ছে, কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে অন্তর্ঘাত সমানে ততই বাড়ছে। খাদ্য দপ্তরগুলোতে যারা কাজ করে, পুলিস, রাজকর্মচারী, এরা সবাই হয় শহরের বাকি লোকদের সঙ্গে থেকে মেহনত করছে এবং তাদের সাহায্য করছে আর তা নয়তো মিথ্যে লাগানো-ভজানো করে তাদের শ্রীঘরে পাঠাচ্ছে। সৌভাগ্যের বিষয়, ওলন্দাজ জনসাধারণের খুব একটা নগণ্য অংশই বিপথে চালিত হয়েছে।

তোমার আনা।

শুক্রবার, ৩১ মার্চ, ১৯৪৪

আদরের কিটি,

ভাবো একবার, এখনও রীতিমত শীত, অথচ আজ প্রায় মাসখানেক হতে চলল বেশিরভাগ লোকেরই ঘরে কয়লা নেই– বড় আরাম, তাই না! রুশ রণাঙ্গনের ক্ষেত্রে সাধারণভাবে লোকের আশাবাদ আবার চাগিয়ে উঠেছে, কেননা সেখানে দারুণ ব্যাপার ঘটছে। তুমি জানো, রাজনীতির বিষয়ে আমি বেশি কিছু লিখি না, কিন্তু তোমাকে এটুকু জানতেই হবে ওরা এখন কোথায় এসেছে; ওরা একদম পোল্যাণ্ডের সীমানায় এবং রুমানিয়ার কাছে প্রুথে পৌঁছে গেছে। একটু হাত বাড়ালেই ওডেসা। প্রতি সন্ধ্যায় এখানকার লোকেরা আশা করছে স্তালিনের কাছ থেকে বিশেষ বিজ্ঞপ্তি এল বলে।

একটা করে জিৎ হয় আর মস্কোয় তোপ দেগে আনন্দধ্বনি করা হয়। এত বেশি তোপ দাগার ঘটনা ঘটছে যে, মস্কো শহর নিশ্চয় রোজ কড়াক্কড় কড়াক্কড় আওয়াজে কেঁপে সারা হচ্ছে। হয়ত ওরা ভাবছে যুদ্ধটা হাতের মধ্যে এসে গেছে, এই বলে মনকে চোখ ঠারতে কী

মজা! কিংবা ওরা হয়ত আনন্দ প্রকাশের আর কোনো ভাষা জানে না। দুইয়ের কোনটা ঠিক আমি জানি না।

হাঙ্গেরি জার্মান সৈন্যদের দখলে। এখনও সেখানে লাখ দশেক ইহুদি আছে; সুতরাং ওরাও এবার টেরটি পাবে।

পেটার আর আমার বিষয় নিয়ে বকবকানি এখন খানিকটা কম। দুজনে এখন আমরা হলায়-গলায়, একসঙ্গে অনেকক্ষণ কাটে এবং দুনিয়ার হেন বিষয় নেই যা নিয়ে আমরা কথা বলি না। বিপদের জায়গায় এসে পড়লে অন্য ছেলেদের বেলায় যেটা হয়, পেটারের ক্ষেত্রে সেটা হয় না– কখনই নিজের রাশ ধরে রাখার দরকার পড়ে না। এটা যে কী ভালো, কী বলব। যেমন, আমরা রক্তের বিষয় নিয়ে কথা বলছিলাম, তাই থেকে আমরা ঋতুস্রাবের কথায় এসে গেলাম। পেটার মনে করে, আমরা মেয়েরা খুব শক্ত ধাতুতে গড়া। ব্যাপারখানা কী? এখানে এসে আমি ভালো আছি; অনেক ভালো। ঈশ্বর আমাকে একা ফেলে রেখে যাননি, একা ফেলে রেখে যাবেন না।

তোমার আনা।

শনিবার, ১ এপ্রিল, ১৯৪৪

আদরের কিটি,

আর এত করেও এখনও সবই কী দুষ্কর; আশাকরি বুঝতে পারছ আমি কী বলতে চাইছি; পারছ না? আমি মরে যাচ্ছি একটি চুমোর জন্যে, যে চুমো আসি-আসি করে আজও এল না। তবে কি সমস্তক্ষণ আমাকে সে আজও বন্ধুর আসনেই বসিয়ে রেখে দিয়েছে? আমি কি তার বেশি কিছু নই? তুমি জানো আর আমি জানি, আমি শক্ত মানুষ– আমার প্রায় সব বোঝা আমি একাই বহন করতে পারি! আর কাউকে নিজের মাথাব্যথার অংশীদার করা, আমার মা-র আঁচল ধরে থাকা– কখনই এটা আমার অভ্যেস নয়। কিন্তু এখন আমি আপনা থেকে চাই শুধু একটি বারের জন্যে 'তার' কাঁধে মাথা রেখে চুপচাপ পড়ে থাকতে।

পেটারের গালে গাল রাখার সেই স্বপ্ন আমি জীবনেও ভুলব না, কী যে ভালো লেগেছিল কী বলব! পেটারও কি তার জন্যে ব্যাকুল হবে না? শুধু কি বেশিরকম লজ্জার দরুনই সে তার নিজের ভালবাসা স্বীকার করতে পারছে না? কেন সে থেকে থেকেই আমাকে তার কাছে চায়? হায়, কেন ও মুখ ফুটে বলে না? আর নয়, আমাকে শান্ত হতে হবে, আমি শক্ত থাকব এবং একটু ধৈর্য ধরে থাকলে অন্যটাও এসে যাবে, কিন্তু সবচেয়ে খারাপ ব্যাপার সেটাই– দেখে মনে হচ্ছে আমি হন্যে হয়েছি ওর জন্যে; সবসময় শুধু আমিই ওপরে যাই, ও কখনই আমার কাছে আসে না। কিন্তু তার কারণ তো শুধু ঘর। ও সেই অসুবিধে নিশ্চয়ই বুঝবে।

বটেই তো, আরও অনেক কিছু আছে যা সে বুঝবে।

তোমার আনা।

সোমবার, ৩ এপ্রিল, ১৯৪৪

আদরের কিটি,

সাধারণত যা করি না আজ একবার তাই করব; খাবারের বিষয়ে বিস্তারিতভাবে লিখব, তার কারণ বিষয়টা হয়ে দাঁড়িয়েছে অত্যন্ত গোলমেলে আর জরুরী– শুধু এই 'গুপ্ত মহলে' নয়। সারা হল্যাণ্ড, গোটা ইউরোপ এবং তারও বাইরে।

এখানে আমাদের বসবাসের এই একুশ মাসে অনেকগুলো 'খাদ্য চক্করে'র ভেতর দিয়ে যেতে হয়েছে– এর মানেটা, দাঁড়াও, এখুনি তোমাকে বুঝিয়ে দিচ্ছি। 'খাদ্য চক্কর' হচ্ছে সেই সময়টা যখন শুধু একটি মাত্র পদ বা একটিমাত্র সব্জি ছাড়া আর কিছু খাবার জোটে না। একসময়ে দীর্ঘদিন আমাদের ক্রমাগত কাসনি শাক খেতে হয়েছে– বালি-কিচকিচ-করা কাসনি, বালি-ছাড়া কাসনি, কাসনির দমপুক্ত, কাসনি সেদ্ধ বা কাসনির বাটা-চচ্চড়ি। এরপর পালা করে এল পালং শাক, কচালু, শশা, টমেটো, টক-কপি, এইরকম আরও কিছু।

যেমন, রোজ এ-বেলা ও-বেলা একগাদা টক-কপি খাওয়াটা কী যে অরুচিকর কী বলব, অথচ ক্ষিধের পেটে খেতে তো হবেই। যাই হোক, এখন আমাদের সবচেয়ে রমরমে সময়, কারণ টাটকা সব্জি একেবারেই পাওয়া যাচ্ছে না।

সন্ধ্যেবেলায় হপ্তাভর আমাদের খাদ্যতালিকা হল শিম, কড়াইশুঁটির সুপ, মালপুয়ার সঙ্গে আলু, আলু-পনির এবং ঈশ্বরের কৃপায়, মাঝেমধ্যে শালগমের মাথা আর পচ-ধরা গাজর আর তারপর আবার ঘুরে আসে শিম। পাঁউরুটির ঘাটতির জন্যে প্রাতরাশ থেকে শুরু করে বসলেই খাওয়ার পাতে আলু। আমরা তৈরি শিম বা শিমের কোয়া, আলু দিয়ে সুপ, প্যাকেটের জুলিনে সুপ, প্যাকেটের ফ্রেঞ্চ সুপ, প্যাকেটের শিম দিয়ে সুপ। রুটি বাদ দিলে সবেতেই শিম।

সন্ধ্যেবেলায় থাকবেই সুরুয়ার সঙ্গে আলু আর– এখনও থেকে গেছে, ভাগ্যিস– বীট সালাড। সরকারী ময়দা, পানি আর খামির দিয়ে আমাদের তৈরি মালপুয়ার একটু গুণ বর্ননা করব। মালপুয়াগুলো এত শক্ত আর আঠা-আঠা হয় যে, পেটে গিয়ে যেন পাথরের মতো চেপে বসে– ওহ্, সে যা জিনিস!

প্রতি সপ্তাহের মস্ত বড় আকর্ষণ হলো মেটে দিয়ে তৈরি সসেজ, আর জ্যাম মাখানো শুখা রুটি। তবু কিন্তু আমরা বেঁচে আছি এবং খাবার খারাপ হলেও প্রায়ই খেয়ে তৃপ্তি হয়।

তোমার আনা।

মঙ্গলবার, ৪ এপ্রিল, ১৯৪৪

আদরের কিটি,

অনেক দিন অব্দি আমার মনে হত কিসের জন্যে আর খেটে মরব। যুদ্ধ শেষ হওয়ার সম্ভাবনা সুদূর পরাহত, রূপকথার মতোই অবাস্তব। সেপ্টেম্বরের মধ্যে যুদ্ধ শেষ না হলে আমার ইস্কুল যাওয়ার দফারফা। কেননা আমি চাই না দুই বছর পেছনে পড়ে থাকতে। আমার দিনগুলো ভরে রাখতে পেটার– উঠতে পেটার; বসতে পেটার, শয়নে স্বপনে শুধুই সে। শনিবার পর্যন্ত এই চলেছে।

এই সময় আমি এমন মন-মরা হয়ে পড়লাম কী বলব। সাংঘাতিক মন-মরা। পেটারের সঙ্গে যতক্ষণ ছিলাম চোখের পানি ঠেকিয়ে রেখেছিলাম; তারপর ফান ডানদের সঙ্গে লেবুর শরবত খেতে খেতে একটু হাসিগল্প করে মনটা ভালো আর চাঙ্গা হলো। কিন্তু যে মুহূর্তে একা হয়েছি– তখনই আমি জানি আমি কেঁদে কেঁদে সারা হব। কাজেই রাতের পোশাক পরা অবস্থায় আমি মেঝের ওপর ঢলে পড়লাম।

প্রথম আমি খুব মনপ্রাণ দিয়ে আমার দীর্ঘ প্রার্থনাটা সেরে নিলাম; তারপর খালি মেঝের ওপর হাঁটু মুড়ে পুঁটুলি পাকিয়ে বসে দুটো বাহুর মধ্যে মুখ ডুবিয়ে আমি কাঁদলাম। একবার ফুঁপিয়ে কাঁদার পরই আমার চৈতন্য ফিরে এল; আমি কান্না বন্ধ করে দিলাম, পাছে পাশের

ঘরের লোকে শুনতে পায়। এরপর আমি চেষ্টা করলাম মনের মধ্যে খানিকটা জোর আনতে। 'আমি চাই, আমি চাই, আমি চাই...' এর বেশি গলা দিয়ে আর স্বর বেরোল না। অস্বাভাবিক ভঙ্গির দরুন সম্পূর্ণ কাঠ হয়ে গিয়ে শরীরটা বিছানার ধারে গিয়ে পড়ল, তারপর থেকে চেষ্টা করতে করতে বিছানায় ওঠা শেষ পর্যন্ত সম্ভব হলো না ঠিক সাড়ে দশটার আগে। ততক্ষণে নিজেকে সামলে নিয়েছি।

এখন আর তার কোনো জের নেই। আমাকে খাটতে হবে যাতে মূর্খ বনে না যাই, যাতে উন্নতি করি, যাতে সাংবাদিক হতে পারি– সেটা হওয়াই আমার বাসনা। আমি জানি আমার লেখার হাত আছে, আমার লেখা গোটা দুই গল্প বেশ ভালো, 'গুপ্ত মহলে'র বর্ণনাগুলো সরস, আমার ডায়রির বিস্তর জায়গায় যথাযথ ভাব ফুটেছে– আমার সত্যিকার ক্ষমতা আছে কি নেই পরে বোঝা যাবে।

আমার সবচেয়ে ভালো রূপকথা 'ইভার স্বপ্ন'; অদ্ভুত ব্যাপার হলো, কোথা থেকে যে সেটা এসেছে আমি জানি না। 'ক্যাডির জীবনে'র বেশ খানিকটা ভালো, কিন্তু সব মিলিয়ে কিচ্ছু নয়।

আমার নিজের লেখার সবচেয়ে ভালো এবং তীব্রতম সমালোচক আমি নিজে। আমি জানি কোন্‌টা সুলিখিত, কোন্‌টা নয়। যে নিজে লেখক না, সে জানে না লেখা জিনিসটা কী অপূর্ব একটা ব্যাপার। আমি একেবারেই আঁকতে পারি না বলে আগে দুঃখ করতাম, কিন্তু অন্তত লিখতে পারি বলে আমি ঢের বেশি খুশি। বই লেখা বা কাগজে লেখার গুণ যদি আমার নাও থেকে থাকে, সেক্ষেত্রে আমি নিজের জন্য লিখতে পারি।

আমি চাই এগিয়ে যেতে। মা-মণি আর মিসেস ফান ডান এবং অন্য সব মহিলারা যে যার কাজ করেন আর তারপর বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে যান, ঠিক তাঁদের মতো জীবন-যাপন করার কথা আমি ভাবতেই পারি না। স্বামী-পুত্র ছাড়াও আমার এমন কিছু থাকবে, যার হাতে আমি নিজেকে সঁপে দিতে পারব।

মৃত্যুর পরেও আমি চাই বেঁচে থাকতে। কাজেই ঈশ্বরদত্ত এই ক্ষমতা নিজেকে ফুটিয়ে তোলার, লেখার, আমার অন্তরের সব কিছু ব্যক্ত করার এই সম্ভাবনা– এর জন্যে আমি কৃতজ্ঞ।

আমি লিখতে বসে সব কিছু মন থেকে ঝেড়ে ফেলতে পারি; আমার দুঃখ উবে যায়, আমার মনোবল ফিরে আসে। কিন্তু আমি কি মহৎ কিছু লিখতে পারব, কখনও কি হতে পারব সাংবাদিক বা লেখক? এটাই বড় প্রশ্ন। আমার আশা, খুব বড় রকমের আশা যে, আমি পারব; কারণ, আমি যখন লিখি, আমার চিন্তা আমার আদর্শ আর আমার স্ব-কপোলকল্পনা– সমস্তই আমার স্মৃতিপথে ফিরে আসে।

'ক্যাডির জীবন' যতটা লিখেছিলাম, তারপর এতদিনেও আর এগোয়নি। কি ভাবে এগোতে হবে আমার মনের মধ্যে তার ছবিটা স্পষ্ট, কিন্তু কেন জানি না কলম থেকে তা স্বতোৎসারিত হচ্ছে না। হয়ত কোনোদিনই ওটা শেষ হবে না। হয়ত ছেঁড়া কাগজের ঝুড়িতে, কিংবা অগ্নিগর্ভে ওর স্থান হবে...। ভাবতে খুবই খারাপ লাগে, কিন্তু আমি তখন আমার মনকে বলি, 'চৌদ্দ বছর বয়সে, এত সামান্য অভিজ্ঞতা নিয়ে, কোন্ সাহসে লেখায় তুমি দর্শন আনো?' অগত্যা নতুন সাহসে বুক বেঁধে আবার এগোই; আমার ধারণা, আমি সফল হব, কেননা আমি লিখতে চাই।

তোমার আনা।

বৃহস্পতিবার, ৬ এপ্রিল, ১৯৪৪

আদরের কিটি,

তুমি জানতে চেয়েছ কী আমার নেশা, কিসে আমার ঝোঁক। বলছি– আগে থেকে জানিয়ে রাখি, আমার নেশা আর ঝোঁক এত বেশি যে, তাই দেখে যেন আবার ঘাবড়ে যেও না।

সর্বপ্রথম ঃ লেখা কিন্তু নেশার মধ্যে সেটা ঠিক পড়ে না।

দুই নম্বর ঃ বংশপঞ্জী। বই, পত্রিকা, পুস্তিকা পেলেই আমি ফরাসী, জার্মান, স্প্যানিশ, ইংরেজ, অস্ট্রিয়ান, রুশ, নরওয়েজিয়ান আর ডাচ রাজবংশের কুলজী খুঁজে বেড়াই! ওদের অনেকের বেলাতেই এ কাজে আমি অনেক দূর এগিয়েছি; তার কারণ, আজ বহুদিন থেকেই যাবতীয় জীবনী আর ইতিহাস বই পড়ে তা থেকে টুকে রাখার কাজ করে আসছি। এমন কি ইতিহাসের অনেক ভালো ভালো জায়গা আমি টুকে রাখি। আমার তৃতীয় নেশা, তার মানে, ইতিহাস। বাপি আমাকে এ বিষয়ের অনেক বই আগেই কিনে দিয়েছেন। যেদিন কোনো সাধারণ পাঠাগারে গিয়ে কবে বই হাঁটকাতে পারব সেই আশায় অধীর হয়ে দিন গুনছি।

চার নম্বর হল গ্রীস আর রোমের পুরাণ। এ বিষয়েও আমার হরেক বই আছে।।

অন্য সব নেশার মধ্যে চিত্রতারকা আর পরিবারের ফটো। বই আর পড়া বলতে পাগল। আমার প্রচণ্ড ভালো লাগে শিল্পের ইতিহাস, কবি আর শিল্পীদের বৃত্তান্ত। পরে সঙ্গীতের দিকে মন দেব। বীজগণিত, জ্যামিতি আর অঙ্ক আমার দুই চোখের বিষ।

স্কুলপাঠ্য অন্য সব বিষয়ই আমার মনঃপূত, তবে সবচেয়ে বেশি ইতিহাস প্রিয়।

তোমার আনা।

মঙ্গলবার, ১১ এপ্রিল, ১৯৪৪

আদরের কিটি,

আমার মাথা টিপ টিপ করছে, আমি সত্যি জানি না কোথা থেকে শুরু করব।

শুক্রবার (গুড ফ্রাইডে) আমরা মনোপলি খেলেছিলাম, শনিবার বিকেলেও তাই। এই দিনগুলো ঘটনাহীনভাবে তরতরিয়ে কেটে গেল। রবিবার বিকেলে আমি ডাকায় পেটার আমার ঘরে আসে সাড়ে চারটায়। সোয়া পাঁচটায় আমরা সামনের চিলেকোঠায় যাই, ছটা পর্যন্ত সেখানে থাকি। ছটা থেকে সোয়া সাতটা পর্যন্ত রেডিওতে মোৎসার্টের বড় সুন্দর কনসার্ট ছিল। আমি চুটিয়ে উপভোগ করেছিলাম বিশেষ করে 'ক্লাইনে নাখ্‌ট্‌মুজিক'। যখন আমি ভালো সঙ্গীত শুনি তখন প্রাণের মধ্যে এমন নাড়া লাগে যে, ঘরের মধ্যে আমার কানে কিছু ঢোকে না। রবিবার সন্ধ্যের পর পেটার আর আমি সামনের দিকে চিলেকোঠায় চলে যাই। আরামে বসার জন্যে ডিভানের কিছু কুশন আমরা হাতিয়ে নিয়ে যাই। আমরা এটা প্যাকিং বাক্সের ওপর বসি। প্যাকিং বাক্স আর কুশন দুটোই এত সরু যে; একেবারে চ্যাপ্টা হয়ে বসে আমরা পিঠ রেখেছিলাম অন্য বাক্সগুলোতে। আমাদের সঙ্গে ছিল মুশ্চি, কাজেই পাহারা দেবার লোক ছিল।

হঠাৎ পৌনে নটায় মিস্টার ফান ডান শিস দিয়ে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন ডুসেলের একটি কুশন আমাদের কাছে আছে কিনা। আমরা লাফ দিয়ে পড়ে কুশন, বেড়াল আর ফান ডান সমেত নিচে নেমে গেলাম।

কুশন নিয়ে পানি অনেক দূর গড়াল। ডুসেল ওঁর একটি কুশন বালিশ হিসেবে ব্যবহার করতেন। আমরা সেটি নিয়ে যাওয়ায় উনি খুব চটিতং। ওঁর ভয়, ওঁর প্রিয় কুশনে পিসু ঢুকবে

এবং তাই নিয়ে তুলকালাম কাণ্ড বাধালেন। প্রতিশোধ নেবার জন্যে আমি আর পেটার দুটো শক্ত বুরুশ ওঁর বিছানায় ফেলে রাখলাম। মধ্যের এই ঘটনাটা নিয়ে আমরা দুজনে প্রাণ খুলে হাসলাম।

কিন্তু আমাদের মুখের হাসি মুখেই থেকে গেল। রাত সাড়ে নটা নাগাদ পেটার দরজায় আস্তে করে ডেকে বাপিকে বলল একটি কঠিন ইংরেজি বাক্য নিয়ে ও ফাঁপরে পড়েছে বাপি যদি একবার ওপরে গিয়ে ওকে একটু সাহায্য করেন। আমি মারগটকে বললাম, 'আসল ব্যাপার লুকোচ্ছে। শুনলেই বোঝা যায়।' আমার কথাই ঠিক। কারা যেন জোর করে মালগুদামে ঢোকার চেষ্টা করছে। বাপি, ফান ডান, ডুসেল আর পেটার সাঁ করে নিচে নেমে গেছে। ওপরে বসে অপেক্ষা করছি আমি, মারগট, মা-মণি আর মিসেস ফান ডান।

চারজন ভীতসন্ত্রস্ত মেয়ে, কাজেই কথা তাদের বলতেই হয়। হঠাৎ দড়াম করে আওয়াজ। তারপর সব চুপ। ঘড়িতে পৌনে দশ বাজল। আমাদের মুখগুলো সব প্যাঙাস হয়ে গেছে; ভয় পেলেও আমরা আর টু শব্দ করছি না। পুরুষগুলো গেল কোথায়? অত জোরে শব্দটা হল কিসের? ওরা কি চোরদের সঙ্গে লড়ছে? দশটা বাজল, সিঁড়িতে পায়ের আওয়াজ। ঘরে ঢুকলেন বাপি, মুখ ভয়ে সাদা; পেছনে পেছনে এলেন মিস্টার ফান ডান। বিমর্ষ মুখে তিনি বললেন, 'আলো সব বন্ধ, গুটি গুটি ওপরে চলে যাও, বাড়িতে বোধ হয় পুলিসের হামলা হবে।'

একটা জ্যাকেট টেনে নিলাম, তারপর আমরা চলে গেলাম ওপরে। 'কী হয়েছে? চটপট বলো।' কে বলবে? পুরুষরা সবাই আবার নিচের তলায় হাওয়া। দশটা বেজে দশে ওদের পুনঃদর্শন মিলল। পেটারের খোলা জানলায় দুজন দাঁড়াল পাহারায়। সিঁড়ির নিচের দরজাটা বন্ধ করে ঝোলা-আলমারিটা এঁটে দেওয়া হল। নাইট-লাইটের ওপর আমরা একটা সোয়েটার জড়িয়ে দিলাম। তখন ওরা বলল–

সিঁড়ির নিচে দুম্ দুম্ করে দুটো আওয়াজ হয়। পেটার তাই শুনে নিচে নেমে গিয়ে দেখে বামদিকের দরজার আধখানা জুড়ে একটা পাল্লা উঠিয়ে ফেলা হয়েছে। ছুটে ওপরে চলে এসে বাড়ির 'হোমগার্ড'দের হুঁশিয়ার করলে ওরা চারজন একসঙ্গে নিচের তলায় নেমে যায়। ওরা যখন মালখানায় ঢোকে তখন দেখতে পায় সিঁদেল চোররা গর্তটাকে বড় করছে। ফান ডান আর দ্বিধাদ্বন্দ্ব না করে 'পুলিস! পুলিস!' বলে চেঁচিয়ে ওঠেন।

বাইরে দু-চারটে দ্রুত পায়ের শব্দ– চোরের দল হাওয়া। গর্তটা যাতে পুলিসের চোখে না পড়ে, তার জন্যে দরজার গায়ে একটা তক্তা খাড়া করা হল। বাইরে থেকে একটা জোর লাথি, সঙ্গে সঙ্গে তক্তাটা মেঝের ওপর ছিটকে পড়ল। এরা থ হয়ে গেল, স্পর্ধা তো কম নয়। ফান ডান আর পেটার, দুজনেরই তখন মাথায় খুন চেপেছে। একটা কাটারি দিয়ে ফান ডান মেঝের ওপর, একটা বাড়ি মারলেন। সঙ্গে সঙ্গে সব ঠাণ্ডা। গর্তের মুখে দরজার তক্তাটা ওঁরা লাগিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। তাতে বাধা পড়ল। বাইরে থেকে এক বিবাহিত দম্পতি গর্তের মুখে টর্চ ফেলায় গোটা গুদামঘরটা আলোয় ভরে যায়। এদের একজন রাগে দাঁত কিড়মিড় করতে থাকে। এবার এদের চৌকিদারের ভূমিকা ছেড়ে চোরের ভূমিকায় দেখা গেল। মানুষ চারজন পা টিপে টিপে ওপরতলায় উঠে এল। পেটার চটপট রান্নাঘর আর খাস কামরার দরজা জানালা খুলে দিয়ে টেলিফোনটা মেঝের ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিল। শেষ পর্যন্ত এরা চারজন ঝোলা-আলমারির পেছনের দালানে এসে পড়ল।

প্রথম খন্ড সমাপ্ত

টর্চ-হাতে সেই বিবাহিত দম্পতি, খুব সম্ভবত ওঁরা কথাটা পুলিসের কানে তুলেছিলেন। ঘটনাটা ঘটে রবিবার সন্ধ্যেবেলায়, ঈস্টারের রবিবারে; পরদিন ঈস্টারের সোমবার, অফিস ফাঁকা। কাজেই মঙ্গলবার সকালের আগে আমরা কেউ জায়গা ছেড়ে নড়তে পারিনি।

ভেবে দেখ, দুই রাত আর একটি দিন ভয়ে কাঁটা হয়ে অপেক্ষা করে থাকা! কেউ কিছু করবার কথা বলতে পারছে না; কাজেই ঘুটঘুটে অন্ধকারে বসে থাকা ছাড়া আমাদের কোনো কাজ নেই– কেননা মিসেস ফান ডান ভয়ের চোটে নিজের অজ্ঞাত বাতিটার বারোটা বাজিয়ে দিয়েছেন। উনি কথা বলছেন ফিস্ফিস্ করে এবং ক্যাঁচ করে শব্দ হলেই বলে উঠছেন, 'চুপ, একদম চুপ!'

সাড়ে দশটা বাজল, এগারোটা বাজল, তবু কোনো আওয়াজ নেই। বাপি এবং ফান ডান পালা করে আমাদের কাছে বসছেন। যখন সোয়া এগারোটা হল, নিচের তলায় লোকজনের নড়াচড়া আর গলার আওয়াজ পাওয়া গেল। প্রত্যেকের শুধু নিঃশ্বাস পড়ার শব্দ হচ্ছে, নইলে নড়াচড়া একেবারে বন্ধ। বাড়ির মধ্যে পায়ের শব্দ– খাস কামরার দপ্তরে, রান্নাঘরে, তারপর... আমাদের সিঁড়িতে। সবাই এবার নিঃশ্বাস চেপে রেখেছে, সিঁড়ি বেয়ে কারা যেন উঠছে, তারপরই ঝোলা-আলমারিতে ঘট্ ঘট্ শব্দ। সেই মুহূর্তটির কোনো বর্ণনা হয় না। আমি বললাম, 'ব্যস, এবার খতম।' মনশ্চক্ষে দেখতে পাচ্ছি ঐ রাত্রেই গেস্টাপো আমাদের ধরে নিয়ে যাচ্ছে। আলমারির কাছে বার দুই ঘট ঘট শব্দ হওয়ার পর সব চুপচাপ। সিঁড়ি দিয়ে নেমে যাওয়ার শব্দ। এ পর্যন্ত আমরা তরে গেলাম। একটা কাঁপুনি যেন সবার মধ্যে সংক্রামিত হল; আমার কানে এল কারো দাঁতে দাঁতে ঠক ঠক করার শব্দ; কারো মুখে কোনো কথা নেই।

বাড়িটা এখন একেবারে নিস্তব্ধ; শুধু সিঁড়ির নিচে আলমারিটার ঠিক সামনে ড্যাব ড্যাব করে একটা আলো জ্বলছে। ওটা একটা রহস্যপূর্ণ আলমারি বলে কি? হতেও তো পারে, পুলিস আলো নেভাতে ভুলে গেছে? কেউ কি ফিরে এসে নিভিয়ে দিয়ে যাবে? আস্তে আস্তে মুখে কথা ফুটছে। বাড়িটাতে এখন আর কেউ নেই, হয়ত কেউ বাইরে দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছে।

এরপর আমরা তিনটে জিনিস করলাম– আমাদের ধারণায় যা ঘটেছে, তার পুনরালোচনা করলাম; ভয়ে আমরা কাঁপতে লাগলাম; এবং আমাদের পায়খানায় যেতে হল। টুক্রিগুলো ছিল চিলেকোঠায়; থাকার মধ্যে আমাদের ছিল পেটারের ছেঁড়া কাগজ ফেলার টিনের পাত্র। প্রথমে গেলেন ফান ডান, তারপর বাপি, কিন্তু মা-মণি লজ্জায় ও মুখো হলেন না। বাপি ছেঁড়া কাগজের টুক্রিটা ঘরের মধ্যে এনে দিলে মারগট, মিসেস ফান ডান আর আমি সানন্দে সেটির সদ্ব্যবহার করলাম। শেষ পর্যন্ত মা-মণিও পথে এলেন। সকলে সমানে কাগজ চাইতে লাগল– ভাগ্যক্রমে আমার পকেটে কিছু ছিল।

টিনটা থেকে ভয়ঙ্কর গন্ধ বেরোচ্ছে; সবাই ফিস্ ফিস্ করে কথাবার্তা বলছে; আমরা ক্লান্তিতে এলিয়ে পড়লাম; বেলা তখন বারোটা। 'মেঝেতেই তবে লম্বা হয়ে ঘুমোও।' মারগটকে আর আমাকে একটি করে বালিশ আর একটি করে কম্বল দেওয়া হল। মারগট গিয়ে শুলো ভাঁড়ার রাখার আলমারির কাছে আর আমি টেবিলের দুটোর পায়ার মাঝখানে। মেঝের ওপর গন্ধটা তত তীব্র নয়, কিন্তু এই সঙ্গেও মিসেস ফান ডান চুপচাপ। কিছুটা ক্লোরিন নিয়ে এলেন এবং দ্বিতীয় কৌশল হাত মোছার একটা তোয়ালে এনে টুক্রির ওপর চাপা দিলেন।

কথা, ফিসফাস, ভয়, কটুগন্ধ, বায়ু নিঃসরণ আর তার সঙ্গে সর্বক্ষণ কারো না কারো টুক্‌রিতে বসা; ঘুমোও তো দেখি কেমন পারো! যাই হোক, আড়াইটা নাগাদ ক্লান্তিতে আমার চোখ আপনি বুঁজে এল। অঘোরে ঘুমোলাম সাড়ে তিনটে অব্দি। মিসেস ফান ডানের মাথা আমার পায়ে ঠেকতে ঘুম ভেঙে গেল।

আমি বললাম, 'দোহাই, আমাকে পরবার একটা কিছু দিন। আমাকে দেওয়া হল, কিন্তু কী দেওয়া হল জানতে চেয়ো না– আমার পাজামার ওপর এক জোড়া পশমের নিকার, একটা লাল জাম্পার আর একটা কালো স্কার্ট, সাদা উপরতল্লা জুতো এবং খেলার মাঠের এক জোড়া শতচ্ছিদ্র মোজা। এরপর মিসেস ফান ডান চেয়ারে বসলেন আর তাঁর স্বামী এসে আমার পায়ের ওপর ধপ করে শুয়ে পড়লেন। সাড়ে তিনটে পর্যন্ত শুয়ে আমি আকাশ-পাতাল ভাবলাম। সারাক্ষণ আমি হি হি করে কাঁপছিলাম– ফলে, মিস্টার ফান ডানের ঘুম মাটি হল। পুলিশ ফিরে আসবে, তার জন্যে আমি মনে মনে তৈরি হচ্ছিলাম; তখন বলতে হবে আমরা লুকিয়ে ছিলাম; ওরা যদি সাধারণ ঘরের ভালো ডাচ হয়, তো আমরা বাঁচলাম; আর যদি ডাচ নাৎসী (ডাচ ন্যাশনাল সোশালিস্ট) হয়, তো ঘুষ খাওয়াতে হবে।

মিসেস ফান ডান দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'সে ক্ষেত্রে রেডিওটা নষ্ট করে ফেল।' ওঁর স্বামী বললেন, 'বেশ বলেছ, উনুনে ফেলে দাও! দেখ, ওরা যদি আমারই পাত্তা পায়, তাহলে আর রেডিওর পাত্তা পেলে কী এল গেল!'

বাপি তাতে জুড়লেন, 'তারপর আনার ডায়রিটা ওরা দেখতে পারে।' এ বাড়ির সবচেয়ে ঘাবড়ে-যাওয়া লোকটি বলল, 'ওটা পুড়িয়ে ফেললেই তো হয়।' এই কথা যখন বলা হল আর পুলিস যখন আলমারি-দেওয়া দরজায় ঘট্‌ ঘট্‌ ঘট্‌ করে শব্দ করেছিল– এই দুটোই ছিল আমার সবচেয়ে খারাপ মুহূর্ত। 'আমার ডায়রি কিছুতেই না; ডায়রি চলে গেলে তার সঙ্গে আমিও বিদায় হব।' কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে বাপি চুপ হয়ে গেলেন।

এত বেশি কথা হয়েছিল যে, যতটা মনে আছে, তার সব পুনরুদ্ধার করে লাভ নেই। মিসেস ফান ডান বেজায় ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন, ওঁকে আমি সান্ত্বনা দিলাম। পালিয়ে যাওয়া আর গেস্টাপোর জেরার মুখে পড়া সম্পর্কে, টেলিফোন করার বিষয়ে এবং সাহসে বুক বাঁধার ব্যাপারে দুজনের কথা হল।

'মিসেস ফান ডান, সৈন্যদের মতো আমাদের আচরণ হওয়া উচিত। যদি আমাদের দিন ফুরিয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে যাওয়া যাক রানী আর দেশের জন্যে, স্বাধীনতা সত্য আর ন্যায়ের জন্যে– ইংল্যাণ্ড থেকে ডাচ খবর প্রচারের সূত্রে সব সময় যা বলা হয়। একটাই শুধু যাচ্ছেতাই ব্যাপার– আমাদের সঙ্গে সঙ্গে আরও গুচ্ছের লোক মুশকিলে পড়ে যাবে।'

এক ঘণ্টা পরে মিস্টার ফান ডান তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে আবার জায়গা বদল করলেন। আর বাপি এসে আমার পাশে বসলেন। দুই পুরুষ মানুষ মিলে অবিরাম ধোঁয়া টেনে চললেন, থেকে থেকে একটি করে দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে, তারপর একজন কেউ টুক্‌রিতে গিয়ে বসে, তারপর আগাগোড়া আবার একই ভাবে চলে।

চারটে, পাঁচটা, সাড়ে পাঁচটা। তখন আমি গিয়ে পেটারের কাছে জানলার পাশে বসে কান খাড়া করে রইলাম। দুজনে দুজনের এত কাছাকাছি যে, আমরা পরস্পরের শরীরের কেঁপে ওঠা টের পাচ্ছি। পাশের ঘরে ওরা আলোয় পরানো ঠুলি সরিয়ে নিয়েছে। ওরা চেয়েছিল সাতটায় কুপহুইসকে টেলিফোনে ধরতে, যাতে তিনি কাউকে এদিকটাতে পাঠিয়ে দেন। টেলিফোনে কী বলা হবে, সেটা ওরা একটা কাগজে আনুপূর্বিক লিখে নেয়। দরজায়

কিংবা মালখানায় কোনো পুলিশ পাহারায় থাকলে তার কানে টেলিফোনের আওয়াজ যাওয়ার সমূহ ভয়। কিন্তু পুলিস বাহিনী ফিরে এলে তাতে আরও বেশি বিপদের ভয়।

কুপহুইসকে এই এই জিনিস বলতে হবে–

সিঁদ কেটে চোর ঢুকেছিল; পুলিস এ বাড়িতে আসে; তারা ঝোলা-আলমারি পর্যন্ত যায়, তার বেশি এগোয়নি।

বোঝাই যায়, সিঁদেল-চোররা বাধা পেয়ে মালখানার দরজা ভেঙে বাগানের দিক দিয়ে চম্পট দেয়।

সদর দরজায় হুড়কো দেওয়া ছিল বলে বেরোবার সময় ক্রালার নিশ্চয় দ্বিতীয় দরজাটি ব্যবহার করেন। খাস কামরার অফিসে কালো কেসের মধ্যে টাইপরাইটার আর গণক যন্ত্রটি নিরাপদে রাখা আছে।

হেংক্‌কে যেন হুঁশিয়ার করা হয় এবং এলির কাছ থেকে চাবি আনিয়ে নিয়ে– বেড়ালকে খেতে দেওয়ার অছিলায়– সে যেন অফিসে গিয়ে একটু টহল দিয়ে দেখে নেয়।

সব কিছু ঠিক প্ল্যান মাফিক হল। কুপহুইস ফোন পেলেন। যে টাইপরাইটারগুলো ওপর তলায় ছিল সেগুলো কেসের ভেতর ভরে রাখা হল। তারপর আমরা টেবিলে গোল হয়ে বসে হয় হেংক্, নয় পুলিসের জন্যে অপেক্ষা করে রইলাম।

পেটার ঘুমিয়ে পড়েছিল। আমি আর ফান ডান মেঝের ওপর এলিয়ে রয়েছি। এমন সময় নিচের তলায় দুম্ দুম্ করে পায়ের আওয়াজ। আমি চুপচাপ উঠে পড়ে বললাম, 'হেংক্ এসেছেন।'

বাকি লোকদের কয়েকজন বলল, 'না, না, পুলিস।'

দরজায় খুট্ খুট্ করে কারো আওয়াজ, সেইসঙ্গে মিপের শিস্। মিসেস ফান ডান আর পারলেন না, তাঁর মুখ কাগজের মতো সাদা, হাঁটু ভেঙে ধপ্ করে চেয়ারের ওপর বসে পড়লেন। ওঁর স্নায়ুর ওপর চাপ যদি আর এক মিনিটও স্থায়ী হত, তাহলে উনি জ্ঞান হারিয়ে ফেলতেন।

মিপ্ আর হেংক্ যখন আমাদের ঘরে ঢুকলেন, তখন সে এক দৃশ্যই বটে– শুধু টেবিলটারই অবস্থা ফটো তুলে রেখে দেওয়ার মতো। এক কপি 'সিনেমা ও থিয়েটার', তার ওপর জেব্‌ড়ে রয়েছে জ্যাম আর উদরাময়ের একটি দাওয়াই, খোলা পৃষ্ঠাটিতে নর্তকীর দল; জ্যাম রাখার দুটো বয়াম, আধ-খাওয়া দুটো পাঁউরুটি; একটা আরশি, চিরুনি, দেশলাই, ছাই, সিগারেট, তামাক, ছাইদানি, বই, গোটা দুই প্যান্ট, একটা টর্চ, টয়লেট পেপার ইত্যাদি, ইত্যাদি– সব বিচিত্র জেল্লায় একসঙ্গে তালগোল পাকিয়ে।

হেংক্ আর মিপ্‌কে অবশ্যই হৈ হৈ করে এবং চোখের পানিতে স্বাগত জানানো হল। কয়েকটা তক্তা দিয়ে হেংক্ দরজার গর্তটা মেরামত করে দিলেন এবং খানিক পরেই সিঁদ কাটার ব্যাপারটা পুলিসকে এত্তেলা করতে চলে গেলেন। মিপ্ মালখানার দরজার তলা থেকে রাতের চৌকিদার স্লাগ্‌টারের লেখা এটা চিরকুট কুড়িয়ে পেয়েছিলেন; স্লাগ্‌টার ঐ গর্তটা দেখতে পেয়েছিলেন এবং পুলিসকে জানিয়েছিলেন। হেংক্ তাঁর সঙ্গেও দেখা করে আসবেন।

সুতরাং আধঘন্টার মধ্যে আমাদের ফিটফাট হয়ে নিতে হবে মাত্র আধঘন্টার মধ্যে এমন রূপান্তর ঘটতে এর আগে কখনও দেখিনি। মারগট আর আমি বিছানার চাদরপত্র নিয়ে নিচের তলায় শৌচাগারে চলে গেলাম; ধোয়াধুয়ি সেরে দাঁত মাজলাম আর চুল ঠিক করে

নিলাম। তারপর ঘরটা খানিকটা গোছগাছ করে ওপরতলায় ফিরে এলাম। এসে দেখি টেবিলটা ইতিমধ্যেই সাফসুফ করা হয়ে গেছে। খানিকটা পানি ফুটিয়ে কফি আর চা করে, দুধ ফুটিয়ে নিয়ে টেবিলে মধ্যাহ্নভোজের আয়োজন করে ফেললাম। পেটারকে সঙ্গে নিয়ে বাপি টুকরিগুলো খালি করে, গরম পানি ক্লোরিন দিয়ে ভালো করে পরিষ্কার করে ফেললেন।

হেংক্ ফিরে এলে এগারোটায় আমরা তাঁকে নিয়ে টেবিলের চারধারে বসে গেলাম। ততক্ষণে স্বাভাবিক জীবন আর জমাটি ভাব ফিরে আসতে শুরু করেছে।

মিস্টার স্লাগ্‌টার তখন ঘুমোচ্ছিলেন। কিন্তু তাঁর স্ত্রী হেংক্‌কে বললেন, ক্যানেলের কাছ বরাবর টহল দিতে দিতে তাঁর স্বামী আমাদের দরজায় ফোকর দেখতে পান এবং তখন পুলিসের একটি লোককে ডেকে এনে ওঁরা দুজনে বাড়ির ভেতর ঢুকে খোঁজখবর করেন। স্লাগ্‌টার মঙ্গলবার ক্রালারের সঙ্গে দেখা করে আরও সবিস্তারে সব বলবেন। থানায় গিয়ে দেখা গেল তারা সিঁদ কাটার কথা জানে না, তবে সেখানে সঙ্গে সঙ্গে পুলিস সেটা নোট করে নেয় এবং বলে যে, মঙ্গলবার এসে সব দেখেশুনে যাবে। ফেরার পথে মোড়ের মাথায় হেংক্-এর সঙ্গে আমাদের সব্জিওয়ালার দেখা হয়; হেংক্ তাঁকে বাড়িতে সিঁদ কাটার কথাটা বলেন। উনি শান্ত গলায় বললেন, 'আমি সেটা জানি। কাল সন্ধ্যেবেলা আমার স্ত্রীকে নিয়ে যখন বেরোই তখন দরজার গায়ে গর্তটা দেখতে পাই। আমার স্ত্রীর দাঁড়াবার ইচ্ছে ছিল না, কিন্তু আমি টর্চ জ্বেলে ভেতরটা একবার দেখে নিলাম; সঙ্গে সঙ্গে চোরগুলো তখন পিঠটান দেয়। যাতে বিপদ-আপদ না হয়, তার জন্যে আমি ফোন করে পুলিসে খবর দিইনি; কেননা তোমার সঙ্গে আমার যা সম্পর্ক, তাতে সেটা করা উচিত হবে না বলে মনে করেছি। আমি কিছু জানি না, তবে অনেক কিছু আঁচ করতে পারি।'

হেংক্ তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে চলে যান। আমরা এখানে আছি বোঝাই যায়, সব্জিওয়ালা সেটা আঁচ করেন; কারণ উনি দুপুরের খাওয়ার সময়টাতে বরাবর আলু এনে দেন। লোকটা কী ভালো!

হেংক্ চলে গেলেন এবং আমরা বাসন মাজা সেরে ফেললাম, ঘড়িতে তখন একটা। আমরা সবাই ঘুমোতে চলে গেলাম। পৌনে তিনটেয় আমার ঘুম ভাঙল, ততক্ষণে দেখি ডুসেল হাওয়া। ঘুম-ঘুম চোখে একেবারেই আলটপকা পেটারের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। পেটার তখন সবে নেমে এসেছে। কথা হল নিচের তলায় আমরা দেখা করব।

আমি ঠিকঠাক হয়ে নিচে গেলাম। পেটার জিজ্ঞেস করল, 'সামনের চিলেকোঠায় যাওয়ার এখনও বুকের পাটা আছে তোমার?' আমি ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালাম, তারপর আমার বালিশটা বগলদাবা করে চিলেকোঠায় উঠে গেলাম। আবহাওয়াটা ছিল দারুণ, একটু পরেই আর্তনাদ শুরু করে দিল সাইরেন। আমরা নড়লাম না। পেটার একটা হাতে আমার কাঁধ জড়াল, আমি একটা হাতে ওর কাঁধ হাত রেখে আমরা চুপচাপ বসে রইলাম যতক্ষণ না চারটের সময় মারগট কফি খাওয়ার জন্যে আমাদের ডাকতে এল।

আমরা রুটি শেষ করে লেমোনেড খেলাম এবং হাসিঠাট্টা করলাম (আবার আমরা পারছি), বলতে গেলে সব সেই আগের মতোই স্বাভবিক ভাবে। সন্ধ্যেবেলায় পেটারকে আমি সাবাস জানালাম– আমাদের মধ্যে পেটারই সবচেয়ে বেশি সাহস দেখিয়েছে।

সে রাতের মতো বিপদে আমরা কেউ কখনও পড়িনি। ঈশ্বর আমাদের প্রকৃতই রক্ষা করেছেন; একবার অবস্থাটা ভেবে দেখ– আমাদের আলমারির গুপ্তস্থলে পুলিস দাঁড়িয়ে ডানদিকে ঠিক তার সামনে প্যাট প্যাট করে আলো জ্বলছে, এবং এ সত্ত্বেও আমরা চোখের

আড়ালে রয়ে গেলাম। যদি দেশ চড়াও হয়, সেই সঙ্গে বোমাবাজি চলে– সবাই তাহলে চাচা আপন প্রাণ বাঁচা বলে ছুটবে। কিন্তু অপকট রক্ষাকারী হিসেবে এক্ষেত্রে ভয় জিনিসটা আমাদের উপকারেও লেগেছে।

'আমরা রক্ষা পেয়েছি, আমাদের রক্ষা করে চলো।' এইটুকুই আমরা শুধু বলতে পারি।

এই ব্যাপারটা বেশ কিছু পরিবর্তন ঘটিয়েছে। মিস্টার ডুসেল আর এখন সন্ধ্যেগুলোতে নিচে গিয়ে ক্রালারের আপিস ঘরে বসেন না; তার বদলে বাথরুমে বসেন। সাড়ে আটটায় এবং সাড়ে নটায় পেটার একবার সারা বাড়ি চক্কর দিয়ে দেখে আসে। রাতে এখন আর পেটারকে তার জানলা খুলতে দেওয়া হয় না। বন্ধ ফাঁকফোকর সাড়ে নটার পর কেউ খুলতে পারবে না। আজ সন্ধ্যের দিকে একজন ছুতোর মিস্ত্রি আসছে মালখানার দরজাগুলো আরও মজবুত করতে।

'গুপ্ত মহলে' এখন সবসময় নানা বিষয়ে বাদানুবাদ চলেছে। অসতর্কতার জন্যে ক্রালার আমাদের বকেছেন। হেংক্ও বলেছেন যে, এ রকম ক্ষেত্রে আমরা যেন কখনো নিচের তলায় না যাই। আমাদের পই পই করে বলা হয়েছে যেন মনে রাখি আমরা লুকিয়ে আছি, আমরা হলাম পায়ে বেড়ি পরা ইহুদি, এক জায়গায় আটক, আমাদের অধিকার বলে কিছু নেই, কিন্তু আমাদের হাজারটা করণীয়। আমরা ইহুদিরা যেন কাউকে জানতে না দিই আমাদের মনে কী হচ্ছে, আমাদের সাহসী আর শক্ত হতে হবে। বিনা ওজর আপত্তিতে সব অসুবিধে মাথা পেতে নিতে হবে, ক্ষমতায় যতটা কুলোয় করে যেতে হবে এবং ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখতে হবে। একদিন এই ভয়ঙ্কর যুদ্ধ থেমে যাবে। এমন একটা সময় নিশ্চয়ই আসবে যখন আমরা আবার মনুষ্য পদবাচ্য হব– কেবল ইহুদি হয়ে থাকব না।

কে আমাদের ওপর এ জিনিস চাপিয়েছে? আর সব মানুষ থেকে আমাদের– ইহুদিদের কে আলাদা করেছে? আজ অব্দি কার প্রশ্রয়ে আমাদের এমন জ্বালাযন্ত্রণা পেতে হয়েছে? ঈশ্বর আজ আমাদের এমন অবস্থায় ফেলেছেন, আবার সেই ঈশ্বরই আমাদের টেনে ওপরে তুলবেন। আমরা যদি তাবৎ লাঞ্ছনা সহ্য করতে পারি এবং এসব চুকেবুকে গেলে, ফৌত না হয়ে যে ইহুদিরা আখেরে বেঁচে থাকবে তাদের আদর্শ হিসেবে তুলে ধরা হবে। কে জানে, এমন কি এও হতে পারে যে, আমাদের ধর্ম থেকেই সারা দুনিয়ার সব জাতের মানুষ সৎ শিক্ষা পাবে এবং সেই কারণে, শুধু সেই কারণেই, এখন আমাদের কষ্ট পেতে হবে। আমরা কোনাদিনই নিছক নেদারল্যাণ্ডীয়, কিংবা নিছক ইংরেজ বা সেদিক থেকে অন্য কোনো দেশীয় হতে পারব না; আমরা চিরদিই যে ইহুদিই থাকব– কিন্তু তাই তো আমরা চাই।

সাহসে বুক বাঁধো! এসো আমরা গাঁইগুঁই না করে আমাদের কর্তব্য সম্বন্ধে অবহিত থাকি, সমাধান একটা হবেই, ঈশ্বর আমাদের লোকজনদের কখনই ছেড়ে যাননি। যুগ যুগ ধরে ইহুদিরা আছে, সব যুগেই তাদের লাঞ্ছনা পেতে হয়েছে, কিন্তু তাতে তারা শক্তিমানও হয়েছে; যে দুর্বল সে মরে; যে সবল সে থেকে যায়, কখনও বরবাদ হয়ে যায় না।

সেদিন রাত্রে আমার সত্যিই মনে হয়েছিল আমি মরে যাব, পুলিস আসার অপেক্ষা করেছি, যুদ্ধক্ষেত্রের সৈনিকের মতোই আমি তৈরি ছিলাম। দেশের জন্যে প্রাণ দিতে আমি উৎসুক ছিলাম, কিন্তু এখন, এখন আমি আবার যমের মুখ থেকে ফিরে এসেছি, এখন আমার যুদ্ধান্তের প্রথম ইচ্ছে হল ওলন্দাজ হওয়া। ওলন্দাজদের আমি ভালবাসি, এই দেশ আমি ভালবাসি, এখনকার ভাষা আমার প্রিয় এবং আমি এখানে কাজ করতে চাই। এমন কি যদি রানীকে আমায় লিখতেও হয়, তবু লক্ষ্যে না পৌছুনো পর্যন্ত আমি হাল ছাড়ব না।

দিন দিন আমার মা-বাবার ওপর নির্ভরতা আরও কমছে; আমার বয়স কম বলে, মা-মণির চেয়ে ঢের বেশি সাহস ভারে আমি জীবনের মুখোমুখি দাঁড়াতে পারি; ন্যায় বিচারের প্রতি আমার মনোভাব ওঁর চেয়ে ঢের অবিচল আর অকৃত্রিম। আমি আমার মন চিনি, আমার একটা লক্ষ্য আছে, মতামত আছে; আমার আছে একটা ধর্ম আর ভালবাসা। আমি যা, আমি যদি তাই হই তাহলেই সন্তুষ্ট হব। আমি জানি আমি একজন মেয়ে; এমন এক মেয়ে, যার আন্তরিক শক্তি আছে এবং যে প্রচুর সাহসী

ঈশ্বর যদি আমাকে বাঁচিয়ে রাখেন, মা-মণির চেয়ে আমি অনেক বেশি সার্থক হব, আমি হেঁজিপেঁজি হয়ে থাকব না, আমি দুনিয়া জুড়ে সব মানুষের জন্যে নিজেকে ঢেলে দেব।

এখন আমি জেনেছি, আমার পক্ষে সর্বপ্রথম এবং সবচেয়ে বড় প্রয়োজন হল সাহস আর চিত্তের প্রফুল্লতা।

তোমার আনা।

শুক্রবার, ১৪ এপ্রিল, ১৯৪৪

আদরের কিটি,

এখানকার আবহাওয়া এখনও বেজায় অস্বাভাবিক। পিমের এমন অবস্থা যে, আরেকটু হলেই ফেটে পড়বেন। মিসেস ফান ডান সর্দিজ্বরে পড়েছেন এবং হেঁচে-কেশে বাড়ি মাথায় করছেন। মিস্টার ফান ডান সিগারেটের অভাবে কেমন যেন ফ্যাকাশে হয়ে পড়ছেন, প্রচুর সুখস্বাচ্ছন্দ্য ত্যাগ করছেন যে ডুসেল, তাঁর টিকাটিপ্পনি লেগেই আছে, ইত্যাদি ইত্যাদি।

এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে, এখন আমাদের পাথর চাপা কপাল। শৌচাগারে ফুটো পানির কলের ওয়াশার বেপাত্তা, তবে যেহেতু আমাদের অনেক চেনাজানা, শীগগিরই এসব জিনিস আমরা ঠিকঠাক করে নিতে পারব।

জানি, মাঝে মাঝে আমি ভাবালু হয়ে পড়ি, তবে কখনও কখনও এখানে কারণ ঘটে ভাবালু হয়ে পড়ার, যখন আমি আর পেটার কোথাও রাবিশ আর ধুলোর রাজ্যে একটা শক্ত প্যাকিং বাক্সের ওপর কাঁধ ধরাধরি করে খুব ঘেঁষাঘেঁষি হয়ে বসি, আমার একথোকা কোঁকড়া চুলে থাকে ওর হাত; যখন বাইরে পাখিরা গান গায় আর তুমি দেখতে পাও গাছগুলো কেমন পাল্টে সবুজ হয়ে যায়, খোলা হাওয়ার আমন্ত্রণ জানায় ঝকঝকে রোদ, যখন আকাশ অসম্ভব নীল, তখন– হায়, তখন আমার কত কী যে ইচ্ছে হয়।

তাকালেই দেখা যাবে এখানে সবাই অখুশি, সকলেরই হাঁড়ি মুখ; শুধু দীর্ঘশ্বাস আর চাপা নালিশ। দেখে বাস্তবিকই মনে হবে আমরা যেন অকস্মাৎ, খুব দুরবস্থায় পড়ে গিয়েছি। যদি সত্যি বলতে হয়, যতটা খারাপ পুরোটাই তোমার নিজেরই তৈরি। এখানে ভালো জিনিস করে দেখাবার কেউ নেই; প্রত্যেকের দেখা উচিত সে যাতে তার বিশেষ মানসিক অবস্থা কাটিয়ে উঠতে পারে। রোজই তুমি শুনবে 'এ সবের শেষ হলে বাঁচতাম।'

আমার কাজ, আমার আশা, আমার ভালবাসা, আমার সাহস– এরই জোরে আমি পানির ওপর মাথা ভাসিয়ে রেখেছি এবং খুঁতখুঁত করার হাত থেকে বেঁচেছি।

আমি সত্যিই মনে করি, কিটি, আজ আমার মাথাটা একটু গুলিয়ে গিয়েছে। তবে, কেন তা জানি না। এখানে সবকিছু এত তালগোল পাকানো, কোনোটার সঙ্গে কোনোটারই আর কোনো যোগ নেই, এবং কখনও কখনও আমার খুবই সন্দেহ হয়, ভবিষ্যতে আমার এই আবোলতাবোলে কেউ কোনো আগ্রহ বোধ করবে কিনা।

এই সব আবোলতাবোলের শিরোনাম হবে 'এক কুচ্ছিত হংসীশাবকের মনখোলা কথা'। আমার ডায়রি বস্তুত সর্বশ্রী বল্‌কেস্টাইন বা জের্‌ব্রাণ্ডির (লণ্ডনে নির্বাসনে গঠিত মন্ত্রিসভার দুই সদস্য) বিশেষ কাজে আসবে না।

তোমার আনা।

শনিবার, ১৫ এপ্রিল, ১৯৪৪

আদরের কিটি,

'এক ধাক্কা সামলাতে না সামলাতে আরেক ধাক্কা। এ থেকে কি কোনো নিষ্কৃতি নেই?' নিজেদের অকপটে এখন আমরা এ প্রশ্ন করতেই পারি। সর্বশেষ কী ঘটনা ঘটেছে বোধহয় জানো না। পেটার, করেছিল কি, সামনের দরজার হুড়কো খুলতে (রাত্রে ভেতর থেকে আগল দিয়ে রাখা হয়) ভুলে গিয়েছিল; এদিকে অন্য দরজাটার তালা বিগ্‌ড়ে আছে। ফলে, ক্রালার আর অফিসের অন্য লোকজনেরা বাড়ির ভেতরে ঢুকতে পারেননি। ক্রালার তখন পাড়াপড়শীদের সাহায্য নিয়ে রান্নাঘরে জানালা ভেঙে পেছনের দিক দিয়ে বাড়িতে ঢোকেন। আমাদের এই আহাম্মকিতে ক্রালার রেগে আগুন হয়ে গেছেন।

পেটার জানো তা, এতে ভীষণ মনঃক্ষুণ্ন হয়ে পড়েছে। খেতে বসে একসময়ে মা-মণি যেই বলেছেন যে, আর কারো চেয়ে পেটারের জন্যেই তাঁর বেশি দুঃখ হয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে পেটারের যেন চোখ ফেটে পানি বেরিয়ে আসার উপক্রম হল। এ ব্যাপারে পেটার একা নয়, আমরাও সমান দোষী; কারণ প্রায় প্রতিদিনই এ বাড়ির পুরুষেরা জিজ্ঞেস করেন দরজার হুড়কো খোলা হয়েছে কিনা। আজই কেউ সেটা জিজ্ঞেস করেনি।

হয়ত পরে আমি ওকে খানিকটা বুঝিয়ে শান্ত করে তুলতে পারব। ওর জন্যে কিছু করতে পারলে আমি কী আনন্দ যে পাই!

তোমার আনা।

রবিবার, ১৬ এপ্রিল, ১৯৪৪

প্রাণপ্রতিম কিটি,

কালকের তারিখটা মনে রেখো, আমার জীবনে ছিল খুব স্মরণীয় একটি দিন। প্রত্যেকটি মেয়ের কাছেই সেই দিনটি নিশ্চয় খুব বড় হয়ে দেখা দেয়, যেদিন সে পায় জীবনের প্রথম চুম্বন? তাহলে আমার কাছেও এই দিনের ততটাই গুরুত্ব। আমার ডান গালে আমার ডান হাতে মিস্টার ওয়াকারের সেই চুম্বনটি।

হঠাৎ কী করে এই চুমো খাওয়ার ব্যাপারটা ঘটল? রসো, বলছি।

কাল সন্ধ্যেবেলায়, তখন ঘড়িতে আটটা, আমি পেটারের ডিভানে গিয়ে বসেছি তার খানিক পরেই ও আমাকে হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরল। আমি বললাম, 'একটু সরে বসলে ভালো হয়, তাহলে আর আলমারিতে আমার মাথা ঠুকে যাওয়ার ভয় থাকবে না। প্রায় কোণের দিকে ও সরে গেল! ওর হাতের ভেতর দিয়ে ওর পিঠের আড়াআড়ি আমি হাত বাড়িয়ে দিলাম; আমার কাঁধে ওর হাত ঝুলে থাকায় আমি প্রায় ওর কোলের মধ্যে চলে গেলাম।

আগেও আমরা এভাবে কয়েকবার বসেছি, কিন্তু কালকের মতন অতটা গায়ে গায়ে হয়ে নয়। ও বেশ শক্ত করে আমাকে ধরে রইল, আমার বাঁ কাঁধ ওর বুকের ওপর। ততক্ষণে আমার হৃদস্পন্দন দ্রুততর; কিন্তু তখনও আমরা শেষ করিনি। ওর কাঁধে যতক্ষণ আমি মাথা

না রাখলাম এবং যতক্ষণ দুজনে মাথায় মাথায় না হলাম পেটার ছাড়ল না। মিনিট পাঁচেক পরে আমি সোজা হয়ে বসেছি, খানিক পরে পেটার আরেকবার আমার মাথাটা ওর হাতের মধ্যে ধরে কাঁধে রেখে মাথায় মাথা ঠেকাল। ওঃ, কী যে ভাল লাগছিল বলবার নয়, আনন্দে গদগদ হয়ে আমি বিশেষ কথা বলতে পারছিরাম না। ও আমার গালে আর হাতে খানিকটা আনাড়ির মতো ঠোনা মারছিল, আমার কোঁকড়া চুলের থোকাগুলো নিয়ে খেলা করছিল এবং প্রায় সারাক্ষণ আমরা মাথায় মাথা দিয়ে ছিলাম। আমি তোমাকে বলে বোঝাতে পারব না, কিটি, সে যে কী আশ্চর্য অনুভূতি; আনন্দে আমার বাক্‌রোধ হয়ে গিয়েছিল; আমার ধারণা, পেটারেরও তাই।

আমরা সাড়ে আটটায় উঠে পড়লাম। পেটার ওর খেলতে যাওয়ার রবারের জুতোটা পরে নিল, যাতে বাড়িটা টহল দেবার সময় শব্দ না হয়। আমি ওর পাশে দাঁড়িয়ে। আমরা নিচে নামব, এমন সময়– জানি না কোথা থেকে কী হয়ে গেল, হঠাৎ আমাকে ও চুমো খেয়ে বসল। আমার চুলের ভেতরে মুখ ডুবিয়ে, বাঁ গালে অর্ধেক আর অর্ধেক আমার কানে। ওর হাত ছাড়িয়ে আমি আর কোনোদিকে না তাকিয়ে সোজা নিচে নেমে এলাম। আজ কেবলই আমার মন উচাটন হয়ে আছে।

তোমার আনা।

সোমবার, ১৭ এপ্রিল, ১৯৪৪

আদরের কিটি,

সাড়ে সতেরো বছরের এক ছেলে আর পুরো পঞ্চদশীও নয় এমন এক মেয়ে, আমি ডিভানে বসে ছেলেটিকে চুমো খাচ্ছি– এমন জিনিস আমার বাপি আর মা-মণি মেনে নেবেন বলে তুমি মনে করো? আমার ঠিক মনে হয় না ওঁরা মেনে নেবেন। তবে এ ব্যাপারে আমার নিজের ওপর ভরসা করতে হবে। নিরিবিলিতে আর প্রশান্তিতে ওর কোলের মধ্যে শুয়ে থাকা আর স্বপ্ন দেখা; শরীরে শিহরণ তুলে দুজনে গালে গাল ঠেকিয়ে রাখা; জেনে আনন্দ হওয়া যে কেউ একজন আমার জন্যে অপেক্ষা করছে। কিন্তু এর মধ্যিখানে বড় রকমের 'কিন্তু' একটা থেকেই যায়, কারণ, পেটার কি এইখানে ইতি টেনে দিয়েই সন্তুষ্ট থাকবে? আগেই যে ও কথা দিয়েছে, আমি সে কথা ভুলিনি। তবু... ও ছেলের জাত তো বটে!

নিজেই জানি, আমি অনেক আগে আগে শুরু করেছি, এখনও পনেরোও নয় এবং এরই মধ্যে এতখানি পাখা গজিয়েছে। অন্যদের পক্ষে এটা বুঝে ওঠা শক্ত; আমি এটা প্রায় নিশ্চিতভাবেই জানি যে, বাগ্‌দান বা বিয়ের কোনোরকম কথা না হয়ে থাকলে মারগট কখনই কোনো ছেলেকে চুমো খাবে না; সেদিক থেকে পেটার বা আমি আমরা কেউ তেমন কিছু ভাবিইনি। বাপির আগে মা-মণি যে কোনো পুরুষ মানুষকে ছোঁননি, সে বিষয়েও আমি নিশ্চিত। আমি যে পেটারের বুকে বুক ঠেকিয়ে, দুজনে দুজনের কাঁধে মাথা রেখে ওর কোলের মধ্যে শুয়েছি, আমার মেয়ে-বন্ধুরা সে কথা জানতে পারলে কী বলবে!

ইস্, আনা, কী কেলেঙ্কারির কথা! আমি কিন্তু সত্যিই তা মনে করি না। এখানে আমরা ভয় আর দুর্ভাবনার মধ্যে, দুনিয়ার বের হয়ে, খাঁচায় বন্ধ হয়ে আছি, বিশেষ করে ইদানীং পরস্পরকে আমরা যখন ভালবাসি, তখন কেন আমরা পরস্পরের ছোঁয়া বাঁচিয়ে চলব? যোগ্য বয়স না হওয়া অব্দি কেন আমরা অপেক্ষা করব? কেন আমরা ও নিয়ে ভেবে মরব?

আমার ওপর খবরদারি করার ভার আমি নিজের কাঁধে নিয়েছি; পেটার কখনই আমাকে

দুঃখ বা বেদনা দেবে না। আমরা দুজনেই যদি তাতে সুখী হই, কেন আমি আমার হৃদয়ের হাত ধরে চলব না? এসব সত্ত্বেও, কিটি, আমার মনে হয় তুমি ধরতে পারছ যে, আমি দ্বিধার মধ্যে আছি। আমি মনে করি, আমার মধ্যে যে সততা আছে, সেটা লুকিয়ে চুরিয়ে কিছু করতে গেলে বেঁকে বসে। তোমার কি মনে হয় আমি কী করছি সেটা বাপিকে আমার বলা কর্তব্য? তোমার কি মনে হয় তৃতীয় কাউকে আমাদের এই গোপন ব্যাপারটা জানানো উচিত? এর মাধুর্য তাতে অনেকখানি নষ্ট হয়ে যাবে, কিন্তু আমার বিবেক তো তুষ্ট হবে? আমি ওর সঙ্গে এ নিয়ে আলোচনা করব। হ্যাঁ, আরও অনেক কিছু নিয়ে ওর সঙ্গে আমার কথা বলার আছে; কারণ, পরস্পরকে শুধু জড়াজড়ি করে কাজ হবে না। দুজনে কে কী ভাবছি, তার আদান-প্রদান হওয়া দরকার; তাতে বোঝা যাবে পরস্পরের প্রতি পরস্পরের কতটা বিশ্বাস আর আস্থা। আমরা দুজনেই এতে নিশ্চিতই লাভবান হব।

তোমার আনা।

মঙ্গলবার, ১৮ এপ্রিল, ১৯৪৪

আদরের কিটি,

এখানে সবই সুভালাভালি চলেছে। বাপি এইমাত্র বললেন যে, বিশ তারিখের আগেই রাশিয়া আর ইতালি দুদেশেই, এবং পশ্চিমেও, বড় রকমের যুদ্ধাভিযান শুরু হয়ে যাবে। এখান থেকে মুক্তি পাওয়ার কথা কল্পনা করা আমার পক্ষে দিন দিন দুষ্কর হয়ে উঠছে।

গত দশদিন ধরে পেটারের সঙ্গে যে আলোচনাটা কেবলই করব করব করছিলাম, কাল পেটারের সঙ্গে বসে সেটা সেরে ফেলা গেল। ওকে আমি মেয়েদের ব্যাপারগুলো সব খোলাসা করে বললাম এবং যা সবাইকে বলা যায় না এমন জিনিসও বলতে বাধল না। সন্ধ্যেটা শেষ হল দুজনে দুজনকে চুম্বন করে, আমার ঠিক হাঁ-মুখের পাশেই ওর ঠোঁটে, সে এক রমণীয় অনুভূতি। কখনও হয়ত আমার ডায়রি নিয়ে ওপরে উঠে যেতে পারি, একটি বার হলেও আমি চাই আরও গভীরে যেতে। দিনের পর দিন শুধু পরস্পরের বাহুবন্ধনে থেকে আমার সুখ হয় না, আমি মনেপ্রাণে চাই ওর সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করতে।

দীর্ঘ, বিলম্বিত শীতের পর আমাদের এখানে এখন অতুলনীয় বসন্ত; এপ্রিল মাস সত্যিই অসামান্য, খুব গরমও নয় আবার খুব ঠাণ্ডাও নয়। মাঝে মধ্যে ঝিরঝির করে বৃষ্টি। আমাদের চেস্টনাট গাছটা এরই মধ্যে বেশ সবুজাভ হয়ে উঠেছে, এমন কি তাকালে এখানে-সেখানে ছোট্ট ছোট্ট মুকুলও তোমার নজর আসবে।

শনিবার এলি এসে আমাদের যে কী খুশি করে গেলেন! এনেছিলেন চারগোছা ফুল, তিনগোছা নারগিস আর একগোছা কুমুদিনী– শেষেরটা আমার জন্যে।

আমাকে খানিকটা বীজগণিত করতে হবে, কিটি– এখন আসি।

তোমার আনা।

বুধবার, ১৯ এপ্রিল, ১৯৪৪

প্রিয় আমার,

খোলা জানলার ধারে বসে নিসর্গ সুখ অনুভব করা, পাখিদের গান শোনা, দুই গালে রোদ এসে পড়া আর তোমার বাহুডোরে এক প্রিয়জন– এর চেয়ে সুন্দর জিনিস পৃথিবীতে আর আছে নাকি? দুই হাত দিয়ে সে আমাকে ঘিরে রেখেছে– কী স্নিগ্ধ, কী প্রশান্ত সেই অনুভূতি;

ও আমার কাছে রয়েছে জেনেও মুখে আমার কোনো কথা নেই; জিনিসটা খারাপ নয়, কেননা এই অচঞ্চলতা কল্যাণকর। আর যেন কখনও কেউ এসে শান্তি ভঙ্গ না করে, এমন কি মুশ্চিও নয়।

তোমার আনা।

শুক্রবার, ২১ এপ্রিল, ১৯৪৪

আদরের কিটি,

গলা ছ্যানছেনে হওয়ায় কাল বিকেলে আমি বিছানায় শুয়ে ছিলাম, কিন্তু প্রথম দিন বিরক্ত হয়ে পড়েছিলাম এবং গায়ে জ্বর ছিল না বলে আজ ফের উঠে পড়েছি। ইয়র্কের মহামান্যা রাজকুমারী এলিজাবেথের জন্মদিন আজ। বি.বি.সি. বলেছে সাধারণত বয়ঃপ্রাপ্তির ঘোষণা রাজপুত্র-রাজকন্যাদের বেলায় করা হয় বটে, কিন্তু এলিজাবেথের ক্ষেত্রে সেটা এখনও করা হয়নি। আমরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করছিলাম, এই সুন্দরী কোন্ রাজকুমারের গলায় যে মালা দেবে! অনেক ভেবেও যোগ্য কোনো নাম আমরা মনে করতে পারলাম না। হয়ত এলিজাবেথের বোন মারগারেট রোজ্-এর সঙ্গে বেলজিয়ামের রাজকুমার বুদুইনের একদা বিয়ে হতে পারে। এখানে আমাদের দুর্ভাগ্যের অন্ত নেই। বাইরের দরজাগুলো মজবুত করতে না করতে ফের মালখানাদার এসে হাজির। যতদূর মনে হয়, এ লোকটিই আলুর গুঁড়ো গায়েব করে এখন এলির ঘাড়ে দোষ চাপাতে চাইছে। গোটা 'গুপ্ত মহল' আবার কেন খাপ্পা হয়েছে বোঝা যায়। এলি তো রেগে আগুন।

কোনো পত্রিকা বা কোথাও পাঠিয়ে দেখতে চাই আমার কোনো গল্প ওরা নেয় কিনা– পাঠাবো অবশ্যই ছদ্মনামে।

আবার দেখা হবে, প্রিয় আমার।

তোমার আনা।

মঙ্গলবার, ২৫ এপ্রিল, ১৯৪৪

আদরের কিটি

আজ দশদিন হল ফান ডানের সঙ্গে ডুসেলের ব্যাক্যালাপ নেই। তার একটাই কারণ সিঁদ কাটার পর থেকে নতুন বেশ কিছু নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, যাতে ডুসেলের অসুবিধে হচ্ছে। ডুসেল বলে বেড়াচ্ছেন যে, ফান ডান ওঁর ওপর চোটপাট করেছে।

ডুসেল আমাকে বললেন, 'এখানে যা হয় সব উল্টোপাল্টা। আমি যাচ্ছি, তোমার বাবাকে এ নিয়ে বলব।' শনিবার বিকেলগুলোতে আর রবিবারগুলোতে নিচের তলার অফিসে এখন আর ওঁর বসবার কথা নয়; কিন্তু তাও উনি দিব্যি বসছেন। ফান ডান চটে লাল, বাবা নিচের তলায় গিয়েছিলেন কথা বলতে। স্বভাবতই উনি বানিয়ে বানিয়ে অজুহাত দেখালেন, কিন্তু এবার এমন কি বাবাকেও বোকা বানাতে পারলেন না। বাবা এখন পারতপক্ষে ওঁর সঙ্গে কথা বলেন না, কারণ ডুসেল ওঁকে অপমান করেছিলেন। কি ভাবে আমরা তা কেউই জানি না। তবে খুবই যে খারাপ ভাবে তাতে সন্দেহ নেই।

আমি একটা সুন্দর গল্প লিখেছি। নাম 'ঠুলিরাম গবেষক'। যে তিনজনকে পড়ে শুনিয়েছি, তারা বেজায় খুশি।

তোমার আনা।

বৃহস্পতিবার, ২৭ এপ্রিল, ১৯৪৪

আদরের কিটি,

আজ সকালে মিসেস ফান ডানের এমন মেজাজ খারাপ ছিল কী বলব। কেবল নালিশ, কেবল নালিশ।

প্রথম তো ওঁর সর্দি; চুষবেন যে, সে ওষুধ পাচ্ছেন না এবং নাক ঝাড়তে ঝাড়তে ওঁর জান কয়লা। তারপর, রোদের দেখা নেই, ইত্যাদি, ইত্যাদি।

ওঁর কথায় আমরা না হেসে পারিনি; আমুদে বলে উনিও তাতে যোগ দেন। ঠিক এখন আমি পড়ছি গোটিঙ্গেন বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অধ্যাপকের লেখা 'সম্রাট পঞ্চম চার্লস'; বইটি তাঁর চল্লিশ বছরের পরিশ্রমের ফল।

পঞ্চাশ পৃষ্ঠা পড়তে আমার পাঁচদিন লেগেছে; তার বেশি পড়া সম্ভব নয়। ৫৯৮ পৃষ্ঠার বই; সুতরাং এখন হিসেব করলে জানতে পারবে বইটি শেষ করতে আমার কতদিন লাগবে– এর পর রয়েছে দ্বিতীয় খণ্ড। কিন্তু পড়তে খুব আগ্রহ লাগে।

মাত্র একদিনে একটি স্কুলের মেয়ের জ্ঞানলাভের একবার বহর দেখ। আমাকেই ধরো না কেন। প্রথমত, ডাচ থেকে নেলসনের শেষ লড়াই নিয়ে লেখা একটি রচনা আমি ইংরেজিতে তর্জমা করেছি। এরপর নরওয়ে (১৭০০–১৭২১), দ্বাদশ চার্লস, বলবান অগাস্টাস, স্তানিস্লাভ্স্ লেক্জিন্স্কি, মাৎসেপা, ফন গ্যোৎস, ব্রাণ্ডেনবুর্গ, পোমেরানিয়া আর ডেনমার্কের বিরুদ্ধে পিটার দি গ্রেটের যুদ্ধ এবং সেই সঙ্গে যেটির যা তারিখ।

এরপর অবতরণ করলাম ব্রাজিলে; পড়লাম বাহিয়া তামাক, কফির প্রাচুর্য এবং রিওদা-জানেরো, পের্নাম্বুকো আর সাও-পাউলোর পনেরো লক্ষ অধিবাসীদের কথা– সেই সঙ্গে আমাজন নদীর বৃত্তান্ত; নিগ্রো, মুলাটো, মেস্তিজো, শ্বেতাঙ্গ; জনসংখ্যার পঞ্চাশ শতাংশেরও বেশি নিরক্ষর; আর ম্যালেরিয়ার কথা।

হাতে তখনও সময় থাকায় চটপট একটা বংশপঞ্জীতে চোখ বুলিয়ে গেলাম। অগ্রজ ইয়ান, ভিলেম লোডাভিক, প্রথম আর্নস্ট্ কাসিমির, হেণ্ড্রিক কাসিমির থেকে নেমে এসে ক্ষুদে মারগ্রিট ফ্রান্সিসকা (ওটাওয়াতে ১৯৪৩ সালে জন্ম) পর্যন্ত।

বারোটায় চিলেকোঠায়, গির্জার ইতিহাস সংক্রান্ত পড়াশুনো চালিয়ে গেলাম– ফুঃ! বেলা একটা অবধি।

ঠিক দুটোর পর, বেচারা আবার বসল বই নেয়ে (হুঁ-উ, হুঁ-উ), এবার তার পড়ার বিষয় টিকোলো নাকের আর থ্যাবড়া নাকের বানর কুল। কিটি, বলো তো চটপট– জলহস্তীর পায়ে কয়টা করে আঙুল আছে।

তারপর বাইবেল এল, নোয়া আর নেওকোটি, শেম, হাম আর জাফেৎ! এরপর পঞ্চম চার্লস্। তারপর পেটারের সঙ্গে বসে– ইংরিজিতে থ্যাকারের 'দি কার্নেল'। ফরাসী ক্রিয়াপদগুলো আওড়ানোর পর মিসিসিপির সঙ্গে মিসৌরির তুলনা করলাম।

আমার সর্দি এখনও সারেনি; মারগট আর সেই সঙ্গে মা-মণি আর বাপিরও আমার ছোঁয়াচ লেগেছে। পেটারের এখন না রাগলেই বাঁচি। পেটার আমাকে ওর 'এল্‌ডোরাডো' বলে ডেকে একটা চুমো চেয়েছিল। অবশ্যই আমি পারিনি। ছেলেটা যা মজার। কিন্তু হলেও, ও আমার বড় প্রিয়।

আজ ঢের হয়েছে; থাক। আসি।

তোমার আনা।

শুক্রবার, ২৮ এপ্রিল, ১৯৪৪

আদরের কিটি

পেটার ভেসেলকে আমি স্বপ্নে দেখেছিলাম (জানুয়ারির গোড়ায় দেখ), কখনও ভুলিনি। সে কথা চিন্তা করলে আমি এখনও অনুভব করতে পারি সে আমার গালে গাল রেখেছে; যে সুন্দর অনুভূতিটা সব কিছু রাঙিয়ে দিয়েছিল আমি তখন যেন তা মনের মধ্যে ফিরে পাই।

পেটারের বেলায়ও মাঝে মাঝে আমার একই রকম অনুভূতি হয়, কিন্তু তার ব্যাপ্তি কখনই অতটা নয়। কাল অন্য ব্যাপার হল। রোজকার মতো হাত দিয়ে পরস্পরের কোমর জড়িয়ে আমরা ডিভানে বসে ছিলাম। তারপর হঠাৎ দেখি সাধারণ যে আনা সে সরে পড়েছে এবং এসে তার জায়গা নিয়েছে দ্বিতীয় আনা; এই আনা বেপরোয়া আর পরিহাসপ্রিয় নয়– এ শুধু চায় ভালবাসতে আর নম্র হতে।

আমি ওর গায়ে শক্ত সেঁটে রইলাম। আবেগের ঢেউ এসে আমার ওপর আছড়ে পড়ল, আমার চোখ দিয়ে ঝরতে লাগল অশ্রুর নির্ঝর, আমার বাঁ চোখের পানি গড়িয়ে পড়ল ওর মোটা সুতির জামায়, ডান চোখের পানি আমার নাক বেয়ে ওর গায়ে। ও কি টের পেয়েছিল? ও নড়ল না এবং এমন কোনো চিহ্নও দেখাল না যাতে ও টের পেয়েছে সেটা বোঝা যায়। কে জানে ও ঠিক আমার মতোই অনুভব করে কিনা! ও প্রায় কোনোই কথা বলেনি। ও কি জানে যে, ওর সামনে আনা আছে দুটো? এসব প্রশ্নের কখনই কোনো উত্তর মিলবে না।

সাড়ে আটটায় আমি উঠে পড়ে জানালায় গেলাম; আমরা সবসময় এই জায়গায় 'আসি' বলে বিদায় নিই। আমি তখনও কাঁপছিলাম, তখন আমি দুই নম্বর আনা। পেটার আমার দিকে আসতে আমি দুই হাতে ওর গলা জড়িয়ে ওর বাম গালে একটা চুমো এঁকে দিয়ে অন্য গালে চুমো খেতে যাব, এমন সময়ে আমার ঠোঁটে ওর ঠোঁট ঠেকে যাওয়ায় আমরা একসঙ্গে চাপ দিলাম। ঝট্ করে ঘুরে আমরা পরস্পরের আলিঙ্গনবদ্ধ হতে লাগলাম বার বার, কেউ কাউকে আমরা আর ছাড়তে রাজী নই। সত্যি স্নেহমমতা পেটারের এত বেশি দরকার। জীবনে সে এই প্রথম একটি মেয়েকে আবিষ্কার করেছে, এই প্রথম দেখেছে যে, এমন কি সবচেয়ে গা-জ্বালানো মেয়েদেরও একটা অন্য দিক থাকে, তাদের হৃদয় আছে এবং যখন তুমি তাদের নিয়ে একা থাকো তখন তারা অন্য মানুষ। পেটার জীবনে এই প্রথম স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে দিয়েছে এবং এর আগে কখনই তার ছেলে বা মেয়ে বন্ধু না থাকায় সে আসলে যা, সেটাকেই সে প্রকাশ করেছে। এবার আমরা পরস্পরকে খুঁজে পেয়েছি। বলতে কি, আমিও ওকে চিনতাম না; ওর যেমন কখনই কোনো বিশ্বস্ত বন্ধু ছিল না, তেমনি। আর আজ পানি কোথায় এসে গড়িয়েছে..

একটি প্রশ্ন আবারও আমাকে জ্বালিয়ে মারছে– 'এটা কি ঠিক? আমি যে এত আগে ধরা দিয়েছি, আমি যে এত উন্মত্ত, পেটার ঠিক নিজে যতটা উন্মত্ত আর ব্যাকুল ততটাই– এটা কি হওয়া উচিত? আমি-একজন মেয়ে হয়ে, নিজেকে কি এই পর্যায়ে টেনে নামাতে দিতে পারি?' এর একটাই উত্তর– 'আমি কত দীর্ঘদিন কত যে অপেক্ষা করেছি– আমি এত নিঃসঙ্গ– এতদিনে খুঁজে পেয়েছি সান্ত্বনা।'

সকালগুলোতে আমাদের আচরণ হয় মামুলি গোছের, বিকেলগুলোতে কম-বেশি তাই (ব্যতিক্রম শুধু মাঝে মধ্যে); কিন্তু সন্ধ্যেগুলোতে সারাদিনের চাপা বাসনা, পূর্বতন সময়গুলোর সুখস্মৃতি হুস্ করে ভেসে ওঠে এবং তখন আমাদের ভাবনায় দুজনের কাছে শুধু দুজন।

প্রতি সন্ধ্যার শেষে চুম্বনের পর আমার ভালো লাগে ছুটে পালাতে, ওর চোখের দিকে আর না তাকাতে– ভালো লাগে একা অন্ধকারে দূরে চলে যেতে।

সিঁড়ি ভেঙে নিচে নেমে আমি কিসের মুখে পড়ব? জ্বলজ্বলে আলো, কোথায় কেন, হোহো-হিহি; মুখের ভাব প্রকাশ না করে আমাকে সব গিলতে হবে। আনা আসলে নম্র, বাইরে সেটা বিশেষ দেখায় না; সুতরাং কারো তাড়ায় নিজেকে সে হঠাৎ পেছনে পড়ে যেতে দেবে না। একমাত্র আমার স্বপ্ন বাদে– পেটার ছাড়া আর কেউ এত গভীরভাবে আমার আবেগকে স্পর্শ করেনি। পেটার আমাকে একেবারে সম্পূর্ণভাবে কব্জা করে ফেলেছে; না বললেও এটা নিশ্চয়ই বোঝা যায় যে, এমন একটা ওলটপালটের পর সামলে ওঠার জন্যে যে কারো একটু বিশ্রাম এবং একটু সময় চাই।

পেটার গো, আমাকে এ কী করেছ তুমি? আমার কাছে তুমি কী চাও? এরপর কী আমাদের পরিণতি? এখন হ্যাঁ, এইবার আমি এলিকে বুঝতে পারছি। এখন নিজে আঙুল পুড়িয়ে বুঝতে পারছি এলির কেন সংশয়। আমি যদি আরও বড় হতাম এবং পেটার যদি আমাকে বিয়ে করতে চাইত, আমি তাকে কী উত্তর দিতাম? আনা, বুকে হাত দিয়ে তুমি বল। তুমি ওকে বিয়ে করতে পারতে না, কিন্তু এও ঠিক, ওকে ছাড়াও তোমার পক্ষে কঠিন হত। পেটারের এখনও আশানুরূপ চরিত্র নেই, নেই যথেষ্ট ইচ্ছাশক্তি, সাহস আর শক্তিও বড় কম। এখনও অন্তরের অন্তস্থলে সে একজন শিশু, আমার চেয়ে আদৌ বড় নয়। তার অন্বিষ্ট শুধু প্রশান্তি আর সুখ।

আমার বয়স কি মাত্র চৌদ্দ? আমি কি আদতে এখনও ইস্কুলের বেকুব ছোট্ট মেয়ে? আমি কি সব কিছু সম্পর্কে এতই আনাড়ি? খুব কম মিলবে যার আমার মতো এত অভিজ্ঞতা। আমার বয়সী বোধহয় এমন কাউকেই পাওয়া যাবে না যাকে আমার মত এতকিছুর ভেতর দিয়ে যেতে হয়েছে। নিজের সম্বন্ধে আমার ভয় হচ্ছে, আমি ভয় পাচ্ছি অধীর হয়ে পড়ে বড় তাড়াতাড়ি নিজেকে আমি দিয়ে ফেলছি। পরে অন্য ছেলেদের বেলায় কখনও এটা কি শোধরাবে? সমস্ত সময় নিজের হৃদয় আর যুক্তির সঙ্গে লড়াই চালিয়ে যাওয়া যে কী দুঃসাধ্য বলার নয়; সময় এলে যখন বলার প্রত্যেকে বলবে, কিন্তু আমি কি এ ব্যাপারে নিঃসন্দেহ যে, ঠিক সময়ই আমি বেছেছি?

তোমার আনা।

মঙ্গলবার, ২ মে, ১৯৪৪

আদরের কিটি

শনিবার সন্ধ্যেবেলায় পেটারকে আমি জিজ্ঞেস করি, বাপিকে আমাদের ব্যাপার কিছুটা জানানো আমার উচিত কিনা; খানিকটা আলোচনার পর এই মতে পৌঁছোয় যে, আমার জানানো উচিত। শুনে আমার ভালো লাগল, পেটার ছেলেটার মধ্যে সততা আছে। নিচে নেমে গিয়ে তৎক্ষণাৎ বাপির সঙ্গে আমি গেলাম খানিকটা পানি আনতে; সিঁড়িতে যেতে যেতে বাপিকে বললাম, 'বাপি তুমি হয়ত শুনেছ, পেটার আর আমি একসঙ্গে হলে আমরা দুজনের মধ্যে তেপান্তরের দুরত্ব রেখে বসি না। তুমি কি সেটা অন্যায় বলে মনে কর?' বাপি একটু চুপ করে থেকে তারপর বললেন, 'না, আমি অন্যায় মনে করি না। তবে তুমি একটু সাবধান হয়ো, আনা; এখানে এত বদ্ধ জায়গার মধ্যে তোমাদের থাকতে হয়'। যখন আমরা ওপরতলায় গেলাম, একই বিষয়ে উনি অন্য কয়েকটা কথা বললেন। রবিবার সকালে বাপি

আমাকে কাছে ডেকে নিয়ে বললেন, 'আনা, তোমার কথাটা নিয়ে আমি আরও খানিকটা ভেবে দেখলাম–' শুনেই তো আমার বুক টিপ টিপ করতে লাগল। 'এখানে এই বাড়িতে– সত্যি বলতে, ওটা ঠিক উচিত কাজ নয়। আমি ভেবেছিলাম তোমরা দুজনে দুজনের নিছক প্রাণের বন্ধু। পেটার কি প্রেমে পড়েছে?'

আমি বললাম, 'উঁহু, একেবারেই নয়।'

'তুমি জানো, তোমাদের দুজনকেই আমি বুঝি; কিন্তু এক্ষেত্রে তোমাকেই নিজের রাশ টেনে ধরতে হবে। অত ঘন ঘন তুমি ওপরে যেয়ো না, যতটা না দিলে নয় ততটাই ওকে উৎসাহ দেবে। এসব জিনিস ছেলেরাই সবসময় উদ্যোগী হয়; মেয়েরা তাকে ঠেকিয়ে রাখতে পারে। স্বাভাবিক অবস্থা হলে এসব কথা ওঠে না। যেখানে চলাফেরার স্বাধীনতা থাকে, সেখানে আর পাঁচটা ছেলেমেয়ের সঙ্গে দেখা হয়, কখনও কখনও দূরে কোথাও যেতে, খেলাধুলো করতে এবং আরও অনেক কিছু করতে পারো। কিন্তু এখানে, যদি কেবলই একসঙ্গে থাকো, কোথাও চলে যেতে চাইলে যেতে পারবে না; ঘণ্টায় ঘণ্টায় দুজনে দুজনকে দেখছ– বলতে গেলে অষ্টপ্রহর। নিজেকে বাঁচিয়ে চলো, আনা- এটাকে বড় বেশি গুরুত্ব দিও না।'

'আমি তা দিই না, বাপি। কিন্তু পেটার খুব ভদ্র ছেলে, সত্যিই খুব চমৎকার ছেলে।'

'হ্যাঁ, তা ঠিক। কিন্তু খুব একটা শক্ত ধাতুতে গড়া ছেলে সে নয়; যেমন সহজেই প্রভাব খাটিয়ে ওকে ভালোর দিকে নিয়ে যাওয়া যায়, তেমনি খারাপের দিকেও নিয়ে যাওয়া সম্ভব। ওর ভালোর জন্যে আমি আশাকরি ওর ভালো দিকটাই সব কিছু ছাপিয়ে উঠবে– কারণ, স্বভাবের দিক থেকে ও তাই।'

আমরা কিছুটা কথা বলার পর বাপি রাজী হলেন পেটারের সঙ্গেও এ নিয়ে কথা বলতে।

রবিবার সকালে পেটার আমাকে জিজ্ঞেস করল, 'তোমার বাবার সঙ্গে কথা বলেছ, আনা?'

আমি বললাম, 'হ্যাঁ। কী কথা হল বলছি। বাপি এ জিনিসটাকে খারাপ বলে মনে করেন না। কিন্তু ওঁর মতে, এখানে, সারাক্ষণ এত কাছাকাছির মধ্যে, সহজেই খটাখটি বেধে যেতে পারে।'

'কিন্তু মনে নেই, আমরা কথা দিয়েছিলাম কক্ষনো ঝগড়া করব না; আমি সে প্রতিজ্ঞা অক্ষরে অক্ষরে পালন করব।'

'আমিও কথা রাখব, পেটার। কিন্তু বাপির বক্তব্য তা ছিল না, উনি কেবল ভেবেছিলেন আমরা দুজনে প্রাণের বন্ধু; তোমার কি মনে হয়, এখনও আমরা তা হতে পারি?'

'আমি পারি– তুমি নিজের সম্পর্কে কী বলো?'

'আমিও পারি। বাপিকে আমি বলেছি তোমাকে আমি বিশ্বাস করি; বাপিকে যতটা বিশ্বাস করি ততটা। তোমাকে আমি আমার বিশ্বাসের যোগ্য বলে মনে করি; ঠিক নয়, পেটার?'

'আশা করি, ঠিক।' (পেটার খুব লজ্জা পেয়েছিল, মুখটা ওর রাঙা হয়ে উঠেছিল।)

আমি বলতে লাগলাম, 'তোমার ওপর আমার ভরসা আছে পেটার। আমি মনে করি তোমার অনেক সদ্‌গুণ আছে এবং জীবনে তুমি উন্নতি করবে।'

এরপর অন্যান্য বিষয় নিয়ে আলাপ করলাম। পরে বললাম, 'যখন আমরা এ জায়গা ছেড়ে যাব, আমি ভালো করেই জানি তখন আর আমাকে নিয়ে তুমি মাথা ঘামাবে না।'

পেটার দপ্‌ করে জ্বলে উঠল। 'মোটেই তা সত্যি নয়, আনা– মোটেই সত্যি নয়। আমার সম্বন্ধে তুমি এ রকম ভাববে, তা হয় না।'

এই সময় নিচের তলায় আমার ডাক পড়ল।

বাপি ওর সঙ্গে কথা বলেছেন। ও আমাকে আজ সে কথা বলল। ও বলল, 'তোমার বাবা বললেন আমাদের ভাব আজ হোক কাল হোক ভালবাসায় পরিণত হতে পারে।' তার উত্তরে আমি বললাম নিজেকে আমরা সংযত করে রাখব।

বাপি আজকাল সন্ধ্যেগুলোতে আমাকে ওপরে যেতে দিতে ততটা চান না। সেটা আমার মনঃপূত নয়। পেটারের সঙ্গে সময় কাটাতে আমার ভালো লাগে বলে শুধু নয়– আমি ওকে বলেছি যে, আমি ওকে বিশ্বাস করি। আমি ওকে যে বিশ্বাস করি তাতে ভুল নেই এবং সেটা আমি ওকে দেখাতেও চাই– আমি যদি বিশ্বাসের অভাবের দরুন নিচে বসে থাকি, তাহলে আর সেটা হয় না।

না, আমি যাচ্ছি।

ইতিমধ্যে ডুসেলের নাটকটা সুভালাভালি চুকে গিয়েছে। শনিবার সন্ধ্যেবেলা খাওয়ার টেবিলে সুললিত ডাচ ভাষায় ডুসেল তাঁর ভুলের জন্যে দুঃখ প্রকাশ করলেন।

ফান ডান তৎক্ষণাৎ সুন্দর ভাবে ব্যাপারটা মিটিয়ে নিলেন। ডুসেলের নিশ্চয়ই সারাটা দিন লেগে গিয়েছিল অন্তর থেকে ঐ ছোট্ট শিক্ষাটা মেনে নিতে।

রবিবার, ওঁর জন্মদিন, নির্ঝঞ্ঝাটে কেটে গেল। আমরা ওঁকে দিলাম ১৯১৯-এর এক বোতল ভালো পুরনো মদ, ফান ডানদের (এখনও ওঁদের উপহার দেওয়ার মুরোদ আছে) দেওয়া, এক বোতল আচার আর এক প্যাকেট দাড়ি কামানোর ব্লেড, ক্রালারের কাছ থেকে লেবুর জ্যাম এক বয়াম, মিপের দেওয়া একটি বই, 'ক্ষুদে মার্টিন' আর এলির কাছ থেকে একটি গাছের চারা। উনি আমাদের প্রত্যেককে একটি করে ডিম খাওয়ালেন।

আজ এ পর্যন্ত থাক। কাল আবার কথা হবে।

তোমার আনা।

বুধবার, ৩ মে, ১৯৪৪

আদরের কিটি,

প্রথম, কেবল সপ্তাহের খবরাখবর। রাজনীতি থেকে আমরা একটি দিন ছুটি পেয়েছি। ঢাক পিটিয়ে বলবার মত একেবারেই কোনো খবর নেই। এখন আমিও আস্তে আস্তে বিশ্বাস করতে আরম্ভ করেছি যে আক্রমণ আসছে। শত হলেও, রুশরা সব চেঁছেপুঁছে নিয়ে যাবে, সেটা ওরা হতে দেবে না। সেদিক থেকে ওরাও এক্ষুনি কিছু করছে না।

রোজ সকালে আজকাল আবার কুপহুইস আসছেন। পেটারের ডিভানের জন্যে উনি নতুন স্প্রিং আনিয়েছেন। কাজেই পেটারকে এখন খানিকটা ডিভানে গদি লাগানোর কাজ করতে হবে। ব্যাপারটাতে ও-যে মোটেই উৎসাহী নয়, সেটা বিলক্ষণ বোঝা যায়।

আমি কি তোমাকে বলেছি, বোখার পাত্তা পাওয়া যাচ্ছে না? যাকে বলে, একেবারে নিখোঁজ। গত সপ্তাহের বৃহস্পতিবারের পর থেকে ওর আর টিকি দেখা যায়নি। আমার ধারণা, ও এখন গঙ্গাপ্রাপ্ত হয়ে বেড়ালের স্বর্গে এবং কোনো জীবপ্রেমিক ওটা থেকে রসালো পদ বানিয়ে আস্বাদন করছে। হয়ত ওর চামড়ায় তৈরি ফারের টুপি কোনো ছোট মেয়ের মাথায় শোভা পাবে। পেটারের এই নিয়ে খুব মন খারাপ।

শনিবারের পর থেকে আমাদের দ্বিপ্রাহরিক খাবারের সময় বদলে সকাল সাড়ে এগারোটা করা হয়েছে; ফলে এক কাপ ভর্তি ডালিয়া খেয়ে আমাদের টিকে থাকতে হবে। এতে এক বেলার খাবার বাঁচবে।

তরিতরকারি এখনও খুব দুর্ঘট; আজ সন্ধ্যেবেলা আমাদের পচা লেটুসের পাতা সেদ্ধ খেতে হল। কাঁচা লেটুস পালংশাক আর লেটুস সেদ্ধ ছাড়া আর কিছু নেই। এর সঙ্গে আমরা খাচ্ছি পচা আলু, সুতরাং উপাদেয় মিশ্রণ।

সহজেই এটা কল্পনা করতে পারো যে, এখানে আমরা প্রায়ই সখেদে নিজেদের মধ্যে বলাবলি করি, 'যুদ্ধবিগ্রহে কী লাভ, বলো তো, কী লাভ? লোকে কেন শান্তিতে একসঙ্গে বসবাস করতে পারে না? এত সব ধ্বংসকাণ্ড কেন?'

খুবই যুক্তিসঙ্গত প্রশ্ন; কিন্তু এ পর্যন্ত কেউ এর কোনো সদুত্তর খুঁজে পায়নি। এটা ঠিক, কেন ওরা বানিয়ে চলেছে আরও আরও রাক্ষুসে প্লেন, আরও ভারী ভারী বোমা, আর একই সঙ্গে, পুনর্গঠনের জন্যে পূর্বনির্মিত ঘরবাড়ি? কেন যুদ্ধের জন্যে খরচ হবে রোজ কোটি কোটি টাকার আর চিকিৎসার খাতে, শিল্পীদের আর গরিব মানুষদের কপালে একটি কানাকড়িও জুটবে না?

পৃথিবীর এক প্রান্তে যখন বাড়তি খাবার পচে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, কেন তখন কিছু লোককে না খেয়ে মরতে হচ্ছে? মানুষের কেন এমন মাথা খারাপ?

শুধু বড় বড় লোক, রাষ্ট্রনায়ক আর পুঁজিপতিরাই যে এর জন্যে দায়ী, আমি তা মনে করি না। যে কেউকেটা, সেও সমান দায়ী– নইলে দুনিয়ার মানুষ অনেক দিন আগেই বিদ্রোহে ফেটে পড়ত। লোকের ভেতর একটা প্রবৃত্তি রয়েছে ভেঙেচুরে ফেলার, আছে মেরে ফেলার, খুন করার আর ক্ষিপ্ত হওয়ার প্রবৃত্তি; যতদিন ব্যক্তি নির্বিশেষে সমস্ত মনুষ্য সমাজে বড় রকমের পরিবর্তন না আসে, ততদিন যুদ্ধ হতেই থাকবে, যা কিছু গড়া হয়েছে, বাড়ানো আর ফলানো হয়েছে– সবই ধ্বংস আর বিকল হয়ে যাবে, তারপর মানুষকে সবকিছু আবার কেঁচেগণ্ডূষ করতে হবে।

আমি অনেক সময় ম্রিয়মাণ হই, কিন্তু কখনও মুষড়ে পড়ি না। আমাদের এই অজ্ঞাতবাসকে আমি এক বিপজ্জনক সাহসী কাজ বলে মনে করি, যা একাধারে রগুদার আর রসালো। আমার ডায়রিতে অভাব-অনটন নিয়ে যা কিছু সবই আমি রসিয়ে রসিয়ে লিখেছি। এখন আমি ঠিক করে ফেলেছি যে অন্য মেয়েদের চেয়ে আলাদা রকম জীবন আমি যাপন করব এবং এরপর আমার জীবন হবে সাধারণ বাড়ির বউদের চেয়ে পৃথক। আমার আরম্ভটাই হয়েছে এত মজাদার ভাবে যে, শুধু সেই কারণেই সবচেয়ে বিপজ্জনক মুহূর্তগুলোর কৌতুকময় দিকটা নিয়ে আমাকে হাসতেই হয়।

আমার বয়স কম এবং আমার মধ্যে নিহিত অনেক গুণ আছে; আমার আছে তারুণ্য আর শক্তি সামর্থ্য। আমার বেঁচে থাকাটাই একটা রোমাঞ্চকর অভিযান। আমি এখনও তার মাঝখানে রয়েছি এবং আমার পক্ষে সারাদিন গাঁইগুঁই করা সম্ভব নয়। হাসিখুশি স্বভাব, প্রচুর খোশমেজাজের ভাব আর দৃঢ়তা– এমন অনেক কিছুই আমি পেয়েছি। আমি ভেতরে ভেতরে যে বেড়ে উঠছি, মুক্তির দিন যে এগিয়ে আসছে, প্রকৃতি কী যে সুন্দর, চারপাশের মানুষজন কী যে ভালো, এই দুঃসাহসিক অভিযান যে কী মজাদার– এটা আমি প্রতিদিন অনুভব করছি! তাহলে আমার কী হয়েছে যে, আমি মুষড়ে পড়তে যাব?

তোমার আনা।

আদরের কিটি,

বাপি আমার ওপর প্রসন্ন নন; উনি ভেবেছিলেন রবিবারে ওঁর সঙ্গে আমার কথা হওয়ার পর আমি আপনা থেকেই রোজ সন্ধ্যেবেলা ওপরে যাওয়া ছেড়ে দেব। উনি চান কোনো 'গলা জড়াজড়ি' হবে না, কথাটা শুনলেই আমার পিত্তি জ্বলে যায়। এ নিয়ে বলাকওয়া করাটাই খারাপ, তার ওপর কেন উনি অমন বিশ্রী করে বলবেন? ওঁর সঙ্গে এ নিয়ে আজ আমি কথা বলব। মারগট আমাকে কিছু ভালো উপদেশ দিয়েছে। সুতরাং শোনো; মোটের ওপর আমি যা বলতে চাই তা এই–

'বাপি, আমার মনে হয় আমার কাছ থেকে তুমি একটা জবানবন্দী চাও; আমি তাই তোমাকে দেব। তুমি আমার কাছ থেকে আরও বেশি সংযম আশা করেছিলে, না পেয়ে আমার ওপর তুমি বীতশ্রদ্ধ হয়েছ। আমার ধারণা, তুমি চাও আমি চৌদ্দ বছর বয়সের খুকী হয়ে থাকি। কিন্তু সেইখানেই তোমার ভুল।

১৯৪২-এর জুলাই থেকে কয়েক সপ্তাহ আগে পর্যন্ত, সেই যবে থেকে আমরা এখানে আছি দিনগুলো আমার খুব সুখে কাটেনি। তুমি যদি জানতে, সন্ধ্যে হলে আমি কত যে কেঁদেছি, কত যে অসুখী ছিলাম আর কত যে নিঃসঙ্গ বোধ করেছি– তাহলে তুমি বুঝতে কেন আমি ওপরে যেতে চাই।

এখন আমি এমন এক পর্যায়ে পৌঁছেছি যখন আমি সম্পূর্ণভাবে নিজের ভরসায় বাঁচতে পারি– মা-মণি বা, সেদিক থেকে, আর কারো ওপরই আমাকে নির্ভর করতে হবে না। কিন্তু এ জিনিস রাতারাতি ঘটেনি; লড়াইটা হয়েছে কঠিন আর তীব্র এবং আজ এই যে আমি আত্মনির্ভর হয়েছি তার পেছনে আছে অনেক অশ্রুজল। তুমি আমাকে ঠাট্টা করতে পারো এবং আমার কথা বিশ্বাস করতে পারো, নাও করতে পারো, তাতে আমার কোনো ক্ষতি হবে না। আমি জানি আমার কাছে এক পৃথক ব্যক্তিসত্তা এবং তোমাদের কারো কাছে আমার একটুও কোনো দায় নেই। আমি তোমাকে এটা বলছি তার একটাই কারণ; না বললে পাছে তুমি আমাকে মনে-এক, মুখে-আর এক ভাবো। কিন্তু আমি কী করি না করি তার জমা-খরচ আর কাউকে আমার দেবার নেই।

'আমার কষ্টের সময় সবাই তোমরা চোখে ঠুলি আর কানে তুলো দিয়ে বসেছিলে, কেউ আমাকে সাহায্য তো করোই নি, উল্টে আঙুল নেড়ে বলার মধ্যে শুধু বলেছ আমি যেন হুড়মাতুনি না করি। যাতে সারাক্ষণ মুখ ভার করে থাকতে না হয় তারই জন্যে আমি হুড়মাতুনি করেছি। আমি গোঁয়ার্তুমি করেছি যাতে আমার ভেতরকার পরিত্রাহি স্বর সারাক্ষণ আমাকে শুনতে না হয়। দেড় বছর ধরে দিনের পর দিন আমি প্রহসন চালিয়ে গিয়েছি; গাঁইগুঁই করা, খেই হারিয়ে ফেলা, সেসব কখনও হয়নি– আর আজ, সে লড়াই আজ ফতে। আমার জিৎ হয়েছে। দেহে বলো, মনে বলো আমি এখন স্বাধীন। এখন আর আমার মায়ের দরকার নেই, এইসব ঠোকাঠুকি আমাকে পোক্ত করে তুলেছে।

'আর আজ, আমি আজ যখন এসব ছাড়িয়ে উঠেছি, আজ তখন জানি আমার যা লড়াই তা করেছি, সেই সঙ্গে এখন আমি চাই যাতে আমার নিজের রাস্তায় চলতে পারি, যে রাস্তা আমি ঠিক বলে মনে করি। আমাকে চৌদ্দ বছরের মেয়ে বলে মনে করলে চলবে না, কারণ এই সব কষ্ট দুঃখ আমার বয়স বাড়িয়ে দিয়েছে; আমি যা করেছি তার জন্যে আমি দুঃখবোধ করব না, বরং আমি যা পারি বলে মনে করি তাই করে যাব। বাপু-বাছা বলে আমার ওপরে

যাওয়া তুমি আটকাতে পারবে না; হয় তুমি সেটা নিষিদ্ধ করে দেবে, নয় আমাকে তুমি সর্ব অবস্থায় বিশ্বাস করবে, কিন্তু সেক্ষেত্রে আমাকে সেই সঙ্গে শান্তিতে থাকতে দিও?'

তোমার আনা।

শনিবার, ৬ মে, ১৯৪৪

আদরের কিটি,

কাল সন্ধ্যেবেলায় খেতে বসার আগে বাপির পকেটে আমি একটা চিঠি রেখে দিই; কাল তোমাকে যেসব জিনিস খোলাসা করে জানিয়েছিলাম, চিঠিতে সেই সবই লেখা ছিল। চিঠিটা পড়ার পর, মারগট বলল, বাপি নাকি বাকি সন্ধ্যেটা খুবই বিচলিত হয়ে কাটিয়েছেন। (আমি ওপরতলায় তখন বাসন মাজতে ব্যস্ত) বেচারা পিম, আমার জানা উচিত ছিল ঐ ধরনের চিঠির ফল কী দাঁড়াবে। এমনিতেই যা স্পর্শকাতর! সঙ্গে সঙ্গে পেটারকে বলে দিলাম ও যেন এ নিয়ে কিছু জিজ্ঞেস না করে বা কিছু না বলে। পিম আমাকে এ নিয়ে আর কিছু বলেননি। পরে বলার জন্যে তুলে রেখেছেন না কী?

এখানে সবকিছুই আবার কমবেশি স্বাভাবিক হয়ে এসেছে। বাইরে জিনিসের দরদাম আর মানুষজন সম্পর্কে যা সব শোনা যাচ্ছে তা প্রায় অবিশ্বাস্য। আধ পাউণ্ড চায়ের দাম ৩৫০ ফ্লোরিন (এক ফ্লোরিন আনুমানিক আটাশ সেন্টের মতো) এক পাউণ্ড কফি ৮০ ফ্লোরিন, মাখন এক পাউণ্ড ৩৫ ফ্লোরিন, ডিম একটি ১.৪৫ ফ্লোরিন। বুলগেরিয়ায় এক আউন্স কিনতে লাগে ১৪ ফ্লোরিন। প্রত্যেকেই কালোবাজারি করে; যে ছেলেরা ফাইফরমাশ খাটে তাদের প্রত্যেকের কাছেই কিছু না কিছু কিনতে পাওয়া যাবে। আমাদের রুটির দোকানের ছেলেটা খানিকটা রেশমের সুতো জুটিয়েছে, সেই সরু একগাছা সুতোর দাম ০.৯ ফ্লোরিন; যে লোকটা দুধ যোগায়, সে যোগাড় করে আনছে চোরাই রেশন কার্ড; যে লোকটা গোর দেয়, সে পৌঁছে দিচ্ছে পনির। দৈনিক চলছে বাড়িতে সিঁদ কাটা, মানুষ খুন আর চুরি। পুলিশ আর রাতের চৌকিদাররা দাগী আসামীদের মতোই আদাজল খেয়ে লেগেছে, প্রত্যেকেই তার খালি পেটে কিছু না কিছু ভরতে চায়। মজুরি বৃদ্ধি নিষিদ্ধ হয়ে যাওয়ায় লোকে ঠগবাটপারি করবে না তো কী করবে। রোজই পনেরো, ষোল, সতেরো এবং তারও বেশি বয়সের মেয়েরা বেপাত্তা হয়ে যাচ্ছে– তাদের খোঁজে পুলিস ক্রমাগত পাড়ি দিয়ে চলেছে।

তোমার আনা।

রবিবার সকাল, ৭ মে, ১৯৪৪

আদরের কিটি,

কাল বিকেলে বাপির সঙ্গে আমার বহুক্ষণ ধরে কথা হল। আমি প্রচণ্ড কাঁদলাম, বাপিও না কেঁদে পারেননি। জানো, কিটি, বাপি আমাকে কী বললেন? 'আমার জীবনে ঢের ঢের চিঠি পেয়েছি, কিন্তু এমন অরুচিকর চিঠি আর পাইনি। তুমি, আনা, মা-বাবার কাছ থেকে কম ভালবাসা পাওনি; তোমার মা-বাবা সব সময়ই তোমাকে সাহায্য করার জন্যে তৈরি, যে বিপদই আসুক তাঁরা সবসময় তোমাকে বুক দিয়ে রক্ষা করে এসেছেন– তাঁদের প্রতি কোনো দায়িত্ব বোধ করো না, এ কথা তুমি বলো কী করে? তুমি মনে করো তোমার প্রতি অন্যায় করা হয়েছে এবং তোমাকে পরিত্যাগ করা হয়েছে; না, আনা, আমাদের প্রতি তুমি খুবই অবিচার করেছ।

'হয়ত তুমি তা বলতে চাওনি, কিন্তু তুমি তা লিখেছ। না, আনা, তোমার কাছ থেকে এ ভর্ৎসনা আমাদের প্রাপ্য নয়।'

ইস, আমি ডাহা হেরে গিয়েছি। আমার জীবনে সবচেয়ে ওঁছা কাজ নিঃসন্দেহে এটাই। কেঁদেকেটে, চোখের পানি ফেলে আমি কেবল চেষ্টা করছিলাম দেখাতে, নিজেকে বড় বলে প্রতিপন্ন করতে, বাপি যাতে আমাকে মান্য করেন।

আমি অনেক দুঃখ পেয়েছি সন্দেহ নেই, কিন্তু যে পিম এত ভালো, যিনি বরাবর এবং আজও আমার জন্যে কী না করেছেন, তাঁকে দোষ দেওয়া– না, সেটা এত নীচ যে বলার নয়।

অগম্য পাদপীঠ থেকে একটি বার অন্তত আমাকে টেনে নামানো, আমার অহঙ্কারকে খানিকটা ডানা ধরে নাড়িয়ে দেওয়া– এটা ঠিক কাজ হয়েছে; কেননা নিজেকে নিয়ে আমি আবার অত্যন্ত বেশি রকম মাতামাতি করে ফেলছিলাম। মিস্ আনা যাই করে তাই সবসময় নির্ভুল নয়। অন্য কাউকে, বিশেষ করে যিনি ভালবাসেন বলেন, তাঁর মনে ব্যথা দেওয়া এবং তাও ইচ্ছে করে– কাজটা গর্হিত, অত্যন্ত গর্হিত।

বাপি যেভাবে আমাকে ক্ষমা করে দিলেন, তাতে নিজের সম্পর্কে আমি আরও বেশি লজ্জিত হলাম; চিঠিটা বাপি আগুনে ফেলে দেবেন; আমার সঙ্গে তিনি এমন মধুর ব্যবহার করলেন যে, মনে হল যেন তিনিই দোষ করেছিলেন। না, আনা, তোমাকে এখনও অনেক কিছু শিখতে হবে, অন্যদের তুচ্ছতাচ্ছিল্য করা আর দোষ দেওয়ার বদলে আগে সেই শেখার কাজ করো।

আমাকে দুঃখ পেতে হয়েছে বিস্তর; আমার বয়সী কাকে পেতে হয়নি? আমি ভাঁড়ও সেজেছি বিস্তর, কিন্তু ঠিক সজ্ঞানে নয়। নিজের সম্পর্কে আমার খুবই লজ্জিত হওয়া উচিত; আমি যথার্থই লজ্জিত।

যা হয়ে গেছে, আর তার চারা নেই। কিন্তু আর যাতে না হয়, তার ব্যবস্থা হতে পারে। আমি আবার গোড়া থেকে শুরু করতে চাই; পেটার রয়েছে, এখন আর সেটা শক্ত হবে না। ও যখন আমার সহায়, আমি পারব এবং করব।

আমি আর একা নই, পেটার আমাকে ভালবাসে। আমি পেটারকে ভালবাসি। আমার বই আছে, গল্পের বই আছে, ডায়রি আছে; আমি ভীষণ রকমের কুৎসিত নই, অসম্ভব বোকা নই; আমার হাসিখুশি মেজাজ; এবং আমি চাই ভালো রকম চরিত্রবল পেতে।

হ্যাঁ, আনা, তুমি এটা গভীরভাবে উপলব্ধি করেছ যে, তোমার চিঠিটা ছিল অত্যন্ত রূঢ় এবং সেই সঙ্গে অসত্য। তুমি তার জন্যে এমন কি গুমর করতে, ভাবো তো। আমি বাপিকে দৃষ্টান্ত হিসেবে নেব এবং আমি নিজেকে উন্নত করবই করব।

তোমার আনা।

সোমবার, ৮ মে, ১৯৪৪

আদরের কিটি,

আমাদের পরিবার সম্পর্কে তোমাকে কখনও কি সেভাবে কিছু বলেছি?

বলেছি বলে মনে হয় না; কাজেই এখন শুরু করব। আমার বাবার মা-বাবারা খুব বড়লোক ছিলেন। আমার ঠাকুরদা নিজের চেষ্টায় ছোট অবস্থা থেকে বড় হয়েছিলেন এবং আমার ঠাকুমা এসেছিলেন নামী পরিবার থেকে। ওঁরাও ছিলেন বড়লোক। সুতরাং কম বয়সে

বাপি ঐশ্বর্যের মধ্যে মানুষ হয়েছিলেন; ছিল হপ্তায় হপ্তায় পার্টি, বল নাচ, উৎসব-পরব, সুন্দরী সুন্দরী মেয়ে, ভূরিভোজ, বিরাট একটা বাড়ি, ইত্যাদি, ইত্যাদি।

মা-মণির মা-বাবারাও পয়সাওয়ালা ছিলেন এবং আমরা প্রায়ই হাঁ হয়ে যাই তখন শুনি বাগ্‌দান উপলক্ষে আড়াইশো লোকের পার্টি, ঘরোয়া বল নাচ আর ভূরিভোজের গল্প। আজ আমাদের কেউই আর বড়লোক বলবে না, আমার সব আশা যুদ্ধ শেষ হওয়া পর্যন্ত শিকেয় তুলে রেখেছি।

তোমাকে এই বলে দিলাম, মা-মণি আর মারগটের মত চিঁড়েচ্যাপটা আর কোণঠাসা হয়ে বাঁচতে আমি মেটেই ইচ্ছুক নই। আমার কী ইচ্ছে করে এক বছর প্যারিসে আর এক বছর লন্ডনে ভাষা নিয়ে আর আর্টের ইতিহাস নিয়ে পড়াশুনো করে আসতে। সেখানে মারগটের ইচ্ছেটা কী দেখ– ও চায় প্যালেস্টাইনে গিয়ে ধাত্রীবিদ্ হতে। আমি সবসময় সুন্দর পোশাক আর মজাদার লোক দেখার জন্যে হেদিয়ে মরি।

আমি চাই দুনিয়াটা একটু ঘুরে দেখতে এবং এমন সব জিনিস করতে যা আমার প্রাণ মাতাবে। এ জিনিস আগেও আমি তোমাকে বলেছি। আর সেই সঙ্গে কিঞ্চিৎ পয়সা এলে পোয়া বারো।

আজ সকালে মিপ্ বললেন, কাল উনি এক বাগ্‌দানের দাওয়াতে গিয়েছিলেন। হবু-বর আর হবু-বউ, দুজনই খুব পয়সাওয়ালা ঘরের।

আয়োজন হয়েছিল খুবই বড় মাপের। আমাদের জিভে পানি এসে যাচ্ছিল মিপ্ যখন খাবারের ফিরিস্তি দিচ্ছিলেন– মাংসের বড়া দিয়ে সব্জির সুপ, পনির টিকিয়া, সেই সঙ্গে ডিম আর রোস্ট বীফ দিয়ে করা রুচিবর্ধক, চিত্রবিচিত্র কেক, শরাব আর সিগারেট– যে যত খেতে পারে (কালোবাজারী)। মিপ্ মদ নিয়েছেন দশ দফা– শুনি এই ভদ্রমহিলাই নাকি মদ ছোঁন না? মিপ্‌ই যদি এই কাণ্ড করে থাকেন, ওঁর স্বামীটি তাহলে কত গ্লাস নামিয়েছেন? স্বভাবতই নিমন্ত্রিতরা সবাই খানিকটা মাতাল হয়েছিলেন। নিমন্ত্রিতদের মধ্যে ছিলেন ফাইটিং স্কোয়াডের দুজন পুলিস অফিসার; তাঁরা বাগ্‌দত্তদের ফটো তোলেন। মিপ্ তক্ষুনি ঐ দুজনের ঠিকানা লিখে নেন এই ভেবে যে, কখনও কিছু যদি হয় তো ঐ দুই ডাচ সজ্জনের সাহায্যে মিলতে পারে– এ থেকে বোঝা যায়, মিপ্ যখন যেখানেই থাকুন, আমাদের কথা ওঁর সবসময় মনে থাকে।

মিপের গল্পে আমাদের জিভে পানি এসেছিল। হায় রে, প্রাতরাশে আমাদের জোটে মাত্র দুই চামচ ডালিয়া; আমরা যাদের পেট এত খালি যে ক্ষিধের ভোঁচকানি লেগে যায়; আমরা যারা খেতে পাই– দিনের পর দিন শুধু আধসেদ্ধ পালং শাক (ভিটামিন বজায় রাখার জন্যে) আর পচা আলু; আমরা, যারা সেদ্ধ বা কাঁচা লেটুস, পালং এবং তারপর আবার পালং ছাড়া খালি পেটে দেবার আর কিছু পাই না। হয়ত এখনও পোপেইয়ের মতো পালোয়ান হয়ে ওঠার সময় আছে, কিন্তু বর্তমানে তার তো কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না।

মিপ্ যদি আমাদের নেমন্তন্ন বাড়িতে নিয়ে যেতেন, তাহলে অন্য অতিথিদের আর টিকিয়া খেতে হত না– আমরাই সব সাবাড় করে দিতাম। তোমাকে বলছি, মিপের চারধারে গোল হয়ে বসে আমরা যেন তাঁর মুখের প্রত্যেকটা কথা গিলছিলাম যেন, এত এত সুখাদ্যের কথা, এত এত চৌকশ লোকের কথা জীবনে কক্ষনো শুনিনি।

আর এঁরা হলেন কিনা লাখপতিদের নাত্‌নী। দুনিয়া এক আজব জায়গা।

তোমার আনা

মঙ্গলবার, ৯ মে, ১৯৪৪

আদরের কিটি,

আমার এলেন পরীর গল্পটা শেষ করেছি। চমৎকার নোট কাগজে গোটাটা কপি করেছি। বেশ সুন্দর দেখতে লাগছে, কিন্তু বাপির জন্মদিনে এটা কি সত্যই যথেষ্ট? আমি জানি না। মারগট, মা-মণি, দুজনেই ওঁর জন্যে কবিতা লিখেছে।

মিস্টার ক্রালার আজ বিকেলে ওপরতলায় এসে খবর দিয়ে গেলেন যে, মিসেস ব–, ব্যবসায় যিনি প্রদর্শিকা হিসেবে কাজ করতেন, তিনি রোজ মধ্যাহ্নের পর দুটোর সময় এখানে অফিস ঘরে তাঁর ডাব্বা এনে লাঞ্চ খাবেন। ভেবে দেখ! এরপর আর ওপরতলায় কেউ উঠে আসতে পারবে না, আলু যোগানো বন্ধ হবে, এলির লাঞ্চ খাওয়া হবে না, আমাদের শৌচাগারে যাওয়া চলবে না, আমাদের নড়াচড়া বন্ধ, ইত্যাদি ইত্যাদি। ভদ্রমহিলাকে ভাগাবার জন্যে আমরা যত রাজ্যের অবাস্তব সব ফন্দি আঁটতে লাগলাম। ফান ডান বললেন ওঁর কফিতে ভালোমত জোলাপ মিশিয়ে দিলেই যথেষ্ট কাজ হবে। উত্তরে কুপহুইস বলনে, 'না, আমি ব্যগ্রতা করছি ওটা করবেন না। তাহলে আর আমরা ডাব্বাটা কখনই ওখান থেকে সরাব না। মিসেস ফান ডান জিজ্ঞেস করলেন, 'ডাব্বা থেকে সরানো? তার মানে কী?' ওঁকে ব্যাখ্যা করে বলা হল। তখন উনি বোকার মতো জিজ্ঞেস করলেন, 'আমি কি ওটা সব সময় ব্যবহার করতে পারি?' এলি খিলখিল করে হেসে বলল, 'বোঝ ঠেলা। বিয়েনকর্ফ-এ (আমস্টার্ডামের একটা বড়ো দোকান) গিয়ে কেউ যদি জিজ্ঞেস করে, ওরা বুঝতেই পারবে না কী বলা হচ্ছে।'

ও, কিটি। কী চমৎকার আবহাওয়া আজ! শুধু যদি একটু বাইরে বেরোতে পারতাম!

তোমার আনা।

বুধবার, ১০ মে, ১৯৪৪

আদরের কিটি,

কাল বিকেলে চিলেকোঠায় বসে আমরা কিছুটা ফরাসী নিয়ে নাড়াচাড়া করছি, এমন সময় আমার পেছনে হঠাৎ ছ্যাড় ছ্যাড় করে পানি পড়তে লাগল। আমি পেটারকে জিজ্ঞেস করলাম, কী ব্যাপার? কোনো কথা না বলে পেটার ছুটে মটকায় উঠে গেল। সেখান থেকেই পানিটা আসছিল। পেটার ওপরে উঠে মুশ্চিকে জোরসে এক ঠেলা দিয়ে ওর স্বস্থানে সরিয়ে দিল। মাটির টব ভিজে বলে মুশ্চি ওটার পাশে গিয়ে বসেছিল। এই নিয়ে বেশ খানিকটা হল্লা আর চটাচটি হল। মুশ্চি ততক্ষণে তার কাজ সেরে সাঁ করে ছুটে নিচে চলে গেছে।

মুশ্চি ছোঁক ছোঁক করে তার টবের সমগোত্রীয় কিছু খুঁজতে গিয়ে কিছু কাঠের কুচি পেয়ে গিয়েছিল। তার ফলেই মটকায় ভাসাভাসি হয়ে তৎক্ষণাৎ তার ধারা, দুর্ভাগ্যক্রমে, চিলেকোঠায় আলুর পিপের মধ্যে আর আশপাশে গড়িয়ে গড়িয়ে পড়তে থাকে। সিলিং থেকে টপটপ করে চিলেকোঠার মেঝেতে পড়ে কোথায় কোন্ ফুটো ফাটা দিয়ে কয়েকটা হলদে ফোঁটা খাবার চায়ের টেবিলে রাখা ডাঁই করা মোজা আর কয়েকটা বইয়ের ওপর পড়ে। হাসতে হাসতে তখন পেটে খিল ধরে যাচ্ছে আমার, যাকে অট্টহাসি বলে তাই। একটা চেয়ারের নিচে মুশ্চি কুণ্ডলী পাকিয়ে বসে, পেটারের হাতে পানি, ব্লিচিং পাউডার আর ন্যাতা এবং ফান ডান চেষ্টা করছেন সবাইকে প্রবোধ দিতে। কিছুক্ষণের মধ্যেই বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়া গেল। কিন্তু বেড়ালের নোংরা পানিতে যে বিকট গন্ধ হয়, এটা সবাই জানে। আলুর

ক্ষেত্রে তা পরিষ্কার দেখা গেল এবং বাপি পোড়াবার জন্যে বালতি করে কাঠের যে কুচিগুলো এনেছিলেন, তারও একই দশা। বেচারা মুশ্চি। ছাইগাদা মেলা এখানে যে অসাধ্য, সেটাই বা তুমি জানবে কেমন করে?

তোমার আনা।

পুনশ্চ ঃ আমাদের প্রিয় মহারানী কাল আর আজ আমাদের উদ্দেশে বাণী প্রচার করেছেন। হল্যাণ্ডে যাতে শক্তি সঞ্চয় করে ফিরতে পারেন তার জন্যে তিনি অবকাশ যাপন করতে চলেছেন। শীগগিরই যখন আমি ফিরব, দ্রুত মুক্তি, বীরত্ব আর গুরুভার– এইসব শব্দ তিনি ব্যবহার করেন।

এরপর হয় জেরব্রাণ্ডির একটি বক্তৃতা। অনুষ্ঠান শেষ হয় ঈশ্বরের কাছে এক ধর্মযাজকের প্রার্থনা দিয়ে, তাতে তিনি বলেন, ঈশ্বর যেন ইহুদিদের, বন্দীনিবাসে জেলখানায় আর জার্মানিতে যারা আছে তাদের রক্ষা করেন।

তোমার আনা।

বৃহস্পতিবার, ১১ মে, ১৯৪৪

আদরের কিটি,

ঠিক এখন, আমার হাঁফ ফেলার সময় নেই। কথাটা তোমার কাছে পাগলামি বলে মনে হলেও, হাতের একগাদা কাজ কখন কিভাবে সারব ভেবে কূলকিনারা পাচ্ছি না। তোমাকে এই কাজগুলোর একটা সংক্ষিপ্ত ফিরিস্তি দেব কি? তাহলে শোনো। কালকের মধ্যে 'গালিলিও গ্যালিলি' বইটা আমাকে শেষ করতেই হবে, কেননা ওটা তাড়াতাড়ি লাইব্রেরিতে ফেরত দেওয়ার কথা। আমি কাল সবে শুরু করেছি, তবে এর মধ্যে ঠিক শেষ করে ফেলব।

পরের হপ্তায় আমাকে পড়তে হবে 'প্যালেস্টাইন অ্যাট্ দি ক্রস্‌রোডস্' আর 'গালিলি'র দ্বিতীয় খণ্ড। এরপর কাল আমি 'সম্রাট পঞ্চম চার্ল্‌স্'-এর জীবনীর প্রথম পর্ব পড়া শেষ করেছি এবং এ থেকে আমার সংগৃহীত সারনী আর বংশলতিকা তৈরির কাজ শেষ করতে হবে। এরপর বিভিন্ন বই থেকে যোগাড় করা যাবতীয় বিদেশী শব্দ পাঠ, আর লেখা রপ্ত করতে হবে। চার নম্বর হল, আমার চিত্রতারকারা সব তালগোল পাকিয়ে আছে এবং ওদের উদ্ধার করে গুছিয়ে না ফেললেই নয়। এইসব সারতে কয়েকটা দিন লেগে যাবে। যেহেতু প্রফেসর আনা, এই বলে এখনই ডাকা হচ্ছে, গলা পর্যন্ত কাজ– সেইজন্যে এই জট সহজে ছাড়বে না।

এরপর থেসেউস, অয়েদিপুস, পেলেউস, অরফেয়ূস, জাসন আর হারকুলিস– একে একে এদের সবাইকে পর পর সাজিয়ে ফেলতে হবে, কারণ পোশাকে নক্সা করা সুতোর মত আমার মনে এদের নানা ক্রিয়াকলাপ আড়া-তেরছা হয়ে আছে। মিরন আর ফিদিয়াসকে নিয়ে পড়ারও সময় এসেছে, যদি তাদের মধ্যে সঙ্গতি পেতে হয়। সাত আর নয় বছরের যুদ্ধ নিয়েও সেই এক ব্যাপার। এই হারে চললে সব খিচুড়ি পাকিয়ে যাবে। যার স্মৃতিশক্তির এই হাল তার আর করার আছে কী। ভেবে দেখ, যখন আমার আশী বছর বয়স হবে তখন আমি কি রকম বুড়ো হয়ে যাব!

এসব বাদে, ওহে, বাইবেল! এখনও কতদিন গেলে তবে গোসলরতা সুজানার দেখা পাব? সাডোম আর গোমোরার পাপকর্ম বলতে কী বোঝায়। ইস্, জানবার বুঝবার কত কী

যে আছে! ইতিমধ্যে ফাল্‌ৎস্‌-এর লিসোরোথকে তো আমি সম্পূর্ণ গাড্ডায় ফেলে রেখে দিয়েছি।

কিটি, দেখতে পাচ্ছ তো আমার কি রকম হাঁসফাঁস অবস্থা?

এবার একটা অন্য প্রসঙ্গ, তুমি অনেকদিন থেকে জান আমার সবচেয়ে বড় ইচ্ছে একদিন সাংবাদিক হওয়ার এবং পরে একজন নামকরা লেখক হওয়ার। মহত্ত্বের (নাকি উন্মত্ততার) দিকে এই ঝোঁক শেষ পর্যন্ত বাস্তবে দাঁড়ায় কিনা সেটা পরে দেখা যাবে, কিন্তু বিষয়বস্তুগুলো নিশ্চিন্তভাবে আমার মনে গাঁথা আছে। যেভাবেই হোক, 'হেট্‌ আখ্‌টেরহুইস' নাম দিয়ে একটা বই আমি যুদ্ধের পর প্রকাশ করতে চাই। পারব কি পারব না, বলতে পারছি না; তবে ডায়রিটা আমার খুব কাজে লাগবে। 'হেট আখ্‌টেরহুইস' ছাড়া আমার আরও নানা আইডিয়া আছে। তবে ওসব নিয়ে অন্য কোনো সময়ে আরও সবিস্তারে লিখব– যখন জিনিসগুলো আমার মনে আরও স্পষ্ট আকার নেবে।

তোমার আনা।

শনিবার, ১৩ মে, ১৯৪৪

প্রিয়তম কিটি,

কাল ছিল বাপির জন্মদিন। মা-মণি আর বাপির বিয়ে হয়েছে আজ উনিশ বছর। যে মেয়েটি নিচে কাজ করতে আসে সে ছিল না এবং ১৯৪৪ সালে এমন ঝকঝকে রোদ আর কখনও দেখা যায়নি। আমাদের বনখোর গাছে এখন ফুল ফুটেছে, ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া পাতায় গাছ এখন ভর্তি। গত বছরের চেয়েও গাছটাকে এবার বেশি সুন্দর দেখাচ্ছে।

বাপি পেয়েছেন কুপহুইসের কাছ থেকে লিনেয়াসের একটি জীবনবৃত্তান্ত, ক্রালারের কাছ থেকে একটি প্রকৃতিবিষয়ক বই, ডুসেলের কাছ থেকে 'জলপথে আমস্টার্ডাম'; ফান ডানের কাছ থেকে একটি বিশাল বাক্স, সুন্দর ভাবে মাজাঘষা করা এবং প্রায় পেশাদারের মতো সুসজ্জিত, তার ভেতর তিনটে ডিম, এক বোতল বীয়ার, এক বোতল দই, আর একটা সবুজ রঙের টাই। এর পাশে আমাদের দেওয়া এক পাত্র সিরাপ একেবারেই সামান্য। মিপ্‌ আর এলির কার্নেশনের চেয়ে গন্ধে মাত করেছিল আমার গোলাপ; কার্নেশনের গন্ধ না থাকলেও ফুলগুলো দেখতে ভারি সুন্দর ছিল। আদরে বাপির মাথা খাওয়ার ব্যবস্থা। পঞ্চাশটি চিত্র-বিচিত্র পেস্ট্রি এল। স্বর্গীয় ব্যাপার! বাপি নিজে হাতে আমাদের গুড়-আদায় তৈরি মশালাদার কেক দিলেন, ভদ্রলোকেরা পেলেন বীয়ার আর ভদ্রমহিলারা দই। খুব আমোদ-আহ্লাদ হল।

তোমার আনা।

মঙ্গলবার, ১৬ মে, ১৯৪৪

প্রিয়তম কিটি,

একঘেয়েমি কাটাবার জন্যে, তোমাকে মিস্টার আর মিসেস ফান ডানের মধ্যে কালকের এক ছোট্ট কথোপকথনের কথা বলব– এসব জিনিস অনেকদিন তোমাকে বলা হয়নি।

মিসেস ফান ডান– 'জার্মানরা নিশ্চয় আটলাণ্টিক প্রাচির খুবই শক্ত করেছে, ইংরেজদের ঠেকাতে ওরা যে সর্বশক্তি নিয়োগ করবে তাতে সন্দেহ নেই। জার্মানদের দূর্জয় শক্তি দেখে অবাক হয়ে যেতে হয়।'

মিস্টার ফান ডান– 'হ্যাঁ, সত্যি অবিশ্বাস্য রকমের!'

মিসেস ফান ডান– 'হ্যাঁ-আ!'

মিস্টার ফান ডান– 'জার্মানদের শক্তি এত বেশি যে, সব কিছু সত্ত্বেও, শেষ পর্যন্ত ওরা জিতবেই জিতবে।'

মিসেস ফান ডান– 'হতেই পারে, এর উল্টোটা হওয়ার ব্যাপারে এখনও আমি নিঃসন্দেহ নই।'

মিস্টার ফান ডান– 'আমি আর এর উত্তর দেব না।'

মিসেস ফান ডান– 'আমার কথার ওপর কথা তো তুমি বলোই; প্রত্যেকবারই আমাকে টেক্কা না দিয়ে তুমি পারো না।'

মিস্টার ফান ডান– 'নিশ্চয় না, তবে আমার উত্তরগুলো হয় যথাসম্ভব ছোট্ট।'

মিসেস ফান ডান– 'তাও উত্তর দিতে তুমি ছাড়ো না এবং মনে করো তুমি যা বলবে তাই ঠিক! তোমার ভবিষ্যদ্বাণী সব সময় সত্যি হয় না।'

মিস্টার ফান ডান– 'সেটা ঠিক নয়। ঠিক হলে গত বছরই সৈন্য নামত আর ফিন্‌রা এতদিনে লড়াই থেকে বেরিয়ে যেত। শীতের মধ্যেই ইতালি খতম, আর লেমবার্গ ইতিমধ্যেই রুশদের কব্জায়। উঁহু, উঁহু, তোমার ভবিষ্যদ্বাণীর ওপর আমার খুব ভরসা নেই।'

মিস্টান ফান ডান (উঠে দাঁড়িয়ে)– 'আর তোমাকে বকবক করতে হবে না। আমি যে ঠিক– একদিন তোমাকে তা দেখিয়ে দেব; আজ হোক কাল হোক, দেখবার অনেক কিছু পাবে। তোমার এই গজগজ করা স্বভাব আমার সহ্য হয় না। তোমার কাজ হল মানুষকে চটানো, নিজের কর্মদোষে একদিন তুমি ভুগবে।'

আমি সত্যি না হেসে পারি নি। মা-মণিও তাই। পেটার জোর করে ঠোঁট বন্ধ করে রেখেছিল। বড়রা এমন বেআক্কেল! ছোটদের সাতকাহান শোনাবার আগে ওঁদের উচিত নিজেদের হাতেখড়ির ব্যবস্থা করা।

তোমার আনা।

শুক্রবার, ১৯ মে, ১৯৪৪

আদরের কিটি,

কালকের দিনটা, খুবই বাজে গেছে। পেট ব্যথা এবং অকল্পনীয় যাবতীয় কষ্টে সত্যিই শরীরটা ভালো ছিল না। আজ আমি অনেক ভালো। চনচনে ক্ষিধে হয়েছে, তবে আজ আমাদের যে শিম রাঁধা হচ্ছে সেটা আমি মুখে দেব না।

পেটার আর আমার ব্যাপারটা নির্ঝঞ্ঝাটে চলেছে। পেটার বেচারার একটু ভালবাসা পাওয়া একান্তই দরকার– আমার চেয়েও বেশি। রোজ সন্ধ্যেবেলায় আসার সময় ওকে যখন একটি চুমো খাই, ও লজ্জায় লাল হয়ে ওঠে এবং আরেকটি একেবারেই চেয়েচিন্তে নেয়। ভাবি আমি ঠিকমত বোখার জায়গা নিতে পেরেছি কি তাতে দুঃখ নেই, ও যখন এটা জেনে খুশি যে ওকে কেউ ভালবাসার আছে।

অনেক কষ্টার্জিত জয়ের পর এখন গোটা অবস্থাটা আমার হাতে এসে গেছে। আমি মনে করি না, আমার ভালবাসায় ভাঁটা পড়েছে। ও খুব মিষ্টি ছেলে, কিন্তু তবু আমি চটপট আমার ভেতরের সত্তায় তালা লাগিয়ে গিয়েছি। ও যদি সে তালা ভাঙতে চায়, ওকে আগের চেয়ে ঢের বেশি রকম কাঠখড় পোড়াতে হবে।

তোমার আনা।

শনিবার, ২০ মে, ১৯৪৪

আদরের কিটি,

কাল সন্ধ্যেবেলায় চিলেকোঠা থেকে নিচে নেমে এসে ঘরে ঢুকতে গিয়ে দেখি কার্নেশন ফুলসুদ্ধ সুন্দর ফুলদানিটা মেঝেয় লুটোচ্ছে। মা-মণি হামাগুড়ি দিয়ে দিতে ন্যাতায় পানি মুচছেন আর মারগট মেঝে থেকে কয়েকটা কাগজ কুড়িয়ে নিচ্ছে।

আমি ভয়ে কাঁটা হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'কী হয়েছে এখানে?' এবং এমন কি উত্তরের জন্যে অপেক্ষা না করেই দূর থেকে ক্ষতির পরিমাণটা আঁচ করার চেষ্টা করলাম। আমার বংশপঞ্জীর পুরো ফাইল, খাতাপত্র, পড়ার বই সবকিছু ভিজে ঢোল। আমার তখন কাঁদো-কাঁদো অবস্থা এবং রাগে আর ক্ষোভে কী যে বলেছি না বলেছি আমার ছাই মনেও নেই। মারগটের কাছে শুনলাম আমি 'অপরিমেয় ক্ষতি', ভয়ঙ্কর, সাংঘাতিক, এ ক্ষতি কখনও আর পূরণ হবে না। এবং আরও কি সব নাকি বলেছিলাম। বাপি হাসি চাপতে পারেননি, মা-মণি আর মারগটও তাই। আমার মাটি হওয়া এত পরিশ্রম আর এত খেটে করা সারনীগুলো– তার জন্যে কিন্তু আমি অনায়াসে কাঁদতে পারতাম।

একটু খুঁটিয়ে দেখার পর বুঝলাম আমার 'অপরিমেয় ক্ষতি' আমি যতটা ভেবেছিলাম ততটা গুরুতর নয়। চিলেকোঠায় গিয়ে জুড়ে– যাওয়া পাতাগুলো বের করে সেগুলো আলাদা করে ফেললাম। তারপর সমস্ত কাগজ নিয়ে কাপড় শুকোবার তারে টাঙিয়ে দিলাম। দেখতে যা মজার হল কী বলব; আমি নিজেই না হেসে পারিনি। পঞ্চম চার্লস্, অরাঞ্জ-এর ভিলিয়াম আর মারী আঁতোয়ানেৎ এর পাশে মারিয়া দা মেদিচি। এ বিষয়ে মিঃ ফান ডানের রসিকতা হল– এটা একটা 'বর্ণবৈষম্যগত বলাৎকার'। আমার কাগজগুলোর ভার পেটারকে দিয়ে আমি নিচের তলায় ফিরে গেলাম।

বইগুলো উল্টেপাল্টে দেখছিল মারগট। ওকে আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'কোন্ বইগুলো নষ্ট হয়েছে?' মারগট বলল, 'বীজগণিত।' তাড়াতাড়ি ওর কাছে গিয়ে দেখলাম বীজগণিতের বইটাও নষ্ট হয়নি। ওটা ফুলদানির ভেতরে পড়লেই ভালো হত; ঐ বইটা আমি দুচক্ষে পড়ে দেখতে পারি না। সামনের দিকে কম করে বিশটি মেয়ের নাম, বইটা আগে যাদের ছিল। পুরনো ঝরঝরে বই, পাতাগুলো হলদে হয়ে এসেছে, পাতায় পাতায় হিজিবিজি লেখা আর কাটাকুটি। এরপর কখনও যদি আমার মেজাজ খুব বিগ্‌ড়ে যায়, বইটা আমি ছিঁড়ে কুটি কুটি করে ফেলব।

তোমার আনা।

সোমবার, ২২ মে, ১৯৪৪

আদরের কিটি,

২০শে মে মিসেস ফান ডানের সঙ্গে একটা বাজীতে বাপি হেরেছেন পাঁচ বোতল দই। আক্রমণ আজও হয়নি। এ কথা বললে অতিশয়োক্তি হবে না যে, সারা আমস্টার্ডাম, সারা হলান্ড, হ্যাঁ, একেবারে স্পেন পর্যন্ত ইউরোপের সারা পশ্চিম উপকূলে লোকে দিন রাত আক্রমণের কথা বলছে, তাই নিয়ে কথা কাটাকাটি করছে আর বাজী ধরছে আর... আশা করে আছে।

কী-হয় কী-হয় ভাবটা ক্রমশ চড়ছে। যাদের আমরা 'সাচ্চা' ডাচ বলে মনে করলাম তারা সবাই ইংরেজদের প্রতি বিশ্বাসে অটল আছে, মোটেই তা নয়; প্রত্যেকেই যে

ইংরেজদের ধোঁকা দেওয়াটাকে রণনীতির ক্ষেত্রে একটা ওস্তাদের মার বলে মনে করে, তাও নয়। আসলে লোকে শেষ পর্যন্ত দেখতে চায় কাজ, বড় দরের বীরত্বপূর্ণ কাজ। কেউই নিজের নাকের বাইরে কিছু দেখছে না, কেউ মনে করছে না ইংরেজরা তাদের নিজের দেশের জন্যে আর তাদের নিজ দেশবাসীর জন্যে লড়ছে; প্রত্যেকেই ভাবছে যত তাড়াতাড়ি পারে এবং যত ভালোভাবে পারে হল্যাণ্ডকে রক্ষা করাই ইংরেজদের কর্তব্য।

আমাদের জন্যে ইংরেজদের কিসের দায়? ডাচরা খোলাখুলি যে উদার সাহায্য চাইছে, সেটা তারা কী দিয়ে অর্জন করল? ডাচদের সেটা ভাবা ভুল হবে। ইংরেজরা যতই ধোঁকা দিয়ে থাকুক, অনধিকৃত ছোট বড় অন্য দেশগুলোর চেয়ে তাদের ঘাড়ে বেশি দোষ চাপানো ঠিক নয়। জার্মানি যখন নতুন করে নিজেকে অস্ত্র সজ্জিত করছিল, এটা আমরা অস্বীকার করতে পারি না যে, তখন অন্য সব দেশ, বিশেষ করে, যারা ছিল জার্মানির সীমান্তে, তারা সবাই নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছিল। সুতরাং ঐ বছরগুলেতে ইংরেজরা ঘুমোচ্ছিল বলে এখন যদি আমরা বকাঝকা করি, ওদের তার জন্যে ক্ষমা চাইতে ভারি বয়েই গেছে। উট পাখির মতো বালিতে মুখ গুঁজে থেকে আমাদের কোনোই লাভ হবে না। ইংল্যাণ্ড আর সারা দুনিয়া তা ভালোভাবে দেখেছে; সেই জন্যেই ইংরেজদের যে বিরাট ক্ষতি স্বীকার করতে হবে, সেটা অন্য কারো চেয়ে কিছু কম হবে না।

কোনো দেশই শুধু শুধু তার লোকবল খোয়াতে চায় না, অন্য কোনো দেশের স্বার্থে তো আদবেই নয়। ইংল্যাণ্ডও তা করবে না। স্বাধীনতা আর মুক্তি নিয়ে একদিন আক্রমণ এসে যাবেই; কিন্তু তার দিন ধার্য করতে ইংল্যাণ্ড আর আমেরিকা– সমস্ত অধিকৃত দেশ হাজার এক রা হয়েও তা পারবে না।

এটা শুনে আমরা আঁতকে উঠি আর ব্যথা পাই যে, অনেক জাতেরই আমাদের ইহুদিদের সম্বন্ধে মনোভাবের বদল হয়েছে। আগে শোনা যায়, ে সব মহলে কেউ কখনও ইহুদিবিদ্বেষের কথা ভাবতও না, এখন তাদের মধ্যে এ জিনিস লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এটা আমাদের সবাইকেই খুব ভাবিয়ে তুলেছে। ইহুদিদের প্রতি ঘৃণার কারণগুলো বোঝা যায়, এমন কি সময় সময় তা মানবিকও বটে, কিন্তু জিনিসটা ভালো নয়। খৃস্টানরা দোষ দিয়ে বলে যে, ইহুদিরা জার্মানদের কাছে গোপন তথ্য ফাঁস করে দিয়েছে; সাহায্যকারীদের প্রতি তারা বেইমানি করেছে; আরও অনেকের কপালে যা জুটেছে, সেই একই দুর্ভাগ্য বহু খৃস্টানকে বরণ করতে হয়েছে ইহুদিদের মারফত, এবং পেতে হয়েছে ভয়াবহ শাস্তি আর সাংঘাতিক পরিণতি।

এ সবই সত্যি। কিন্তু এসব জিনিস সব সময়ই দুই তরফা দেখা উচিত। আমাদের অবস্থায় পড়লে খৃস্টানরা কি অন্য রকমের আচরণ করত? পেট থেকে কি ভাবে কথা বের করতে হয় জার্মানরা তার কায়দা জানে। ইহুদি হোক, খৃস্টান হোক– কেউ যদি সম্পূর্ণ ভাবে ওদের মুঠোয় গিয়ে পড়ে, তাহলে সব সময় কি কথা না বলে থাকতে পারে? প্রত্যেকেই জানে, বাস্তবে তা অসম্ভব। কেন তাহলে লোকে ইহুদিদের কাছে এই অসম্ভবের দাবি করবে?

গুপ্তভাবে যারা কাজ করছে, তাদের মহলে গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে– যে সব জার্মান ইহুদি হল্যাণ্ড ছেড়ে এখন পোল্যাণ্ডে গিয়ে আছে, তাদের হয়ত এখানে ফিরতে দেওয়া হবে না; এক সময় তাদের হল্যাণ্ডে শরণাগতের অধিকার মিলেছিল, কিন্তু হিটলার চলে গেলে তাদের আবার জার্মানিতে ফিরে যেতে হবে।

এটা শুনলে স্বভাবতই তখন ভেবে অবাক লাগে, কেন আর আমরা এই দীর্ঘ আর কঠিন লড়াই চালিয়ে যাচ্ছি। আমরা সর্বদাই শুনছি আমরা নাকি সকলে কাঁধে কাঁধ দিয়ে স্বাধীনতা,

সত্য আর ন্যায়ের জন্যে লড়ছি। লড়াই করা অবস্থাতেই কি অনৈক্য মাথা চাড়া দেবে ইহুদির কদর কি আবারও আর কারো চোখে কম বলে গণ্য হবে? এটা দুঃখের, খুবই দুঃখের যে, আবারও, এই নিয়ে কতবার যে সেই পুরনো সত্যটি প্রমাণিত হল– 'একজন খৃষ্টান কিছু করলে তার জন্যে সে নিজে দায়ী, একজন ইহুদি কিছু করলে তার দায় সব ইহুদিদের ঘাড়ে পড়বে।'

সত্যি বলছি, এটা আমি বুঝি না– যে ডাচেরা মানুষ হিসেবে এত ভালো, সৎ, সাচ্চা। কেন তারা আমাদের এভাবে দেখবে? আমরা তো দুনিয়ার মধ্যে সবচেয়ে নিপীড়িত, সবচেয়ে অসুখী এবং বোধহয় সবচেয়ে ঘৃণিত মানুষ।

আমার একটাই আশা, এবং সেটা হল, এই ইহুদিবিদ্বেষের ব্যাপারটা থাকবে না, ডাচেরা দেখিয়ে দেবে তারা কী, এবং তারা কখনও টলমল করবে না আর ন্যায়বোধ হারাবে না। কেননা ইহুদিবিদ্বেষ অন্যায়।

যদি এই সাংঘাতিক হুমকি কার্যত সত্যি হয়, তাহলে ইহুদিদের এই অবশিষ্ট ছোট্ট দুঃখার্ত দলটিকে হল্যাণ্ড ছেড়ে চলে যেতে হবে। ছোট ছোট পোঁটলাপুঁটলি নিয়ে আমাদেরও আবার পাড়ি দিতে হবে, ছেড়ে যেতে হবে এমন সুন্দর দেশ, যা আমাদের একদিন সোৎসাহে স্বাগত জানিয়েছিল এবং আজ যা আমাদের দিকে পিঠ ফিরিয়েছে।

আমি হল্যাণ্ডকে ভালবাসি। আমার কোনো স্বদেশ না থাকায় আশা করেছিলাম এটাই হয়ত তবে আমার পিতৃভূমি। আমি এখনও সেটাই হবে বলে আশা রাখি।

তোমার আনা।

বৃহস্পতিবার, ২৫ মে, ১৯৪৪

আদরের কিটি,

প্রত্যেক দিনই তাজা কিছু। আজ সকালে আমাদের সব্জিঅলাকে তুলে নিয়ে গেল– ওর বাড়িতে নাকি দুজন ইহুদিকে ও থাকতে দিয়েছিল। এটা আমাদের পক্ষে একটা বড় আঘাত। শুধু এজন্যে নয় যে, ঐ দুই ইহুদি বেচারা রসাতলের কিনারায় এসে টাল সামলাতে চেয়েছে; ঐ লোকটার পক্ষেও এটা খুব মর্মান্তিক।

দুনিয়ার আজ ওলটপালট অবস্থা; যাঁরা নমস্য ব্যক্তি, তাঁদের পাঠানো হচ্ছে বন্দীনিবাসে, জেলখানায় আর নির্জন কুঠুরিতে; যারা নীচ, তারা থেকে গিয়ে আবালবৃদ্ধের, ধনী দরিদ্রের মাথায় ছড়ি ঘোরাচ্ছে। একজনের যদি ফাঁদে পা পড়ে কালোবাজার ঘুরে, তবে দ্বিতীয়জনের পড়ে অজ্ঞাতবাসে যাওয়া ইহুদি বা অন্য লোকদের সাহায্য করতে গিয়ে। স্থানীয় নাৎসীদের দলের লোক না হলে কবে যে কার কী হয় কেউ বলতে পারে না।

সব্জিঅলার চলে যাওয়া আমাদের খুব ক্ষতির কারণ হয়েছে। আমাদের ভাগের আলু টেনে তুলতে ছোট মেয়েরা পারে না। তাদের দেওয়াও হয় না। কাজেই একমাত্র উপায় খাওয়া কমানো। এটা আমরা কিভাবে করব বলছি। তবে তাতে কষ্টের কিছু লাঘব হবে না। মা-মণি বলছেন আমরা প্রাতঃরাশের পাট তুলে দেব। দুপুরে খাব ডালিয়া আর রুটি; সন্ধ্যের খাওয়াটা আমরা সারব ভাজা আলু এবং হয়ত সপ্তাহে দুবার সব্জি বা লেটুস দিয়ে। ব্যস্, আর কিছু নয়। এতে আমাদের পেটের ক্ষিধে মরবে না; কিন্তু ধরা পড়ে যাওয়ার চেয়ে সেও বরং ভালো।

তোমার আনা।

শুক্রবার, ২৬ মে, ১৯৪৪

আদরের কিটি,

শেষ পর্যন্ত অনেক কষ্টে জানালার ফোকরের সামনে আমার টেবিলে এসে নিরিবিলিতে বসতে পেরেছি। তোমাকে সব কিছু লিখে জানাব।

গত কয়েকমাসের মধ্যে নিজেকে কখনও এত মনমরা লাগেনি। এমন কি সিঁদকাটার ঘটনার পরও আমি সে সময়ে এখনকার মতো এতটা ভেঙে পড়িনি। একদিকে সব্জিঅলা, সারা বাড়িতে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আলোচিত ইহুদি সমস্যা, আক্রমনের বিলম্ব, অখাদ্য খাবার, দেহমনের ওপর ধকল, চারদিকের হতচ্ছাড়া আবহাওয়া, পেটার সম্পর্কে আমার আশাভঙ্গ; অন্যদিকে এলির বাগ্দানের ব্যাপার, হুইটসানের আদর অভ্যর্থনা, ফুল, ক্রালারের জন্মদিন, চিত্রবিচিত্র কেক আর সেই সঙ্গে ক্যাবারে, সিনেমা আর কনসার্টের গল্প। সেই পার্থক্য, সেই বিরাট পার্থক্য তো সব সময়ই আছে। একদিন আমরা হো হো করে হাসি, কোনো একটা অবস্থার মজার দিকটা ঠিক চোখে পড়ে; আবার ঠিক পরের দিনই আমাদের মুখ শুকিয়ে যায়; আমাদের মুখের মধ্যে ফুটে ওঠে ভয়, অনিশ্চয়তা আর হতাশ্বাস।

মিপ্ আর ক্রালারের মাথায় লুকিয়ে থাকা আটটি প্রাণীর গুরুভার চাপানো। মিপ্ যাই করুন তাঁর স্বপনে জাগরণে আমরা। ক্রালারের কাঁধে এত বিরাট দায়িত্ব যে, মাঝে মাঝে অতিরিক্ত চাপে মুখ দিয়ে তাঁর কথা বেরোয় না। কুপহুইস আর এলিও আমাদের ভালোভাবে দেখাশুনো করেন– তবে মাঝে মধ্যে তাঁরা কয়েক ঘণ্টা বা একদিন কিংবা এমন কি দুদিনের জন্যেও মাথা থেকে বোঝাটা তবু নামিয়ে রাখতে পারেন। ওঁদের সকলেরই নিজের নিজের সমস্যা আছে; কুপ্হুইসের স্বাস্থ্য ভালো নয়। এলির বাগ্দানের ব্যাপার, সেটা খুব একটা আশাব্যঞ্জক নয়। কিন্তু এ সত্ত্বেও ওঁরা একটু-আধটু কোথাও বেড়িয়ে আসতে পারেন, বন্ধুদের বাড়িতে টুঁ মারতে পারেন এবং তাছাড়া ওঁদের আছে সাধারণ মানুষের ষোলআনা জীবন। কিছু সময়ের জন্যে হলেও ওঁদের চোখের সামনে থেকে কখনও-কখনও অনিশ্চয়তার পর্দা সরে যায়। কিন্তু এই অনিশ্চয়তার হাত থেকে আমাদের এক মুহূর্তও রেহাই নেই। এখানে আমরা আছি আজ দুই বছর হল; এই অসহ্যপ্রায়, ক্রমবর্ধমান চাপের ভেতর আরও কতকাল আমাদের থেকে যেতে হবে?

মলনালী বুঁজে গেছে, কাজেই পানি ঢালা চলবে না, ঢাললেও যৎসামান্য; শৌচাগারে গেলে পায়খানার বুরুশ আমাদের সঙ্গে নিয়ে যেতে হয় এবং নোংরা পানি আমরা ওডিকোলনের একটা বড় পাত্রে জমা করে রাখি। আজকের দিনটা না হয় যো-সো করে কাটানো গেল, কিন্তু কাল যদি কলের মিস্ত্রি একা পেরে না ওঠে, তখন কী দশা হবে? পুরসভার সাফাই কর্মী তো মঙ্গলবারের আগে আসবে না।

মিপ্ একটা পুতুলের আকারের কিসমিস দেওয়া কেক পাঠিয়েছেন; তার গায়ে কাগজে লেখা 'শুভ হুইটসান'। এটা যেন আমাদের প্রায় ঠাট্টা করার মতো শোনাচ্ছে; আমাদের এখনকার মনের অবস্থা এবং আমাদের অস্বস্তির সঙ্গে 'শুভ' কথাটা একেবারেই বেমানান। সব্জিঅলার ব্যাপারটা আমাদের আরও বেশি ভয় পাইয়ে দিয়েছে, চারপাশে সবাই এখন আবার 'শ্ শ্, শ্ শ্' করছে এবং সব ব্যাপারেই আমরা এখন আগের চেয়ে চুপচাপ হয়ে গিয়েছি।

পুলিস ওখানে দরজা ভেঙে ঢুকেছে, আমাদের এখানেও তা করতে পারে। যদি একদিন আমাদেরও... না, আমি সেটা লিখব না, কিন্তু আজ আমি মন থেকে সেটা উড়িয়ে দিতে

পারছি না। উল্টে, এতদিন যে বিভীষিকার মধ্যে ছিলাম, আজ তা সমস্ত ভয়ঙ্করতা নিয়ে যেন আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

আজ সন্ধ্যে আটটায় নিচের তলায় আমাকে একেবারে একা পায়খানায় যেতে হল; নিচে তখন কেউ ছিল না, কেননা সবাই তখন রেডিও শুনতে ব্যস্ত।

আমি মনে সাহস আনার চেষ্টা করছিলাম, কিন্তু খুব কঠিন। ওপরতলায় সব সময়ই নিজেকে আমার নিরাপদ লাগে; নিচের তলার প্রকাণ্ড, নিঃশব্দ বাড়িটাতে একা একা আমার গা ছমছম করে; ওপরতলা থেকে ভুতুড়ে সব আওয়াজ, আমি একা; রাস্তা থেকে মোটরগাড়ির প্যাঁক প্যাঁক। আমাকে তাড়াতাড়ি সারতে হবে, কেননা ঐ অবস্থাটার কথা মনে হলেই আমার কাঁপুনি ধরে।

বার বার আমি নিজেকে জিজ্ঞেস করি– আমরা যদি অজ্ঞাতবাসে না যেতাম, এত দৈন্যদশার মধ্যে গিয়ে যদি আমরা এতদিনে মরে যেতাম, সেটাই কি আমাদের পক্ষে এর চেয়ে ভালো হত না? বিশেষ করে, আমাদের রক্ষাকর্তাদের তো আর এই বিপদের মধ্যে পড়তে হত না?

কিন্তু এইসব ভাবনা থেকে আবার আমরা নিজেদের গুটিয়ে নিই। কেননা এখনও আমরা জীবনের প্রতি আসক্ত; এখনও আমরা প্রকৃতির কণ্ঠস্বর ভুলে যাইনি, এখনও সবকিছু নিয়েই আমার আশা, এখনও আশা। শীগগিরই কিছু একটা ঘটবে বলে আমি আশা করি– দরকার হলে গুলি-গোলা; শুধু এই অস্থিরতাই আমাদের পিষে মারছে। কঠিন হলেও, যবনিকা পড়ুক; তাহলে আমরা অন্তত জানতে পারব শেষ পর্যন্ত আমরা জিতছি না হারছি।

তোমার আনা।

বুধবার, ৩১ মে, ১৯৪৪

আদরের কিটি,

শনি, রবি, সোম, মঙ্গল– এতদিন এত প্রচণ্ড গরম গেছে যে, কলম স্রেফ হাতে করতেই পারিনি। সেইজন্যে তোমাকে লিখে উঠতেই পারিনি। নর্দমাগুলো শুক্রবার আবার বিগড়ে যায়, ফের শনিবার ঠিক করে ফেলা হয়। বিকেলে কুপহুইস এসেছিলেন আমাদের দেখতে; কোরিকে নিয়ে অনেক সাতপাঁচ বললেন এবং জানালেন ইয়োপির সঙ্গে একই হকি ক্লাবে ও আছে।

রবিবারে এসে এলি দেখে গেলেন কেউ সিঁদ কেটে ঢুকেছিল কিনা; প্রাতঃরাশ পর্যন্ত এলি ছিলেন।

সুইট মানডেতে মিস্টার ফান সান্টেন গোপন আস্তানার পাহারাদারের কাজ করলেন এবং শেষ পর্যন্ত মঙ্গলবারে যাহোক জানলাগুলো খোলা গেল।

এমন সুন্দর, কবোষ্ণ, এমন কি গরমও বলা চলে, হুইটসান আগে কখনও দেখা যায়নি। এখানে এই 'গুপ্ত মহলে' গরম প্রচণ্ড; সংক্ষেপে তোমাকে আমি এই কবোষ্ণ দিনগুলোর বর্ণনা দিতে গিয়ে বলব এখানে কী ধরনের উপসর্গ দেখা দেয়।

শনিবার– সকালে আমরা সবাই একবাক্যে বললাম, 'বাহ্, কী চমৎকার আবহাওয়া।' বিকেলে যখন জানালাগুলো বন্ধ করতে হল, তখন বললাম, 'ইস্, এতটা গুমোট না হলেই ভালো হত।'

রবিবার– 'আর সহ্য করা যায় না, এই গরম। মাখন গলে যাচ্ছে, বাড়িতে এমন কোনো

জায়গা নেই যেখানে শরীর স্নিগ্ধ হয়, রুটিগুলো শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাচ্ছে, দুধ একটু বাদেই টকে যাবে, জানলাগুলো খোলা যাচ্ছে না; আমরা যত আঁস্তাকুড়ের ছাই এখানে দমবন্ধ হয়ে পচে মরছি আর অন্য লোকেরা হুইটসানের ছুটিতে দিব্যি মজা করছে।

সোমবার– মিসেস ফান ডান বলে চলেছেন, 'আমার পায়ে ব্যথা, গায়ে দেবার পাতলা জামা নেই। এই গরমে আর বাসন মাজতে পারি না।' এমন বিশ্রী দিন কী বলব।

এখনও গরম আমার ধাতে সয় না; তবু ভালো যে, জোরে হাওয়া বইছে। বলে কী হবে, রোদ এখনও চনচনে।

তোমার আনা।

মঙ্গলবার, ৫ জুন, ১৯৪৪

আদরের কিটি,

'গুপ্ত মহলে' নতুন ঝঞ্ঝাট, খুব তুচ্ছ বিষয় নিয়ে ডুসেলের সঙ্গে ফ্রাঙ্ক দম্পতির লেগেছে– মাখনের ভাগ নিয়ে। ডুসেল ঘাট মেনেছেন। মিসেস ফ্রাঙ্কের সঙ্গে এখন ওঁর খুব ভাব, ফষ্টিনষ্টি, চুমো খাওয়া এবং অমায়িক হাসিঠাট্টা।

ডুসেল স্ত্রীলোকের অভাব অনুভব করতে শুরু করেছেন। পঞ্চম বাহিনী রোম দখল করেছে। দুই পক্ষেরই স্থল ও বিমান বাহিনী শহরটিতে ভাঙচুর করা থেকে নিবৃত্ত হয়েছে এবং তার ফলে শহর অক্ষত আছে। সব্জি আর আলু শেষ হয়ে এসেছে। আবহাওয়া বিশ্রী। ফরাসী উপকূলে আর পা দে কালেতে প্রচণ্ড বোমাবর্ষণ হচ্ছে।

তোমার আনা।

মঙ্গলবার, ৬ জুন, ১৯৪৪

আদরের কিটি,

ইংরেজি খবরে বলা হল, 'আজ ডি-ডে' ঠিকই, 'আজ সেই দিনটি'ই বটে। আক্রমণ শুরু।

আজ সকাল আটটায় ইংরেজরা খবর দিল– কালে বুলোন, লে হাভ্‌রে, আর শেরবুর্গ, সেই সঙ্গে পা দে কালেতে (যেমন চলছিল) প্রচণ্ড বোমা ফেলা হয়েছে।

তাছাড়া নিরাপত্তার খাতিরে সব অধিকৃত রাজ্যে পঁয়ত্রিশ কিলোমিটার পরিধির মধ্যে উপকূলবর্তী সমস্ত অধিবাসীকে এই বলে সতর্ক করা হয়েছে যে, প্রচণ্ড বোমাবর্ষণের ব্যাপারে তাঁরা যেন তৈরি থাকেন। হলে, ইংজেররা এক ঘণ্টা আগে ওপর থেকে বিজ্ঞপ্তি ফেলবেন।

জার্মানদের খবর অনুযায়ী, ইংরেজ ছত্রীবাহিনী ফরাসী উপকূলে অবতরণ করেছে, ইংরেজদের অবতরণকারী জাহাজের সঙ্গে জার্মান নৌবহরের লড়াই চলছে– বি.বি.সি. থেকে বলা হয়েছে।

সকাল নয়টায় ঘরোয়া প্রাতঃরাশে এই বিষয়ে আমাদের কথা হল– এটা কি দুই বছর আগে দিয়েপের মত নিছক একটা পরীক্ষামূলক অবতরণ?

দশটায় ইংল্যাণ্ড থেকে জার্মান, ডাচ, ফরাসী এবং অন্যান্য ভাষায় বলা হল– 'আক্রমন শুরু করা হল!'– তার মানে, এটা আসল আক্রমণ। এগারোটায় ইংল্যাণ্ড থেকে জার্মান ভাষায় প্রচার করা হল, প্রধান সেনাপতি জেনারেল ডোয়াইট আইজ্‌নহাওয়ার ভাষণ দিলেন।

ইংল্যাণ্ড থেকে বারোটায় ইংরেজি খবরে বলা হল– 'আজই সেই দিন।' জেনারেল আইজ্‌নহাওয়ার ফরাসী জনগণের উদ্দেশে বললেন, 'এবার তুমুল লড়াই হবে, কিন্তু তারপর

আসবে জয়। ১৯৪৪ সাল পুরোপুরি বিজয়ের বছর; শুভমস্তু।'

ইংল্যাণ্ড থেকে একটায় ইংরেজিতে খবর (অনুবাদ)– ১১,০০০ বিমান প্রস্তুত, এবং না থেমে যাচ্ছে আর আসছে, উপকূলে অবতরণকারী সৈন্য এবং ব্যূহের পেছন থেকে আক্রমণ চলছে; ৪০০০ অবতরণকারী জাহাজ, তার সঙ্গে ছোট ছোট জলযান– তাতে করে শেরবুর্গ আর লে হাভ্‌রের মধ্যে অবিরত অবতরণকারী সৈন্য আর মালপত্র নামাচ্ছে। ইংরেজ আর মার্কিন সৈন্যরা ইতিমধ্যেই প্রচণ্ড যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়েছে।

জের্‌ব্রাণ্ডি, বেলজিয়ামের প্রধান মন্ত্রী, নরওয়ের রাজা হাকন, ফ্রান্সের দে-গোল, ইংল্যাণ্ডের রাজা এবং শেষে, কিন্তু সর্বোপরি, চার্চিল।

'গুপ্ত মহলে' খুব চাঞ্চল্য। এতদিন ধরে যা নিয়ে এত কথা হয়েছে, সেই বহু আকাঙ্ক্ষিত মুক্তি, যা এখনও কিন্তু অবিশ্বাস্য, বড় বেশি কল্পিত বলে মনে হয়– সেই মুক্তি সত্যিই কি আসবে? ১৯৪৪ সালেই কি আমাদের জয়ের আশা পূর্ণ হবে?

এখনও জানি না, তবে আমাদের মনে আবার আশা জেগেছে। মনে নতুন বল পেয়ে আমরা শরীরে আবার শক্তি পাচ্ছি।

সব ভয়, সব কষ্ট আর লাঞ্ছনার সামনে আমাদের সাহসে বুক বেঁধে দাঁড়াতে হবে; তার জন্যে এখন আমাদের ধীর-স্থির আর অবিচলিত থাকতে হবে। এখন আমাদের আরও বেশি দাঁতে দাঁত দিয়ে থেকে কান্না চেপে রাখতে হবে। ফ্রান্স, রাশিয়া, ইত্যাদি আর জার্মানিও হাঁউমাউ করে সকলে তাদের আর্তির কথা জানাতে পারে– শুধু আমরাই এখনও সে অধিকার থেকে বঞ্চিত।

জানো কিটি, এই আক্রমণের সবচেয়ে ভালো ব্যাপার হল এই যে, আমি মনে-প্রাণে বুঝছি বন্ধুরা আসছে। ঐ ভয়ঙ্কর জার্মানরা এতদিন এমন ভাবে আমাদের ওপর অত্যাচার করেছে, আমাদের গলায় ছুরি ঠেকিয়ে রেখেছে যে, আজ বন্ধুদের কথা আর মুক্তির কথা ভাবতে পেরে মনের মধ্যে ভরসা জাগছে।

এটা আর এখন ইহুদিদের ব্যাপার থাকছে না; হল্যাণ্ড আর সারা ইউরোপের ভাগ্য আজ এর সঙ্গে জড়িত। মারগট বলছে, আমি হয়ত এই সেপ্টেম্বরে বা অক্টোবরেই আবার ইস্কুলে ফিরে যেতে পারব।

তোমার আনা।

পুনশ্চঃ আমি তোমাকে যখনই যা নতুন খবর হবে জানাব।

শুক্রবার, ৯ জুন, ১৯৪৪

আদরের কিটি,

আক্রমণের ব্যাপারে জবর খবর। মিত্রপক্ষ ফরাসী উপকূলের একটি ছোট গ্রাম বাইয়ু দখল করেছে; এখন তারা কায়েন দখল করার জন্যে লড়ছে।

এটা পরিষ্কার যে, যেখানে শেরবুর্গ অবস্থিত সেই উপদ্বীপটি তারা বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টায় আছে। রোজ সন্ধ্যেবেলায় সামরিক সংবাদদাতারা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে খবর দেন; সৈনবাহিনীর লোকদের কী কী অসুবিধে, তাদের সাহসিকতা আর উৎসাহ উদ্দীপনা সম্পর্কে তাঁরা বলেন।

শুনলে বিশ্বাস হতে চায় না এমন সব খবর তাঁরা যোগাড় করেন। জখম হয়ে যারা ইংল্যাণ্ডে ফিরেছে তাদেরও কেউ কেউ রেডিওতে বলেছে। আবহাওয়া খারাপ হওয়া সত্ত্বেও

বিমানবাহিনীরা সারাক্ষণ আকাশে টহল দিচ্ছে। বি.সি.সি-র খবরে শুনলাম আক্রমণ শুরু হওয়ার দিন সৈন্যদের সঙ্গে চার্চিল অবতরণ করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু আইজ্‌নহাওয়ার আর অন্য জেনারেলরা ওঁকে নিবৃত্ত করেন। বয়স সত্তর তো হবেই– বলিহারি সাহস এখনও লোকটার।

এখানে উৎসাহের ধার এখন একটু কমে এসেছে; তবু আমরা সবাই আশা করছি যে এ বছরের শেষাশেষি যুদ্ধ মিটে যাবে।

ওর কাছাকাছি সময়ই হবে। মিসেস ফান ডানের কুঁই কুঁই শুনে শুনে কান ঝালাপালা; কবে আক্রমণ হবে এই বলে বলে মাথা তো আমাদের এতদিন খারাপ করে দিয়েছেন, এবার শুরু করেছেন কী খারাপ আবহাওয়া বলে সারাদিন ঘ্যানর ঘ্যানর করে আমাদের মাথার পোকা বের করে ফেলা। ওঁকে যদি এক বালতি ঠাণ্ডা পানির মধ্যে বসিয়ে মট্‌কায় তুলে রেখে দিয়ে আসা যেত তো ভালো হত।

ফান ডান আর পেটার ছাড়া গোটা 'গুপ্ত মহল' তিন খণ্ডের 'হাঙ্গেরীয় পালা' পড়ে ফেলেছে। এই বইটি হল সুরকার, কলাবিৎ এবং শিশু বয়সেই বিস্ময়কর প্রতিভা ফান্‌ৎস্ লিস্‌ৎ-এর জীবন ইতিহাস।

বইটা খুবই সুপাঠ্য, কিন্তু আমার মতে এতে স্ত্রীলোকদের কথা একটু বেশি। লিস্‌ৎ শুধু যে শ্রেষ্ঠ আর প্রসিদ্ধতম পিয়ানোবাদক ছিলেন তাই নয়, সেই সঙ্গে ছিলেন সবচেয়ে রমণীমোহন ব্যক্তি– সত্তর বছর বয়স অবধি। তিনি সহবাস করেছেন রাজকুমারী মারি দাগুল্‌ড়, মহারাজকুমারী ক্যারোলিন সাইন-ভিট্‌গেনস্টাইন, নর্তকী লোলা মোনেৎস, পিয়ানো-বাজিয়ে আগ্‌নেস কিংওয়ার্থ, পিয়ানো-বাজিয়ে সোফি মেন্টার, মহারাজকুমারী ওল্‌গা ইয়ানিনা, লেডি ওল্‌গা মেয়েনডফ্‌, অভিনেত্রী লিলা কী যেন, ইত্যাদি, ইত্যাদি এতজনের সঙ্গে যে বলে শেষ করা যাবে না। বইয়ের যেসব অংশে সঙ্গীত আর শিল্পের আলোচনা আছে, সে জায়গাগুলো অনেক 'বেশি সুন্দর। বইতে যাঁদের উল্লেখ আছে, তাঁদের মধ্যে রয়েছেন শুমান, ক্লারা ভীক্‌, হেক্টর বের্লিওৎস্‌ য়োহানেস ব্রাম্‌স্‌, বীঠোফেন, য়োআকিম, রিখার্ড ভাগ্‌নার হান্‌স্‌ ফন্‌বুলো, আন্তন রবিন্‌শ্‌তিন, ফ্রাদারিক শোপাঁ, ভিক্তর উগো, ওনোরা দে বালজাক, হিলার, হুমেল, চের্নি, রসিনি, চেরুবিনি, পাগানিনি, মেণ্ডেল্‌স্‌জোন, ইত্যাদি, ইত্যাদি।

লিস্‌ৎ মানুষটি ছিলেন খুব ভালো, খুব দিলদরাজ লোক। নিজের সম্পর্কে ছিলেন বিনম্র, যদিও তাঁর ছিল অত্যধিক দেমাগ। তাঁর কাছে যে আসত তাকেই তিনি সাহায্য করতেন। শিল্পকলা ছিল তাঁর প্রাণ, কনিয়াক আর স্ত্রীলোক বলতে তিনি পাগল, কারো চোখের পানি সহ্য করতে পারতেন না, বিলক্ষণ ভদ্রলোক ছিলেন, কাউকে কোনো উপকার করতে উনি অরাজী হতেন না, টাকাপয়সার ব্যাপারে ভ্রূক্ষেপ করতেন না, ভালবাসতেন ধর্মীয় স্বাধীনতা আর বিশ্বমুক্তি।

তোমার আনা।

মঙ্গলবার, ১৩ জুন, ১৯৪৪

আদরের কিটি,

আরও একটা জন্মদিন চলে গেল। কাজেই এখন আমি পঞ্চদশী। বেশ অনেক উপহার পেলাম। স্প্রেঙারের 'চারুকলার ইতিহাসে'র পুরো পাঁচ খণ্ড, একপ্রস্থ অন্তর্বাস, একটি রুমাল,

দুই বোতল দই, গুড়-আদায় তৈরি মশলাদার কেক, আর মা-মণি ও বাপির কাছ থেকে এটি উদ্ভিদতত্ত্বের বই, মারগটের কাছ থেকে জোড়া ব্রেসলেট, ফান ডানদের কাছ থেকে একটা বই, ডুসেলের কাছ থেকে নকুলদানা, মিপ্ আর এলির কাছ থেকে টফি আর খাতা এবং সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য, ক্রালারের দেওয়া বই 'মারিয়া তেরেসা' এবং তিন টুকরো মালাইদার পনীর। পেটারের কাছ থেকে একগুচ্ছ সুন্দর স্বর্ণালী ঝুমকো ফুল; বেচারা অনেক চেষ্টা করেছিল আর কিছু দিতে, কিন্তু ওর কপাল খারাপ।

অতি জঘন্য আবহাওয়া, থেকে থেকে দমকা বাতাস, ঝমঝম করে বৃষ্টি, ফুলে ফুলে ওঠা সমুদ্র– এ সত্ত্বেও আক্রমণ সংক্রান্ত খবর এখনও খুব ভালো।

কাল চার্চিল, স্মাট্স্, আইজ্‌ন্‌হাওয়ার আর আর্নল্ড ফ্রান্সের অধিকৃত আর মুক্ত গ্রামগুলো দেখতে গিয়েছিলেন। চার্চিল যে টর্পেডো-বোটে ছিলেন তা থেকে উপকূলে গোলা ছোঁড়া হয়।

ওঁকে মনে হয় আরও অনেকের মতো উনি ভয় কাকে বলে জানেন না– সত্যি, দেখে আমার হিংসে হয়। এই গুপ্ত ঘরে থেকে আমাদের পক্ষে বোঝা শক্ত, বাইরে লোকে এই খবরটাকে কি ভাবে নিয়েছে।

লোকে নিঃসন্দেহে এতে খুশি যে, দীর্ঘসূত্রী(?) ইংরেজরা আস্তিন গুটিয়ে এবার কিছু একটা কাজে নেমে পড়েছে। যেসব ডাচ এখনও ইংরেজদের তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে, ইংল্যাণ্ডকে আর তার বৃদ্ধদের সরকারকে উপহাস করে, ইংরেজদের ভীতুর জাত বলে, অথচ জার্মানদের ঘৃণা করে– এবার তাদের টনক নড়া উচিত। হয়ত এই ঘটনায় এবার তাদের কানে কিছুটা পানি ঢুকবে।

গত দুই মাসের ওপর আমার ঋতু বন্ধ ছিল; অবশেষে শনিবার থেকে আবার তা শুরু হয়েছে। এত সব ঝঞ্ঝাট আর অশান্তির মধ্যেও আমাকে যে আর হাতশায় ফেলেনি, তাতেই আমার আনন্দ।

তোমার আনা।

বুধবার, ১৪ জুন, ১৯৪৪

আদরের কিটি,

এত ইচ্ছে আর এত রকমের ভাবনা, অভিযোগ আর তিরস্কার আমার মাথায় তাড়া করে ফিরছে। লোকে আমাকে যতটা মনে করে আমি সত্যিই ততটা দাম্ভিক নই। নিজের দোষক্রটিগুলো আমি অন্যদের চেয়ে ঢের ভালো করে জানি। তবে তফাত এই, আমি এও জানি যে, আমি ভালো হতে চাই, আমি নিজেকে উন্নত করব এবং ইতিমধ্যে আমার দোষক্রটি অনেকখানি কাটিয়ে উঠতে পেরেছি।

আমি নিজেকে জিজ্ঞেস করি, কেন তাহলে প্রত্যেকে এখনও ধরে নেয় যে, আমি সাংঘাতিক ঝানু আর ট্যাটা? আমি সত্যিই কি ঝানু? নাকি আমি সত্যিই তাই, আর ওরা হয়ত তা নয়? ব্যাপারটা যেন কেমন-কেমন, এখন মনে হচ্ছে, কিন্তু শেষ বাক্যটা আমি কাটছি না, কেননা প্রকৃতপক্ষে ওটা ততটা উদ্ভট চিন্তা নয়। প্রত্যেকেই জানে, যিনি আমার বিরুদ্ধে অন্যতম প্রধান অভিযোগকারী, সেই মিসেস ফান ডানের বুঝ-সমঝের একান্ত অভাব। আরও সরল করে বললে, বলতে হয় 'নির্বোধ'। অন্যেরা যদি বেশি ধারে কাটে, নির্বোধ লোকদের সেটা আবার সহ্য হয় না।

মিসেস ফান ডান আমাকে নির্বোধ ভাবেন এই কারণে যে– ওঁর মত আমার বুদ্ধিসুদ্ধির অভাব নেই; উনি আমাকে ট্যাঁটা ভাবেন এই কারণে যে উনি এমন কি আমার চেয়েও বেশি ট্যাঁটা। উনি ভাবেন আমার পোশাকগুলো খুব টেঁটি, তার কারণ ওঁর গুলো আরও টেটি। এবং সেই কারণেই উনি আমাকে ঝানু ভাবেন, কেননা যে বিষয়ে ওঁর বিন্দুমাত্র জ্ঞান নেই সে বিষয়েও ফোড়ন কাটার ব্যাপারে উনি আমার ঘাড়ে হাগেন। অবশ্য আমার একটা প্রিয় প্রবচন হল, 'ধোঁয়া থাকলেই আগুন থাকবে' এবং আমি সত্যিই কবুল করছি যে, আমি ঝানু।

আমার ক্ষেত্রে দুঃখের ব্যাপার হল এই যে, অন্য যে কারো চেয়ে আমি ঢের বেশি নিজের খুঁত কাড়ি এবং নিজেকে বকি। এবং এরপর মা-মণি যখন তার ওপর তাঁর অনুশাসনটুকু চাপান তখন শিক্ষার বোঝা এমন পর্বতপ্রমাণ হয়ে ওঠে যে, মরীয়া হয়ে আমি তখন চ্যাটাং চ্যাটাং কথা বলি এবং উল্টোপাল্টা কথা বলতে শুরু করে দিই; তখন অবশ্যই আমার গলায় পুরনো সুপরিচিত ধুয়ো শোনা যায়– 'আমাকে কেউ বুঝতে পারে না!' এই পদবন্ধটি আমার মনে সেঁটে যায়; আমি জানি এটা খুবই বোকার মতো শুনতে, তবু এর মধ্যে কিছুটা সত্যি আছে। অনেক সময় নিজের ওপর আমি এত বেশি দোষারোপ করি যে, তখন আমি একান্ত ভাবে এমন কাউকে চাই– যে এসে আমাকে খানিকটা সান্ত্বনাবাক্য বলবে, আমাকে ঠিক উপদেশ দেবে এবং সেই সঙ্গে কিছুটা আমার সত্যিকার ব্যক্তিত্বকে বের করে আনবে; কিন্তু হায়, আমার খোঁজাই সার হল, আজ পর্যন্ত তেমন কাউকে আর পেলাম না।

এটা বলতেই পেটারের কথা অমনি তোমার মনে হবে, আমি জানি। হবে না, কিটি? ব্যাপারটা এই– পেটার আমাকে ভালবাসে প্রণয়িনীর মতো নয়, বন্ধুর মতো; দিনে দিনে, ওর বন্ধুভাব আরও বাড়ছে। কিন্তু কী সেই রহস্যময় জিনিস যা আমাদের দুজনকেই ঠেকিয়ে রাখছে? আমি নিজেই তা বুঝি না। মাঝে মাঝে ভাবি ওর সম্বন্ধে আমার তীব্র বাসনার মধ্যে আতিশয্য ছিল, কিন্তু, সেটাও ঠিক নয়। কেননা দুদিন যদি আমি ওপরে না যাই, আমার মধ্যে আকুলিবিকুলি ভাব অসম্ভব বেড়ে যায়। পেটার ভালো, পেটার আমার খুব আপন; কিন্তু তাও অস্বীকার করে লাভ নেই, ওর ব্যাপারে আমি নিরাশ হয়েছি। বিশেষ করে, ধর্মের বিষয়ে ওর বিরাগ এবং খাবারদাবার আর অন্য নানা প্রসঙ্গে ওর কথাবার্তা আমার পছন্দ হয় না। তবে এ ব্যাপারে আমি স্থির নিশ্চিত যে, আমাদের মধ্যে পরিষ্কার বোঝাপড়া হয়ে যাওয়ায়, আর এখন আমাদের ঝগড়া হবে না। পেটার শান্তিপ্রিয় মানুষ; ওর সহ্যগুণ আছে এবং বললেই কথা শোনে। যে কথা ওর মা বললে ও কিছুতেই মানবে না, তেমন অনেক জিনিস ওকে আমি বেকসুর বলতে পারি। ওর জিনিসপত্তর সমানে ও গোছগাছ করে রাখতে পারে। এ সত্ত্বেও ও কেন ওর নিগূঢ় কথা নিজের মনের মধ্যে রাখে? কেন সেখানে আমার প্রবেশ নিষেধ? মানছি, স্বভাবে ও আমার চেয়ে চাপা, কিন্তু আমি জানি– আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে– যে, কোনো-না-কোনো সময়ে সবচেয়ে মুখচোরা মানুষও এমন কাউকে ঠিক ততটাই পেতে চায় যাকে সে মন খুলে সব বলতে পারে।

পেটার আর আমি, আমরা দুজনেই আমাদের ধ্যানের বছরগুলো 'গুপ্ত মহলে' কাটিয়েছি। আমরা কত সময় ভবিষ্যৎ অতীত আর বর্তমান নিয়ে কথা বলি, কিন্তু, আগেই বলেছি, আদত জিনিসটা আমি যেন ধরতে ছুঁতে পারি না এবং ওটা যে রয়েছে, সেটা জেনেও।

তোমার আনা।

বৃহস্পতিবার, ১৫ জুন, ১৯৪৪

আদরের কিটি,

আমি ভাবি, প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্ক আছে এমন সব কিছু নিয়েই আমি যে এত মত্ত হয়ে পড়ি, তার কারণ নিশ্চয় এই যে, আজ দীর্ঘদিন ঘরের বাইরে নাক গলানো থেকে আমি বঞ্চিত। আমার স্পষ্ট মনে পড়ে, একটা সময় ছিল যখন গাঢ় সুনীল আকাশ, পাখিদের কূজন, চাঁদের আলো আর ফুল, এর কিছুই কখনও আমাকে মুগ্ধ করতে পারত না। এখানে আসার পর সেটা বদলে গেছে।

যেমন হুইট্‌সানের (ইস্টারের ছয় সপ্তাহ পরে সপ্তম রবিবার থেকে সপ্তাহকালের পরব) সময়, যখন বেশ গরম, একা একা ভালো করে চাঁদ দেখব বলে আমি ইচ্ছে করে একদিন রাত সাড়ে এগারোটা পর্যন্ত জেগেছিলাম।

হায়, আমার জেগে থাকাই সার হল, কারণ চাঁদের আলো বড় বেশি জোরালো থাকায় ভয়ে আমি জানালাই খুলতে পারলাম না। আরেক বার, মাস কয়েক আগে, আমি ওপরে গিয়েছিলাম, ঘরের জানালাটা খোলা ছিল।

যতক্ষণ না জানালা বন্ধ করে দিতে হল ততক্ষণ আমি ঘর ছেড়ে নড়িনি। ঘুটঘুটে অন্ধকার, বর্ষণমুখর সন্ধ্যে, ঝড়ো হাওয়া, হুড়মাতুনে মেঘ, সব যেন চুম্বকের মতো আমাকে ধরে রাখল, দেড় বছরের মধ্যে এই প্রথম রাতকে আমি সামনাসামনি দেখলাম। সেদিন সন্ধের পর থেকে সিঁদেল চোর, ধেড়ে ইঁদুর আর বাড়িতে পুলিসের হানা দেওয়ার ভয়ের চেয়েও আমার কাছে বড় হয়ে উঠল আবার সেই রাত দেখার তীব্র বাসনা।

আমি একা একা নিচে চলে গিয়ে রসুইঘর আর অফিসের খাস কামরার জানালা দিয়ে বাইরেটা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতাম।

অনেকেই প্রকৃতি ভালবাসে, অনেকে মাঝে মধ্যে ঘরের বাইরে ঘুমোয় আর যারা জেলখানায় বা হাসপাতালে থাকে তারা দিন গোনে কবে আবার ছাড়া পেয়ে প্রকৃতির সৌন্দর্য উপভোগ করতে পারবে।

কিন্তু এমন মানুষের সংখ্যা বেশি নয় যারা, নির্ধন সবাই যার অংশীদার, সেই প্রকৃতি থেকে বহিষ্কৃত আর বিচ্ছিন্ন। যখন আমি বলি যে, আকাশ মেঘ, চাঁদ আর তারার দিকে তাকালে নিজের মধ্যে আমি পাই প্রশান্তি আর সুস্থিরতা– সেটা আমার মনগড়া কল্পনা নয়। ঘৃতকুমারী বা ব্রোমাইডের চেয়েও সেটা ভালো ওষুধ; প্রকৃতি মাতা আমাকে বিনীত হতে শেখায় এবং সাহসের সাথে প্রত্যেকটি আঘাতের মোকাবিলা করতে শেখায়।

দুঃখের বিষয়, খুব দু-একটি ক্ষেত্রে ছাড়া, আমার কপালে শুধু জুটেছে অসম্ভব ধূলিমলিন জানালায় ঝোলানো নোংরা নেটের পর্দার ভেতর দিয়ে প্রকৃতিদর্শন। এইভাবে দেখতে আর ভাল লাগে না, কারণ প্রকৃতি হল এই একটি জিনিস যাকে হতেই হবে নির্ভেজাল।

তোমার আনা।

শুক্রবার, ১৬ জুন, ১৯৪৪

আদরের কিটি,

নতুন নতুন ঝঞ্ঝাট– মিসেস ফান ডানের এখন প্রায় মাথায় হাত দেওয়ার অবস্থা; ওঁর বুলি হল– গুলিতে ওঁর মাথা এফোঁড় হওয়া, জেল খাটা, ফাঁসি আর আত্মহত্যা। উনি আমাকে

হিংসে করেন, কেননা পেটার ওঁকে না বলে আমার কাছে ওর মনের কথা বলে। ডুসেলের সঙ্গে ফষ্টিনষ্টিতে ওঁর প্রত্যাশা মতো ডুসেল ধরা না দেওয়ায় ওঁর রাগ; ওর ভয় যে ওঁর স্বামী বোধ হয় সিগারেট খেয়ে ফারকোটের জন্যে রাখা সব টাকা ফুঁকে দিচ্ছেন।

মিসেস ফান ডান এই করছেন চুলোচুলি, এই করছেন গালিগালাজ, এই ফেলছেন চোখের পানি, এই গাইছেন নিজের কাঁদুনি, আবার তারপরই নতুন করে শুরু করছেন কোঁদল। অমন এক বোকা, ঘ্যানঘেনে মেয়েমানুষকে নিয়ে কী যে করা যায়! কেউ ওঁর কথার কোনো দাম দেয় না, ওঁর চরিত্র বলে কিছু নেই এবং সকলের কাছেই উনি গজগজ করেন। সবচেয়ে খারাপ ব্যাপার হল, তাতে পেটার চ্যাটাং চ্যাটাং কথা শোনায়; মিস্টার ফান ডানের মেজাজ তিরিক্ষে হয়, আর মা-মণি হন বিশ্বনিন্দুক।

সত্যি, এ এক জঘন্য অবস্থা! এ থেকে বাঁচার সেরা নিয়ম একটাই– সব কিছু হেসে ওড়াও এবং আর কারো ব্যাপারে থেকো না। একটু স্বার্থপরের মতো শোনালেও, নিজের মনের জ্বালা জুড়োবার এটাই একমাত্র ওষুধ।

চার সপ্তাহ ধরে মাটি খোঁড়ার কাজে ক্রালারের আবার তলব পড়েছে। ক্রালার চেষ্টা করছেন ডাক্তারের সার্টিফিকেট আর কোম্পানির চিঠি দেখিয়ে এ থেকে উদ্ধার পেতে, কুপহুইস চাইছেন পাকস্থলীতে অপারেশন করাতে। কাল এগারোটায় সমস্ত ব্যক্তিগত টেলিফোন কেটে দেওয়া হয়েছে।

তোমার আনা।

শুক্রবার, ২৩ জুন, ১৯৪৪

আদরের কিটি,

এখানে বলবার মতো বিশেষ কিছু হচ্ছে না। ইংরেজরা শেরবুর্গের ওপর বড় দরের হামলা শুরু করেছে। পিম আর ফান ডানের মতে, ১০ই অক্টোবরের মধ্যে আমরা নির্ঘাত মুক্তি পেয়ে যাব। এই অভিযানে রুশরা যোগ দিয়েছে এবং কাল তার ভিতেবৃস্ক-এর কাছে আক্রমণ শুরু করেছে, আজ থেকে ঠিক তিন বছর আগে জার্মানরা আক্রমণ করে। আমাদের আলু প্রায় ফুরিয়ে এসেছে; এখন থেকে মাথা পিছু গুনে নিতে হবে, তাহলে সবাই জানবে কে কটা পেল।

তোমার আনা।

মঙ্গলবার, ২৭ জুন, ১৯৪৪

প্রিয়তম কিটি,

এখন আর মনের সে ভাব নেই; সব কিছু এখন চমৎকার চলছে। শেরবুর্গ, ভিতেবৃস্ক আর স্লোবেন আজ শত্রু কবলমুক্ত হয়েছে। বন্দী আর দখল করা জিনিস প্রচুর। এবার ইংরেজরা তাদের চাহিদামতো সৈন্য নামাতে পারবে। ইংরেজরা আক্রমণ শুরু করার তিন সপ্তাহ পরে গোটা কোঁতাঁত্যা উপদ্বীপে তারা একটি পোতাশ্রয় পেয়েছে।

বিরাট সাফল্য বৈকি। সেই দিনটির পর এই তিন সপ্তাহে এমন দিন যায়নি যেদিন ঝড়বৃষ্টি হয়নি, এখানেও যেমন ফ্রান্সেও তেমনই। কিন্তু এই একটু দুর্ভাগ্য ইংরেজ আর মার্কিনদের বিপুল শক্তি প্রদর্শন রোধ করতে পারেনি।

আর সে শক্তিও যেমন-তেমন নয়।

সেই যে 'আজব অস্ত্র' সে তো পুরোদমেই চলছে; কিন্তু ইংল্যাণ্ডে খানিকটা ভাঙচুর নিয়ে দু-একটি চুটকি আর বোশ (জার্মান ভাষায় নিরেট মাথা) কাগজে পৃষ্ঠা ভরানো– এছাড়া ওর ফল আর কতটুকু? বলতে কি, 'বোশ-ভূমি'তে যখন হুঁশ হবে যে, সত্যিই বলশেভিকরা আসছে, তখন ওদের আরও বেশি হাঁটু কাঁপবে।

যেসব জার্মান মেয়ে মিলিটারিতে কাজ করে না, তাদের ছেলেপুলেসুদ্ধ গ্রোলিন্‌জেনে, ফিজল্যাণ্ডে আর গেল্ডারল্যাণ্ডে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

মুসের্ট (ডাচ নাৎসী নেতা) ঘোষণা করেছে যে, ওরা যদি *ঠেলতে ঠেলতে* এই পর্যন্ত আসে তাহলে মুসের্ট উর্দি পরবে।

মটু বুড়োর কি ইচ্ছে খানিকটা যুদ্ধ করার? এর আগে রুশদেশে সেটা করলেই সে পারত। কিছুদিন আগে শান্তির প্রস্তাব ফিনল্যাণ্ড বাতিল করে দেয়; পরে এর জন্যে হাত কামড়াবে, বোকচন্দরের দল!

২৭শে জুলাই আমরা কত দূরে থাকব বলে তোমার মনে হয়?

তোমার আনা।

শুক্রবার, ৩০ জুন, ১৯৪৪

আদরের কিটি,

খারাপ আবহাওয়া, কিংবা বলা যায়– তিরিশে জুন অব্দি একটানা খারাপ আবহাওয়া (মূল ইংরেজিতে লেখা)। ভালোই বলেছি, তাই না! এর মধ্যেই ইংরেজি আমি দুই কলম শিখে নিয়েছি। আমি যে পারি সেটা দেখাবার জন্যে অভিধানের সাহায্যে আমি 'আদর্শ স্বামী' পড়ছি। যুদ্ধ সুন্দর ভাবে চলেছে।

বোর্‌রয়ুস্ক, মোগিলেফ আর ওরশার পতন হয়েছে, বন্দী প্রচুর।

এখনকার খবর সব ভালো এবং সকলেরই মেজাজের উন্নতি হচ্ছে। যারা উগ্র আশাবাদী ছিল, তাদের এখন জয়জয়কার। এলির চুলের ধরন পাল্টেছে। এ সপ্তাহটা মিপের ছুটি। নতুন খবর বলতে এই।

তোমার আনা।

বৃহস্পতিবার, ৬ জুলাই, ১৯৪৪

আদরের কিটি,

পেটার যখন বলে এর পরে সে হবে চোর ডাকাত কিংবা যখন সে জুয়োখেলার কথা বলে, আমার বুকের ভেতরটা হিম হয়ে যায়; অবশ্যই ঠাট্টা করেই সে বলে, তবু আমার কেমন যেন মনে হয় নিজের দুর্বলতায় ও ভয় পায়।

মারগট আর পেটারের মুখে বার বার শুনি– 'হ্যাঁ, হতাম যদি তোমার মতো শক্ত আর তেজস্বী, যা চাই তা পাওয়ার জন্যে সবসময় যদি লেগে থাকতে পারতাম, আমার যদি দাঁত কামড়ে পড়ে থাকার উৎসাহ থাকত, হ্যাঁ, তাহলে দেখতে...!'

আমার ওপর কারো প্রভাব পড়তে না দেওয়া, আমি ভাবি, এটা সত্যিই আমার একটা সদ্‌গুণ কিনা। প্রায় পুরোপুরি নিজের বিবেককে অনুসরণ করা, এটা কি সত্যিই ভালো?

খোলাখুলিই বলছি, আমি ভেবে পাই না কেউ কী করে বলে, 'আমি দুর্বল' এবং তারপর তেমনিই থেকে যায়।

যখন তুমি জানছই, কেন তার বিরুদ্ধে লড়ো না, কেন তোমার চরিত্রকে গড়েপিটে নেবার চেষ্টা করো না? উত্তর পেয়েছিলাম– 'না করাটা অনেক সহজ বলে।' এটা শুনে আমি দমে গিয়েছিলাম।

সহজ? তার মানে, আলসেমি আর ফাঁকি দেওয়ার জীবনটা একটা সহজ জীবন? না, না– এটা সত্যি হতে পারে না, সত্যি হওয়া উচিত নয়, মানুষ তাহলে সহজেই প্রলুব্ধ হবে ঢিলেমিতে... আর টাকায়।

আমি অনেকক্ষণ বসে ভাবলাম পেটারকে আমি কী উত্তর দেব, কিভাবে ওর নিজের ওপর আস্থা আনা যায় এবং, সবচেয়ে বড় কথা নিজের চেষ্টায় কি ভাবে ও নিজেকে শোধরাতে পারে। আমি জানি না আমার এই চিন্তাধারা ঠিক না ভুল।

আগে কত ভেবেছি, একজনের পূর্ণ বিশ্বাস অর্জন করাটা কী সুন্দর একটা ব্যাপার; এখন সেইখানে পৌঁছে বুঝতে পারছি, অন্যের ভাবনা ভাবতে পারা এবং তার ঠিক উত্তরটা খুঁজে বের করা কত শক্ত কাজ।

আরও এই কারণে যে, 'সহজ' আর 'টাকা' এই বিশেষ ধারণাগুলোই আমার কাছে সম্পূর্ণ অচেনা আর নতুন। পেটার আমার ওপর খানিকটা ঠেকা দিতে শুরু করেছে এবং এটা কোনো অবস্থাতেই হতে দেওয়া চলবে না।

পেটার জাতীয় ছেলেদের কাছে নিজের পায়ে দাঁড়ানোর ব্যাপারটা শক্ত ঠেকে, কিন্তু তার চেয়েও শক্ত তোমার পক্ষে সচেতন, জ্যান্ত জীবন হয়ে তোমার নিজের পায়ে দাঁড়ানো। কেননা তা যদি তুমি করো, তাহলে আকণ্ঠ সমস্যার মধ্যে সঠিক পথ কেটে এগোনো এবং তৎসত্ত্বেও সবকিছুর মধ্যে ধ্রুবলক্ষ্যে অবিচল থাকা– এ কাজ দ্বিগুণ কঠিন হবে।

আমি কেবল এটা সেটা করছি, দিনের পর দিন সন্ধান করছি, সেই সাংঘাতিক 'সহজ' শব্দটার বিরুদ্ধে এমন একটা মোক্ষম যুক্তি খুঁজে বেড়াচ্ছি, যাতে বরাবরের মতো ওটা মিটিয়ে ফেলা যায়।

কেমন করে ওকে আমি বোঝাই, যে জিনিস সহজ আর চিত্তাকর্ষক দেখায় ওকে তো এমন রসাতলে টেনে নিয়ে যাবে যেখানে না পাওয়া যাবে প্রাণের সান্ত্বনা, না বন্ধু, না সৌন্দর্য– যেখান থেকে নিজেকে তোলা প্রায় অসম্ভব?

আমরা সবাই বেঁচে থাকি, কিন্তু জানি না কিসের জন্যে কি হেতু। আমরা সবাই বাঁচি সুখী হওয়ার জন্যে; আমাদের জীবন যেমন পৃথক পৃথক, তেমনই কুল্লে এক।

আমরা তিনজনে মানুষ হয়েছি ভালো সংসর্গে, আমাদের শিক্ষার সুযোগ আছে, কিছু একটা হতে পারার সম্ভাবনা আছে, আমরা প্রত্যেকেই সঙ্গতভাবে আশা করতে পারি সুখের জীবন, কিন্তু... এটা আমাদেরই অর্জন করতে হবে।

সেটা কখনই সহজ নয়। সুখ যদি অর্জন করতে চাও তো তোমাকে খাটতে হবে এবং ভালো করতে হবে; বসে থেকে বা কপাল ঠুকে তা হওয়ার নয়। কুড়েমি জিনিসটা মন ভোলাতে পারে কিন্তু কাজ করে পাওয়া যায় তৃপ্তি।

যেসব লোক কাজ পছন্দ করে না তাদের আমি বুঝতে পারি না, কিন্তু পেটারের ব্যাপারটা আলাদা; পৌঁছুনোর মতো ওর কোনো নির্দিষ্ট লক্ষ্য নেই, সেই সঙ্গে ও মনে করে কিছু করে ওঠার মতো ওর বুদ্ধিও নেই, যোগ্যতাও নেই।

বেচারা!

ও কখনও জানলই না অন্যদের মুখে হাসি ফোটালে কি রকমের অনুভূতি হয় এবং সেটা আমি ওকে শেখাতেও পারব না। ওর কোনো ধর্মবিশ্বাস নেই, যীশু খ্রিষ্টকে হেসে উড়িয়ে দেয়, আর ঈশ্বরের নামে দিব্যি গালে। আমিও যে খুব নিষ্ঠাবান, তা নই; কিন্তু যখনই পেটারকে দেখি সে সকলের বার, সব সময় নাক সিঁটকে আছে এবং সত্যিই রিক্ত– তখন আমি মনে আঘাত পাই।

যেসব লোকের কোনো একটা ধর্ম আছে, তাদের খুশি হওয়া উচিত; কারণ স্বর্গীয় বস্তুতে বিশ্বাসী হওয়ার সুকৃতি সকলের থাকে না।

মৃত্যুর পর দণ্ডভয়ও তোমার না থাকলে চলে; অনেকে আছে যারা শুদ্ধিলোক, নরক আর স্বর্গ, এসব মানতে পারে না, কিন্তু একটি ধর্ম, তা সে যে ধর্মই হোক, মানুষকে সঠিক পথে রাখে। উপরওয়ালার ভয় নয়, সেটা আসলে নিজের ইজ্জত আর নৈতিক চেতনাকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরা।

যদি রোজ রাত্রে ঘুমোবার আগে লোকে একবার মনে করে দেখে সারাদিন সে কী করেছে এবং ভেবে দেখে তার মধ্যে কোন্‌টা ভালো কোন্‌টা মন্দ– তাহলে প্রত্যেকেই কত মহানুভব আর কত ভালো হতে পারে। এবং নিজের অজান্তে, তখন দেখবে রোজ রাত পোহালেই তুমি আত্মোন্নতির জন্যে চেষ্টা করছ, দেখবে কালক্রমে অনেক কিছু আলবাৎ তোমার মুঠোয় এসে গেছে। যে কেউ তা করতে পারে, এর জন্যে পয়সা লাগে না এবং নিশ্চিতভাবেই এতে কাজ সহজ হবে। যারা জানে না অভিজ্ঞতা থেকে তাদের একথা শিখতে হবে যে– 'বিবেক শান্ত থাকলে মানুষের শক্তি বাড়ে।'

তোমার আনা।

শনিবার, ৮ জুলাই, ১৯৪৪

আদরের কিটি,

এ কারবারের প্রধান প্রতিনিধি মিস্টার ব গিয়েছিলেন বেভারহিকে এবং নিলাম (হল্যাণ্ডে প্রত্যেক চাষীকে তার ফসল প্রকাশ্য নিলামে বেচতে হয়) বাজার থেকে সেই রকম জুটিয়ে এনেছেন স্ট্রবেরি।

এখানে এল যখন, একেবারে ধুলোয় ধূসর, বালিতে বালিময়, কিন্তু পরিমাণে প্রচুর। অফিসের লোকজন আর আমাদের জন্যে কম করে চব্বিশ ডালা স্ট্রবেরি। সেইদিনই সন্ধ্যেবেলায় ছয়টা বয়ামে পুরে আমরা আট পাত্র জ্যাম তৈরি করে ফেললাম। পরদিন সকালে মিপ্‌ অফিসের লোকদের জন্যে জ্যাম করতে চাইলেন।

সকাল সাড়ে বারোটায় বাড়িতে বাইরের লোক বলতে যখন কেউ নেই, দরজায় হুড়কো লাগিয়ে দেওয়া হল; ডালাগুলো আনতে বলা হল; পেটার, বাপি, ফান ডান সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে বকবক করছেন– আনা, যাও গরম পানি আনো; মারগট একটা বালতি নিয়ে এসো; কে কোথায় আছ, দাঁড়িয়ে যাও।

পেটের মধ্যে কুঁই কুঁই করছে, রসুইঘরে গিয়ে দেখি ঠাসা লোক– মিপ্‌, এলি, কুপহুইস, হেংক্‌, বাপি, পেটার। অজ্ঞাতবাসে থাকা পরিবারগুলো আর তাদের যোগানদার বাহিনী, সব একাকার এবং ভরদুপুরে এই ব্যাপার।

নেটের পর্দা থাকায় বাইরে থেকে কেউ ভেতরে কী হচ্ছে দেখতে পায় না, কিন্তু তাহলেও, এই চেঁচামেচি আর দরজা ধাক্কাধাক্কি আমাকে সত্যিই ভয় পাইয়ে দিল। আমরা

যে লুকিয়ে আছি, এসব দেখেশুনে কি তা বলা যায়? এটা চকিতে আমার মনের মধ্যে ঝিলিক দিয়ে উঠল। এ থেকে আমার এই অদ্ভূত অনুভূতি জাগল যে, পৃথিবীতে আবার আমি দেখা দিতে পারব।

প্যান ভর্তি হল আর আমি আবার ছুটে ওপরতলায় গেলাম। পরিবারের আর সবাই রান্নাঘরে আমাদের টেবিলে গোল হয়ে বসে বোঁটাগুলো ছাড়াতে ব্যস্ত– অন্তত সেই কাজই তাদের করার কথা; কিন্তু যত না তারা বালতিতে ফেলছিল, তার চেয়ে বেশি ফেলছিল নিজেদের মুখে। এখুনি আরেকটি বালতি লাগবে।

পেটার ফের চলে গেল নিচতলার রসুইঘরে– দুই বার বেল বাজল। সঙ্গে সঙ্গে যেখানকার বালতি সেখানে রেখে পেটার ভোঁ-দৌড়। এক লাফে ওপরে এসে পেটার আলমারি জোড়া দরজায় খিল এঁটে দিল।

আমরা অস্থির হয়ে অপেক্ষা করছি। আধা পরিষ্কার স্ট্রবেরিগুলো যে ধোবো, কিন্তু পানির কল যে খুলতে পারছি না। 'বাড়িতে কেউ এলে পানি ব্যবহার বন্ধ, কেননা, তাতে আওয়াজ হবে'– এই নিয়ম কড়াভাবে মানা হয়।

একটার সময় হেংক্ এসে বললেন ডাকপিওন এসেছিল। পেটার আবার একদৌড়ে নিচে। টুং টাং... বেল বাজতেই পেটার পিঠটান দিল।

আমি গিয়ে কান পেতে শোনার চেষ্টা করলাম কেউ আসছে কিনা– প্রথমে আলমারিজোড়া দরজায়, তারপর সিঁড়ির মাথায় গুঁড়ি মেরে উঠে গিয়ে। শেষ পর্যন্ত আমি আর পেটার একজোড়া চোরের মত রেলিঙের ওপর দিয়ে ঝুঁকে পড়ে নিচের তলার হৈচৈ শোনার চেষ্টা করলাম।

সকলেরই চেনা গলা, পেটার চুটি চুপি নেমে পড়ে, আধাআধি গিয়ে থেমে পড়ে ডাকল– 'এলি!' কোনো উত্তর নেই, পেটার আবার ডাকল– 'এলি!' রসুইঘরের হৈচৈতে পেটারের কণ্ঠস্বর ডুবে গেল।

পেটার হনহনিয়ে নিচে নেমে সটান রসুইঘরে। আমি নিচের দিকে তাকিয়ে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে। 'এক্ষুনি ওপরে চলে যাও, পেটার! অ্যাকাউন্টেন্ট এসেছে, পালাও!' কুপহুইসের গলা।

পেটার হাঁপাতে হাঁপাতে ওপরে এল, আলমারি জোড়া দরজা সপাটে বন্ধ হল। শেষমেষ ক্রালার এসে গেলেন দেড়টায়। 'ওঃ, প্রাণ গেল, যেদিকে তাকাই শুধু স্ট্রবেরি আর স্ট্রবেরি, সকালের খাবারে স্ট্রবেরি, মিপের করা স্ট্রবেরির দমপুক্ত, আমার গা দিয়ে বেরোচ্ছে স্ট্রবেরির গন্ধ, এ থেকে জিরেন চাই, যাচ্ছি ওপরে– কি সব ধোয়াধুয়ি হচ্ছে এখানে... মরেছে, এখানেও স্ট্রবেরি।'

বাকিগুলো বোতলে ভরা হচ্ছে। সন্ধ্যেবেলায়– দুটো বয়াম খোলা হল। বাপি চটপট তা দিয়ে জ্যাম বানিয়ে ফেললেন। পরদিন সকালে– আর দুটো খোলা হল এবং বিকেলে চারটি। ফান ডান ওগুলোতে নির্বীজাণুকরণের উপযোগী তাপ দিতে পারেননি। আজকাল বাপি রোজ সন্ধ্যেবেলায় জ্যাম তৈরি করছেন।

এখন আমরা ডালিয়ার সঙ্গে স্ট্রবেরি খাই, সর-তোলা দুধ খাই স্ট্রবেরি দিয়ে, স্ট্রবেরি মাখিয়ে রুটিমাখন খাই, শেষ পাতে খাই স্ট্রবেরি, চিনিপাতা স্ট্রবেরি, বালি কিচকিচ স্ট্রবেরি। দুদিন ধরে স্ট্রবেরি, শুধুই স্ট্রবেরি; তারপর স্ট্রবেরির যোগান বন্ধ বা বোতলবন্দী হল এবং আলমারিতে তালা পড়ল।

মারগট চেঁচিয়ে বলে, 'শোন্ আনা, মোড়ের তরিতরকারির দোকানদার আমাদের কিছু মটরশুঁটি দিয়েছে, উনিশ পাউণ্ডের মতো।' আমি জবাব দিই, 'লোকটা খুব ভালো বলতে হবে।' ভালো নিশ্চয়ই, কিন্তু দম নিক্‌লে যাবে... বাপ্‌রে!

টেবিলে সবাই এসে বসলে মা-মনি ডেকে বললেন, 'শনিবার সকালে মটরশুটির খোসা ছাড়ানোর কাজে তোমাদের সবাইকে হাত লাগাতে হবে।'

যে কথা সেই কাজ। আজ সকালে কানায় কানায় ভর্তি বিরাট এক এনামেলের প্যান যথানিয়মে এসে গেল।

মটরশুঁটির খোসা ছাড়ানো বিরক্তিকর কাজ, কিন্তু একবার দানাগুলোর খোসা ছাড়িয়ে দেখো। খোসাটা ছাড়িয়ে ফেললে দেখবে দানার ভেতরের শাঁসটা কী নরম আর সুস্বাদু– আমার মনে হয় অনেকেই সেটা জানে না। তার চেয়েও বড় সুবিধে হল, শুধু মটরদানা হলে একজন যতটা খাবে, এতে তার তিনগুণ সে খেতে পারবে।

মটরদানার খোসা ছাড়ানোর কাজটা খুব ধীরে ধীরে সাবধানে করতে হয়। দিগ্‌গজ দাঁতের ডাক্তার বা মাছিমারা কেরানীর পক্ষে হয়ত ঠিক আছে, কিন্তু আমার মতো ছটফটে নাবালিকার পক্ষে এ কাজ ভয়ঙ্কর।

আমরা বসেছি সাড়ে নটায়, আমি উঠেছি সাড়ে দশটায়, তারপর আবার এসে বসেছি সাড়ে এগারোটায়।

এই ধুয়োটা এখনও আমার কানে গুনগুন করে বাজছে– আগা নোয়াও, খোসা ধরে টানো, শিরা বাছো, শুঁটি ছাড়িয়ে ফেল, ইত্যাদি, ইত্যাদি। আমার চোখের সামনে সব নাচছে, সবুজ, সবুজ, সবুজ। কৃমিকীট, শির, পচা শুঁটি, সবুজ, সবুজ, সবুজ।

কিছু একটা তো করতে হবে, তাই সারা সকাল বকর বকর করি, আগডুম বাগডুম যা মনে আসে বলে যাই, প্রত্যেককে হাসাই আর কান ঝালাপালা করে দিই। প্রত্যেকটা শির ধরে টানতে টানতে এ বিষয়ে মন বেঁধে নিই যে, জীবনে কক্ষনো আমি নিছক গৃহকর্মী হতে চাই না।

শেষ অব্দি আমরা প্রাতঃরাশ করলাম বারোটায়।

সাড়ে বারোটা থেকে সোয়া একটা আবার মটরশুঁটি ছাড়ানো। যখন হাত দুটো থামে, মাথাটা টলমল করে– অন্যদেরও খানিকটা তাই। উঠে পড়ে চারটে অবধি ঘুম লাগাই। কিন্তু তাও ঐ অখাদ্য মটরশুঁটিগুলো এখনও আমাকে বড়ই বিপর্যস্ত করে রেখেছে।

তোমার আনা।

শনিবার, ১৫ জুলাই, ১৯৪৪

আদরের কিটি,

লাইব্রেরি থেকে আমরা একটা বই পেয়েছিলাম, বইয়ের নামটাতে একটা যুদ্ধংদেহি ভাব; 'কমবয়সী আধুনিক তরুণীদের সম্পর্কে আপনি কী মনে করেন?' আজ এই বিষয়টা নিয়ে আমি কিছু বলতে চাই।

বইটির লেখিকা 'আজকের তরুণ সমাজ'-কে আগাপাছতলা ধুনেছেন– অবশ্য তাই বলে একথা বলেননি যে, তরুণদের সবাই 'ভালো কিছু করতে অপারগ।' বরং বলেছেন এর ঠিক উল্টো।

তাঁর মতে, তরুণ-তরুণীরা যদি ইচ্ছে করে তাহলে তারা এর চেয়ে বড়, এর চেয়ে সুন্দর এবং এর চেয়ে ভালো দুনিয়া গড়তে পারে– সে ক্ষমতা তাদের মুঠোর মধ্যেই আছে; কিন্তু তারা সত্যিকার সৌন্দর্যের বিষয়ে না ভেবে ওপরকার জিনিসগুলো নিয়েই ব্যস্ত।

রচনার কোনো কোনো অংশে মনে হয়েছে লেখিকার সমালোচনার লক্ষ্য যেন আমি; তাই আমি তোমার কাছে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে একবার খুলে ধরতে চাই এবং এই আক্রমণের বিরুদ্ধে আত্মপক্ষ সমর্থন করতে চাই।

যে আমাকে কিছুকালও দেখেছে, তারই চোখে না পড়ে পারে না– আমার চরিত্রের এক অসামান্য গুণ হল আমার আত্মজ্ঞান। ঠিক একজন বাইরের লোকের মতোই আমি নিজেকে আর আমার ক্রিয়াকলাপগুলোকে নিরীক্ষণ করতে পারি।

কোনোরকম পক্ষপাত ছাড়াই, তার হয়ে কোনোরকম সাফাই না গেয়েও, প্রতিদিনের আনার মুখোমুখি আমি দাঁড়াতে পারি; এবং তার মধ্যে কী ভালো আর কী মন্দ তা লক্ষ্য করতে পারি।

এই 'আত্মচেতনা' সব সময় আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকে এবং যখনই আমি মুখ খুলি, কথা বলামাত্র আমি জানি 'ওটা না বলে অন্য কিছু বলা উচিত ছিল' কিংবা 'ওটা ঠিকই বলা হয়েছে।' আমার মধ্যে এত কিছু আছে যা আমার চোখে খারাপ ঠেকে; সে সব বলে ফুরোবে না। আমি যত বড় হচ্ছি তত বুঝছি বাপির সেই কথাগুলো কত ঠিক– 'সব শিশুকেই তার মানুষ হওয়ার দিকে নজর দিতে হবে।'

বাপ-মা-রা শুধু সদুপদেশ দিতে পারেন অথবা তাদের সঠিক পথে এনে দিতে পারেন– কিন্তু কারো চরিত্র চূড়ান্তভাবে কী রূপ নেবে সেটা নির্ভর করে তাদের নিজেদের ওপর।

এর ওপর আমার আর যা আছে তা হল মনের জোর; সবসময় নিজেকে আমার খুব শক্তসমর্থ বলে মনে হয় এবং মনে হয় আমি অনেক কিছু সহ্য করতে পারি। নিজেকে ঝাড়া-হাত-পা আর নবীন বলে মনে হয়।

প্রথম সেটা জানতে পেরে আমি কী খুশি হয়েছিলাম; কেননা যখন প্রত্যেকের ওপর অনিবার্যভাবে ঘা এসে পড়বে, আমার মনে হয় না, আমি সহজে সে আঘাতে ভেঙে পড়ব।

কিন্তু এসব বিষয় নিয়ে আগেও আমি অনেকবার বলেছি। এবার আমি 'বাপি আর মা-মণি আমাকে বোঝে না' অধ্যায়টিতে আসব।

বাপি আর মা-মণি বরাবর পুরোপুরিভাবেই আমার মাথাটি খেয়েছেন; ওঁরা সবসময় আমার সঙ্গে মিষ্টি ব্যবহার করেছেন, আমার পক্ষ নিয়েছেন, এবং মা-বাবার পক্ষে সম্ভবপর সবকিছুই আমার জন্য করেছেন।

তবু আমি দীর্ঘ সময় ধরে কী ভয়ঙ্কর নিঃসঙ্গ বোধ করেছি এবং নিজেকে পরিত্যক্ত, উপেক্ষিত আর লোকে আমাকে ভুল বুঝেছে বলে মনে হয়েছে। বাপি সাধ্যমত চেষ্টা করেছেন আমার বিদ্রোহী ভাব ঠেকাতে, কিন্তু ফল হয়নি; আমার নিজের আচরণে কী ভুল তা দেখে এবং সেটা নিজের চোখের সামনে তুলে ধরে আমি নিজেকে সারিয়ে তুলেছি।

এই বা কেমন যে, আমার লড়াইতে আমি বাপির কাছ থেকে কোনো সাহায্যই পাইনি? তখন তিনি আমার দিকে সাহায্যের হাত বাড়াতে চেয়েছেন, কেন তিনি তখনও সম্পূর্ণভাবে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছেন?

বাপি এগিয়েছিলেন ভুল পথ ধরে, উনি সবসময় আমার সঙ্গে যেভাবে কথা বলেছেন তাতে মনে হবে আমি যেন এমন এক শিশু যে কষ্টকর অবস্থার ভেতর দিয়ে যাচ্ছে। কথাটা

অদ্ভুত ঠেকবে, কারণ বাপিই হলেন একমাত্র লোক যিনি আমাকে বিশ্বাস করে সবকিছু বলতেন; এবং আমি যে সুবোধ মেয়ে, একটা বাপি ছাড়া আর কেউই আমাকে মনে মনে বুঝতে দেয়নি। কিন্তু একটা জিনিস বাদ পড়েছিল; তিনি এটা উপলব্ধি করতে পারেননি যে, আমার পক্ষে অন্য সবকিছুর চেয়ে ঢের বেশি জরুরী হল চরম উৎকর্ষে পৌছুবার লড়াই। 'তোমার বয়সে এটা হয়'; বা 'অন্য মেয়েরা' বা 'এটা আপনা থেকে আস্তে আস্তে কেটে যাবে'– এ ধরনের কথা আমি শুনতে চাইতাম না; আমি চাইনি আমার সঙ্গে ব্যবহার করা হোক আর পাঁচটা মেয়ের মতো– ব্যবহারটা হওয়া উচিত আনা যা তার সেই নিজের গুণে। পিম সেটা বোঝেননি। সেদিক থেকে কাউকেই আমি মনের কথা বলতে পারি না, যদি না তারা নিজেদের সম্বন্ধে বিস্তর কথা আমাকে বলে। যেহেতু পিম সম্পর্কে আমি খুব সামান্যই জানি। আমি মনে করি না তাঁকে সঙ্গে নিয়ে আমি খুব ঘনিষ্ঠ জায়গায় পা ফেলতে পারি। পিম সবসময় বয়োবৃদ্ধের, পিতৃসুলভ মনোভাব নেন; বলেন এক সময়ে তাঁরও এই ধরনের ঝোঁক হয়েছিল। তবে ওসব বেশিদিন থাকে না। হাজার চেষ্টা করেও আমার সঙ্গে আজও বাপির মনের তার ঠিক বন্ধুর মতো এক সুরে বাজে না।

এই সবের দরুন, জীবন সম্বন্ধে আমার মতামত অথবা আমার সুচিন্তিত তাত্ত্বিক ধারণাগুলোর কথা আমি আমার ডায়েরির পাতায় এবং মাঝে মাঝে মারগটকে ছাড়া কখনও কারো কাছে গুণাক্ষরেও বলি না। যেসব জিনিস আমাকে বিচলিত করছিল, তার পুরোটাই আমি বাপির কাছ থেকে লুকিয়ে রেখেছিলাম; আমি কখনই বাপিকে আমার আদর্শের অংশীদার করিনি। এটা আমি মনে মনে বুঝছিলাম যে, আমি তাঁকে আস্তে আস্তে আমার কাছ থেকে দূরে ঠেলে দিচ্ছি। অন্য কিছু করা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। আমি সবকিছুই পুরোপুরি আমার অনুভূতি অনুযায়ী করেছি, কিন্তু করেছি এমনভাবে যা আমার মনের শান্তি রক্ষার সবচেয়ে অনুকূল। কারণ, এ অবস্থায়, আমি যদি আমার অর্ধসমাপ্ত কাজের সমালোচনা মেনে নিই, তাহলে নড়বড় করতে করতে যে স্থিরতা আর আত্মবিশ্বাস গড়ে তুলেছি– আমাকে তা সম্পূর্ণভাবে খোয়াতে হয়। পিমের কাছ থেকে এলেও আমি তা মানতে পারি না, যদিও কথাটা কঠিন শোনাবে, কেননা পিমকে আমি আমার গূঢ় ভাবনার অংশীদার তো করিইনি, উপরন্তু আমার রগচটা মেজাজের সাহায্যে অনেক সময় নিজেকে তাঁর কাছ থেকে আরও বেশি দূরে ঠেলে দিয়েছি।

এই বিষয়টা নিয়ে আমি বিলক্ষণ ভেবে থাকি– পিমের ওপর কেন আমি চটি? এতই চটি যে, আমাকে ওঁর জ্ঞান দিতে আসাটা আমি সহ্যই করতে পারি না, ওঁর সস্নেহ ভাব-ভঙ্গিগুলো আমার কাছে ভান বলে মনে হয়, আমি চাই একা শান্তিতে থাকতে এবং ওঁর হাত থেকে একটু রেহাই পেলেই বরং খুশী হই, যতক্ষণ ওঁর প্রতি আমার মনোভাব ঠিক কী সেটা নিশ্চিতভাবে না বুঝতে পারছি। কারণ, উত্তেজিত হয়ে যে যাচ্ছেতাই চিঠিটা দম্ভ করে ওঁকে আমি লিখেছিলাম, তার কুরে কুরে খাওয়া অপরাধবোধ এখনও আমার মধ্যে রয়ে গেছে। সবদিক দিয়ে প্রকৃত বলিষ্ঠ আর সাহসী হওয়া, ইস্, কত যে শক্ত।

তবু এটাই আমার সবচেয়ে বড় আশাভঙ্গ নয়। না, বাপির চেয়ে আমি ঢের বেশি ভাবি পেটারের কথা। আমি ভালো করেই জানি, আমি ওকে হার মানিয়েছিলাম, ও আমাকে নয়। ওর সম্পর্কে আমি মনের মধ্যে একটা ভাবমূর্তি খাড়া করেছিলাম। শান্ত সংবেদনশীল মিষ্টিমতো একটি ছেলের– যার দরকার স্নেহ-ভালবাসা আর বন্ধুত্ব। আমার প্রয়োজন ছিল জীবন্ত কোনো মানুষের– যাকে আমি প্রাণের সব কথা খুলে বলতে পারি; আমি চেয়েছিলাম

এমন একজন বন্ধু, যে আমাকে এনে দেবে ঠিক রাস্তায়। আমি যা চেয়েছিলাম তা পেয়েছি এবং আস্তে আস্তে কিন্তু নিশ্চিতভাবে তাকে আমি নিজের কাছে টানলাম। শেষ পর্যন্ত, যখন তাকে আমি বন্ধুভাব বোধ করাতে পারলাম, তখন আপনা থেকে তা এমন এক মাখামাখিতে গিয়ে গড়াল যে, পুনর্বিবেচনায় বুঝলাম, সেটা অতটা হতে দেওয়া আমার উচিত হয়নি।

আমরা কথা বলেছি যারপরনাই ব্যক্তি বিষয়ে, কিন্তু আজ অবধি আমাদের কথাবার্তায় আমরা সেইসব বিষয়ের ধারকাছ দিয়েও যাইনি যে বিষয়গুলো সেদিন এবং আজও আমার হৃদয়মন ভরে রেখেছে। আমি এখনও পেটারের ব্যাপারটা ভালো জানি না– ওর কি সবই ওপরসা? নাকি ও এখনও লজ্জা পায়, এমন কি আমাকেও? কিন্তু সে কথা থাক, সত্যিকার বন্ধুত্ব পাতানোর অধীর আগ্রহে আমি ভুল করে বসেছিলাম। দুম্ করে সরে গিয়ে ওকে ধরার চেষ্টায় আমি গড়ে তুললাম আরও মাখামাখির সম্পর্ক। সেটা না করে আমার উচিত ছিল অন্যান্য সম্ভাবনাগুলো বাজিয়ে দেখা। পেটার হেদিয়ে মরছে ভালবাসা পাওয়ার জন্যে এবং আমি দেখতে পাচ্ছি ও ক্রমবর্ধমানভাবে আমার প্রেমে পড়তে শুরু করেছে। আমাদের দেখাসাক্ষাতে ও তৃপ্তি পায়; অথচ আমার ওপর এসবের একমাত্র ক্রিয়া হয় এই যে, আমার মধ্যে আরেকবার পরীক্ষা করে দেখার বাসনা জাগে। এ সত্ত্বেও যেসব জিনিস দিনের আলোয় তুলে ধরার জন্যে আমি আকুলিবিকুলি করছি, কেমন যেন মনে হয় আমি সে বিষয়গুলো ছুঁতেই পারি না। পেটার যতটা বোঝে, তার চেয়েও ঢের বেশি আমি ওকে আমার কাছে টেনে এনেছি। এখন ও আমাকে আঁকড়ে ধরেছে; আপাতত ওকে ঝেড়ে ফেলার এবং ওকে নিজের পায়ে দাঁড় করানোর আমি কোনো রাস্তা দেখছি না। যখন আমি বুঝলাম ও আমার বোধশক্তির উপযোগী বন্ধু হতে পারবে না, তখন ঠিক করলাম আমি অন্তত চেষ্টা করব ওর মনের এঁদো গলি থেকে ওকে তুলে আনতে এবং এমন ব্যবস্থা নিতে যাতে ওর যৌবনটা দিয়ে ও কিছু করতে পারে।

কারণ, অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে যৌবন বার্ধক্যের চেয়েও নিঃসঙ্গ। এটা আমি কোনো বইতে পড়েছিলাম এবং বরাবর স্মরণে আছে; দেখেছি কথাটা ঠিক। তাহলে কি এটা ঠিক যে, আমাদের চেয়েও আমাদের গুরুজনদের এখানে থাকা ঢের বেশি কষ্টকর? না। আমি জানি, এটা ঠিক না। বয়সে যারা বড়, সব কিছু সম্পর্কে তাদের মতামত তৈরি হয়ে গেছে। কোনো কিছু করতে গিয়ে তাদের দ্বিধার মধ্যে পড়তে হয় না। আজ যখন সমস্ত আদর্শ ভেঙে তছনছ হয়ে যাচ্ছে, যখন লোকে তাদের সবচেয়ে ওঁছা দিকটা চোখের সামনে তুলে ধরছে এবং সত্য, ন্যায় আর ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখতে হবে কিনা তাও জানে না– তখন নিজের কোট বজায় রেখে নিজের মতামত ঠিক রাখা, আমাদের ছোটদের পক্ষে, তো আরও দ্বিগুণ শক্ত।

কেউ যদি, সে যেই হোক, দাবি করে যে এখানে গুরুজনদের থাকতে বেশি কষ্ট হয়, তাহলে বলব সে মোটেই বোঝে না কী পরিমাণ ভারী ভারী সমস্যা আমাদের ঘাড়ের ওপর; এসব সমস্যা সামলাবার পক্ষে আমরা হয়ত খুবই ছোট, কিন্তু তাহলেও ক্রমাগত তার চাপ তো আমাদের ওপর পড়ছে; হতে হতে একটা সময় আসে, আমরা তখন ভাবি, যাক্ একটা সমাধান পাওয়া গেছে– কিন্তু সে সমাধান তো প্রকৃত ঘটনাগুলোকে ঠেকাতে পারে না, ফলে আবার সব লণ্ডভণ্ড হয়ে যায়। এমন দিনে এই হল মুশকিল– আমাদের ভেতর আদর্শ, স্বপ্ন আর সাধ আহ্লাদ মাথা তোলে, তারপরই ভয়ঙ্কর সত্যের মুখে পড়ে সেসব খান খান হয়ে যায়। এটা খুব আশ্চর্য যে, আমি আমার সব আদর্শ জলাঞ্জলি দিইনি; কেননা সেগুলো অযৌক্তিক এবং কাজে খাটানো অসম্ভব, এ সত্ত্বেও আমি সেগুলো রেখে দিয়েছি, কারণ,

মানুষের ভেতরটা যে সত্যিই ভালো, সবকিছু সত্ত্বেও আমি আজও তা বিশ্বাস করি। আমি এমন ভিত্তিতে আমার আশাভরসাকে দাঁড় করাতে পারি না যা বিশৃঙ্খল, দুঃখদৈন্য আর মৃত্যু দিয়ে তৈরি। আমি দেখতে পাচ্ছি পৃথিবী ক্রমশ জঙ্গল হয়ে উঠছে, আমি কেবলি শুনতে পাচ্ছি আসন্ন বজ্রনির্ঘোষ, যা আমাদেরও ধ্বংস করবে, আমি অনুভব করতে পারি লক্ষ লক্ষ মানুষের যন্ত্রণা-লাঞ্ছনা এবং এ সত্ত্বেও, আমি দিবালোকের দিকে মুখ তুলে তাকাই, আমি ভাবি সব ঠিক হয়ে যাবে, এ নিষ্ঠুরতারও অবসান হবে এবং আবার ফিরে আসবে শান্তি আর সুস্থিরতা।

যতদিন তা না হয়, আমি আমার আদর্শগুলোকে উঁচুতে তুলে ধরব, কেননা হয়ত এমন দিন আসবে যখন আমি সেই আদর্শগুলোকে কাজে খাটাতে পারব।

তোমার আনা।

শুক্রবার, ২১ জুলাই, ১৯৪৪

আদরের কিটি,

এখন আমার সত্যিই আশা জাগছে, এখন সব কিছুই সুভালাভালি চলছে। হ্যাঁ, সব ভালো চলছে। সবার বড় খবর। হিটলারকে খুন করার চেষ্টা হয়েছিল এবং এবার যে করেছিল সে এমন কি না ইহুদী কমিউনিস্ট, না ইংরেজ পুঁজিবাদী বরং যে করেছিল সে একজন জার্মান সেনাপতি, এবং তদুপরি একজন কাউন্ট, এবং বয়সেও যথেষ্ট তরুণ। ফ্যুরার প্রাণে বেঁচেছে দৈবক্রমে, এবং দুর্ভাগ্যক্রমে, দু-চারটে আঁচড় আর পোড়ার ওপর দিয়ে ফ্যুরারের ফাঁড়া কেটে গেছে। সঙ্গে যে কয়জন অফিসার আর জেনারেল ছিল, তারা কেউ খুন, কেউ জখম হয়েছে। যে প্রধান অপরাধী, তাকে গুলি করে মারা হয়।

যাই হোক, এ থেকে স্পষ্টই বোঝা যায়, প্রচুর অফিসার আর জেনারেল যুদ্ধের ব্যাপারে বীতশ্রদ্ধ এবং তারা হিটলারকে জাহান্নামে পাঠাতে পায়। হিটলাকে সরিয়ে দিয়ে, তাদের লক্ষ্য সে জায়গায় এমন একজন সামরিক একনায়ককে বসানো, যে মিত্রপক্ষের সঙ্গে শান্তিচুক্তি করবে; এরপর তারা চাইবে পুনরাস্ত্রীকরণ করে বিশ বছরের মধ্যে আরেকটি যুদ্ধ ডেকে আনতে। দৈবশক্তি বোধহয় ইচ্ছে করেই হিটলারকে সরিয়ে ওদের পথ পরিষ্কার করার ব্যাপারটা একটু দেরি করিয়ে দিয়েছেন, কেননা নিশ্ছিদ্র জার্মানরা তাহলে নিজেরা নিজেদের মেরে মিত্রপক্ষের কাজ অনেক সহজ এবং ঢের সুবিধাজনক করে দেবে। এতে রুশ আর ইংরেজদের কাজ কমে যাবে এবং ঢের তাড়াতাড়ি তারা নিজেদের শহরগুলো পুনঃনির্মাণের কাজে হাত দিতে পারবে।

কিন্তু তবু, আমরা অতদূর এখনও এসে পৌঁছাইনি, এবং সময় হওয়ার এত আগে সেই গৌরবোজ্জ্বল ঘটনাগুলোর কথা আমি বিবেচনা করতে চাই না। তবু, তুমি নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছ যে, এ সমস্তই ঠাণ্ডা মাথার বাস্তব এবং আজ আমি রয়েছি, আটপৌরে গদ্যের মেজাজে; এই একটিবার উচ্চ আদর্শ নিয়ে আমি বকবক করছি না। আরও কথা হল, হিটলার এমন কি বারি কৃপা পরবশ হয়ে তার বিশ্বস্ত ভক্তজনদের জানিয়ে দিয়েছে যে, সৈন্যবাহিনীর প্রত্যেকে অতঃপর গেস্টাপোকে মানতে বাধ্য থাকবে; এবং হিটলারকে হাজার নীচ, কাপুরুষোচিত প্রচেষ্টায় জড়িত ছিল জানলে যে কোনো সৈনিক তার সেই উপরওয়ালাকে যেখানে পারে সেখানেই, কোর্ট-মার্শাল ছাড়াই গুলি করে মারতে পারবে।

এবার যা একখানা নিখুঁত খুনের খেল্ শুরু হবে। লম্বা রাস্তা পাড়ি দিতে গিয়ে সেপাই জনির পা ব্যথা করেছে, উপরওয়ালা অফিসার দাঁত খিঁচিয়েছে। আর যায় কোথায়– জনি

অমনি তার রাইফেল বাগিয়ে ধরে হুঙ্কার দেবে– 'ফ্যুরারকে বড় যে মারতে গিয়েছিলি, এই নে ইনাম।' গুড়ুম! ব্যস্‌, সেপাই জনিকে ধমকানোর স্পর্ধা দেখাতে গিয়ে নাক-তোলা ওপরওয়ালা চলে গেল চিরন্তন জীবনে (নাকি সেটা চিরন্তন মৃত্যু?)। শেষকালে, কোনো অফিসার যখনই কোনো সেপাইয়ের মুখোমুখি হবে, কিংবা তাকে সবার আগে পিঠে রেখে দাঁড়াতে হবে, দুর্ভাবনায় সে তার প্যাণ্ট ভিজিয়ে ফেলবে– কেননা সেপাইরা যা বলতে সাহস পায় না সে সবই তারা বলবে। আমি যা বলতে চাইছি, তার খানিকটা কি তুমি ধরে নিতে পারছ? নাকি আমি প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গান্তরে লাফ দিয়ে দিয়ে যাচ্ছি? লাফ না দিয়ে উপায় নেই; আসছে অক্টোবর ইস্কুলের বেঞ্চিতে গিয়ে বসতে পারি, এই সম্ভাবনায় মন খুশিতে এত ভরে উঠেছে যে, যুক্তিতর্ক সব চুলোয় গেছে। এই মরেছে দেখ, এক্ষুনি তোমাকে আমি বলেছিলাম না যে, আমি খুব বেশি আশাবাদী হতে চাই না? আমার ঘাট হয়েছে, সাধে কি ওরা আমার নাম দিয়েছে 'টুকটুকে বিরোধের পুঁটুলি'।

তোমার আনা।

মঙ্গলবার, ১ আগস্ট, ১৯৪৪

আদরের কিটি,

'টুকটুকে বিরোধের পুঁটুলি'– এই বলে ইতি করেছিলাম আমার শেষ চিঠি এবং সেই একই কথা দিয়ে শুরু করছি এটা। 'টুকটুকে বিরোধের পুঁটুলি'! আচ্ছা বলতে পারো এটা ঠিক কী? বিরোধ বলতে কী বোঝায়। অন্য অনেক কথার মতো এতে দুটো জিনিস বোঝাতে পারে– বাইরে থেকে বিরোধ আর ভেতর থেকে বিরোধ।

প্রথমটা হল মামুলি 'সহজে হার না মানা, সব সময় সেরা বিশেষজ্ঞ বলা, মোক্ষম কথাটা বলে দেওয়া', সংক্ষেপে, যে সব অপ্রিয় বদ্‌গুণের জন্যে আমি সুবিদিত। দ্বিতীয়টা কী কেউ জানে না, ওটা আমার নিজের গোপন কথা।

এর আগেই তোমাকে আমি বলেছি যে, আমার রয়েছে যেন এক দ্বৈত ব্যক্তিত্ব। তার একার্ধ ধারণ করে আছে– আমার আহ্লাদে আটখানা ভাব, সবকিছু নিয়ে মজা করা, আমার তেজস্বিতা এবং সবচেয়ে বড় কথা, যেভাবে সমস্ত কিছু আমি হালকাভাবে নিই। প্রেমের ভান দেখে নারাজ না হওয়া, চুমো, জড়িয়ে ধরা, অশ্লীল রসিকতা– সব এর মধ্যে পড়ে। এই দিকটা সাধারণত ওৎ পেতে থাকে এবং অন্য যে দিকটা ঢের ভালো, ঢের গভীর, ঢের বেশি খাঁটি– সেই দিকটাকে দুম করে ঠেলে সরিয়ে দেয়। তোমাকে এটা বুঝতে হবে যে, তুলনায় আনার সেটা ভালো দিক সেটার কথা কেউ জানে না এবং সেইজন্য অধিকাংশ লোকের কাছে আমি অসহ্য।

এক বিকেলে আমি হই অবশ্যই এক মাথা-ঘোরানো ভাঁড়; ব্যস্‌, আর একটা মাস ওতেই ওদের চলে যাবে। গভীর চিন্তাশীল লোকদের পক্ষে যেমন প্রেমমূলক ফিল্ম– নিছক চিত্তবিনোদন, মজাদার শুধু একবারের মতো। এমন জিনিস যা অল্পক্ষণ পরেই ভুলে যাওয়া যায়, মন্দ নয়, তবে নিশ্চয়ই ভালো বলা যায় না– সত্যি বলতে, এও ঠিক তাই। তোমাকে এসব বলতে খুবই খারাপ লাগছে; কিন্তু যাই হোক এ জিনিস যখন সত্যি বলে জানি, তখন বলব নাই বা কেন? আমার যে দিকটা হালকা ওপরসা, সেটা আমার গভীরতর দিকের তুলায় সব সময়ই বড় বেশি প্রাণবন্ত মনে হবে এবং তাই সব সময়ই কিস্তি মাত করবে। তুমি ধারণা করতে পারবে না ইতিমধ্যেই আমি যে কত চেষ্টা করেছি। এই আনাকে ঠেলে সরিয়ে দিতে,

তাকে পঙ্গু করে দিতে, কেননা, সব সত্ত্বেও, যাকে আনা বলা হয়, সে হল তার অর্ধেক মাত্র: কিন্তু তাতে কাজ হয় না এবং আমি এও জানি, কেন তাতে কাজ হয় না।

অষ্টপ্রহর আমি যা সেইভাবে যারা আমাকে জানে, পাছে তাদের চোখে পড়ে যায় আমার অন্য দিক, যেটা সূক্ষ্মতর এবং অনেক ভালো– তাই আমি বেজায় ভয়ে ভয়ে থাকি। আমার ভয়, ওরা আমাকে নিয়ে হাসাহাসি করবে, মনে করবে আমি উপহাসযোগ্য আর ভাবপ্রবণ। আমাকে ওরা গুরুত্ব দিয়ে নেবে না। গুরুত্ব দিয়ে না নেওয়াতে আমি অভ্যস্ত; কিন্তু তাতে অভ্যস্ত এবং তা সইতে পারে তো শুধু 'ফূর্তিবাজ' আনা; সিকিভাগ সময়ের জন্যে মঞ্চে গিয়ে দাঁড়াতে আমি যদি সত্যিকার বাধ্যও করি, তাহলেও মুখ থেকে কথা বের করতে গিয়ে সে একেবারে কুঁকড়ে যায় এবং শেষে পয়লা নম্বর আনাকে তার জায়গায় দাঁড়াতে দিয়ে, আমি বুঝবার আগেই, সে হাওয়া হয়ে যায়।

সুতরাং লোকজন থাকলে ভালো আনা কখনই সেখানে থাকে না, এ পর্যন্ত একটিবারও সে দেখা দেয়নি, কিন্তু আমরা একা থাকলে প্রায় সব সময়ই সে এসে জাঁকিয়ে বসে। আমি ঠিক জানি, আমি কি রকম হতে চাই, সেই সঙ্গে আমি কি রকম আছি... ভেতরে। কিন্তু হায়, আমি ঐ রকম শুধু আমারই জন্যে। হয়ত তাই, না, আমি নিশ্চিত যে, এটাই কারণ যে জন্যে আমি বলি আমার হাসিখুশি স্বভাবটা ভেতরে এবং যে জন্যে অন্য লোকে বলে আমার হাসিখুশি স্বভাবটা বাইরে। ভেতরের বিশুদ্ধ আনা আমাকে পথ দেখায়, কিন্তু বাইরে আমি দড়ি ছিঁড়ে নেচেকুঁদে বেড়ানো ছাগলাছানা বৈ কিছু নই।

যেটা আমি আগেই বলেছি, কোনো বিষয়ে আমি আমার আসল অনুভূতির কথা কখনও মুখ ফুটে বলি না এবং সেই কারণে আমার নাম দেওয়া হয়েছে ছেলে-ধরা, ছেনাল, সবজান্তা, প্রেমের গল্পের পড়ুয়া। ফূর্তিবাজ আনা ওসব হেসে ওড়ায়, ধ্যাষ্টামো করে জবাব দেয়, নির্বিকারভাবে কাঁধ ঝাড়া দেয়, কেয়ার না করার ভাব দেখায়, কিন্তু হায় গো হায়, মুখচোরা আনার প্রতিক্রিয়া এর ঠিক উল্টো। যদি সত্যি কথা বলতে হয়, তাহলে স্বীকার করব যে, এতে আমার প্রাণে আঘাত লাগে, আমি প্রাণপণে চেষ্টা করি নিজেকে বদলাতে, কিন্তু আমাকে সর্বক্ষণ লড়তে হচ্ছে ঢের জবরদস্ত এক শত্রুর বিরুদ্ধে।

আমার মধ্যে একটি ফোঁপানো কণ্ঠস্বর শুনি– 'ও ঈশ্বর, শেষে তোমার এই হাল হয়েছে; কারো ওপর মায়াদয়া নেই, যা দেখ তাতেই নাক সিটকাও, আর তিরিক্ষে নিজের অর্ধাঙ্গিনীর উপদেশে কান দিতে চাও না।' আমি কান দিতে চাই গো, চাই– কিন্তু ওতে কিছু হয় না; যদি আমি চুপচাপ থেকে গুরুতর কোনো বিষয়ে মন দিই, প্রত্যেকে ধরে নেয় ওটা কোনো নতুন রঙ-তামাসা এবং তখন সেটাকে হাসির ব্যাপার করে তুলে তা থেকে আমাকে বেরিয়ে আসতে হয়। আমার নিজের পরিবারের কথাই বা কী বলি– ওঁরা নির্ঘাৎ ভেবে বসবেন আমার ঘাড়ে মাথায় হাত ঠেকিয়ে দেখবেন, আমার গায়ে জ্বর আছে কিনা জিজ্ঞেস করবেন। শরীর খারাপ, মাথাধরা আর স্নায়বিক রোগের ওষুধের বড়ি গেলাবেন, জিজ্ঞেস করবেন আমার কোষ্ঠবদ্ধতা হয়েছে কিনা এবং তারপর আমার মেজাজ ভালো নেই বলে আমাকে চোখে চোখে রাখা হয়, আমি শুরু করি খেঁকি হতে, তারপর অসুখী এবং সবশেষে আমার অন্তঃকরণে মোচড় দিই, যাতে খারাপটা বাইরে পড়ে আর ভালোটা থাকে ভেতরে এবং সমানে চেষ্টা করতে থাকি রাস্তা খোঁজার, যাতে হওয়া যায় যা হতে চেয়েছি এবং যা হতে পারি, যদি... পৃথিবীতে আর কোনো জনপ্রাণী বেঁচে না থাকত!

–তোমার আনা।

পরিশেষে

আনার ডায়েরি এইখানে শেষ। ৪ঠা আগস্ট, ১৯৪৪– এইদিন সবুজ উর্দি-পরা পুলিস 'গুপ্ত মহলে' হানা দেয়। ওখানকার সব বাসিন্দাদের, ক্রালার আর কুপহুইস সমেত, গ্রেপ্তার করে এবং জার্মান আর ডাচ বন্দী নিবাসে পাঠিয়ে দেয়।

গেস্টাপো 'গুপ্ত মহল' লুট করে। মেঝের ওপর ফেলে দেওয়া পুরনো বই, ম্যাগাজিন আর খবরের কাগজের ডাঁই থেকে মিপ্ আর এলি খুঁজে বের করেন আনার ডায়েরিটা। পাঠকের দিক থেকে অপ্রয়োজনীয় সামান্য কিছু অংশ বাদে মূল লেখাটি এই বইতে ছাপানো হয়েছে।

আনার বাবা ছাড়া 'গুপ্ত মহলে'র আর কোনো বাসিন্দাই ফিরে আসতে পারেননি। ক্রালার আর কুপহুইস ডাচ বন্দীনিবাসে দারুণ কষ্টভোগ করে স্বগৃহে নিজের নিজের পরিবারে ফিরে যেতে পেরেছিলেন।

হল্যাণ্ডের মুক্তির দুই মাস আগে ১৯৪৫ এর মার্চ মাসে বেরজেন-বেলসেন বন্দীনিবাসে আনার মৃত্যু হয়।

--০--